প্রয়াত বাবা

৺চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস

ও

প্রয়াতা মা

৺শান্তিলতা বিশ্বাসকে

আমার কথা

বহুদিনের কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতালাভ করেছে। আজ এ স্বাধীনতার চল্লিশ বছর। সুদীর্ঘ উনচল্লিশটি বছর আমরা পার করে এসেছি শৃংখল মুক্ত ভারত মাতার। বিগত দিনের স্মৃতিকে ধরে রাখবার প্রবণতা বোধহয় আমাদের মজ্জাগত। অতীতকে ভবিষ্যতের সামনে দৃষ্টান্ত করে তোলবার প্রবণতাই হচ্ছে ভবিষ্যতে চলার পথকে উজ্জ্বল করে তোলবার প্রচেষ্টা। তার সেই কারণেই, চুপ করে থাকা বোধহয় সম্ভব হয়নি। বলতে গেলে এ বিষয়ের উপর কাজ করবার উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সূচনা লাভ করি আমার এক সাহিত্যিক অগ্রজের কাছ থেকে। এবং তাঁর সাহায্যে এগিয়েও গিয়েছিলাম বেশ কিছুটা পথ। বিগত দিনের মা-বোনেরা আমাদের পথ প্রদর্শক। আমরা তাঁদের উত্তরসূরী। তাঁদের কাছে আমরা ঋণী। ভারতমাতার শৃংখল মুক্ত করবার কাজে সেদিনের সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের মঞ্চে সমবেত হয়েছিলেন বহু নর-নারী। পুরুষদের পাশে পাশে পা মিলিয়ে চলবার চেষ্টা করেছেন মহিলারা, সফলতাও লাভ হয়েছে। সমগ্র ভারত জুড়ে সেদিন যখন রণ দুন্দুভির কোলাহল ভারতের আকাশ-বাতাসকে উচ্চকিত করে তুলেছিল, তখন নারীরাও পর্দানসীন হয়ে বসে থাকতে পারেননি। সংখ্যায় পুরুষের সমান না হলেও বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা সেদিন ঘর ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন মাতৃভূমির পবিত্র কর্মে নিজেদেরকে অংশীদার করতে।

সমগ্র ভারতের প্রতিটি কোণ থেকে বহু মহিলা-সংগ্রামী এগিয়ে এসেছিলেন তৎকালীন বিশিষ্ট নেতাগণের আহ্বানে—তিলক, দেশবন্ধু, গান্ধীজী, লোহিয়া প্রমুখ। তাঁদের মধ্যে সকলের পরিচয় সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবে চেষ্টা করেছি সাধ্যমত। কতটা পেরেছি জানিনা, পাঠক কুলের উপরেই বিচারের দায়িত্ব রাখছি।

এ কাজে সাহায্য পেয়েছি বহু শুভানুধ্যায়ীর। যে সমস্ত পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকার সাহায্য পেয়েছি সেগুলি সংগ্রহ করবার জন্য সাহায্য পেয়েছি জাতীয় গ্রন্থাগারে কর্মীবন্ধুগণের। এ ছাড়া তৎকালীন

স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে অল্প বিস্তর যুক্ত বেশ কয়েকজন অগ্রজের সাহায্য পেয়েছি সর্বতোভাবে। সাহায্য পেয়েছি বেশ কিছু বিপ্লবী সংস্থার ও পত্র-পত্রিকার কাছ থেকে।

অবশ্য মনের ক্ষুধা মনেই আছে ; কারণ, এমন অনেক মহিলা আছেন যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু সবাইকে এই স্বল্পায়তনের পুস্তকের মধ্যে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। তাই আবার পাঠক কুলের কাছে বিবেচনার জন্য রাখলাম। আশা রাখছি, সুযোগ পেলে এ-বিষয়ে আরো গভীরে যাবার চেষ্টা করব। সর্ব শেষে, উল্লেখ করছি—বর্তমানের ঘাটতি ভবিষ্যতে পূরণ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করব।

লেখিকা

সূচীপত্র

অভন্তীকাবাঈ গোখলে

(১৮৮২—১৯৪৯)

ভারতের মধ্যপ্রদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যে সকল মহান ব্যক্তিত্বের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে, সেখানে একটি নাম উল্লেখের দাবী রাখে ; তা হোলো অভন্তীকাবাঈ গোখলে ; তিনি নারী হোলেও পুরুষের পাশে থেকে সেদিন স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পাতা উল্টালে তাঁকে আমরা নিশ্চয়ই পাব। ১৮৮২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে তাসগাঁও নামক স্থানে (পুরানো সাটারা জেলায়) অভন্তীকাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন চিতাপভন সম্প্রদায়ের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। পিতা ছিলেন বিষ্ণুপন্ত যোশী এবং মাতা সত্যভামাবাঈ। তাঁর পিতা জীবিকায় ছিলেন একজন সামান্য রেল কর্মচারী। শৈশবে অভন্তীকাবাঈ-এর শিক্ষাগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তাঁর পিতা-মাতা দু'জনেই প্রচণ্ড গোঁড়া ; সেই কারণেই প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণও সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষে। ১৮৯১ সাল পর্যন্ত তাঁকে ইন্দোরে তাঁর পিতা-মাতার কাছেই থাকতে হয়েছিল।

১৮৯১ সালে তাঁদেরই এক প্রতিবেশী গোপাল রাও গোখলের পুত্র ববন গোখলের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ববন ছিলেন জীবিকায় একজন রেল কর্মচারী। পিতৃগৃহে বাধা পেলেও শ্বশুরবাড়ীর মুক্ততা অভন্তীকাবাঈকে নিরক্ষর থাকতে দেয়নি ; বিবাহের পর তিনি স্বামীর কাছে গৃহেই শিক্ষাগ্রহণ করতে থাকেন, প্রাথমিক স্তর থেকেই। ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত তিনি স্বামীর কাছেই গৃহে শিক্ষা গ্রহণ করতেন ; কিন্তু

এই বছর তাঁর স্বামী নাগপুর ছেড়ে লণ্ডনে ও চীনে যান। এই সময় থেকে তাঁর শ্বশুর তাঁকে শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। ১৯০১ সালে তিনি ধাত্রীবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত হন। গৃহশিক্ষা গ্রহণের সময়ই তিনি হিন্দি, মারাঠী, ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত হন এবং এইসব ভাষায় পদ্য, নাটক, উপন্যাস, জীবনী প্রভৃতি বিষয়ে পাঠের কাজ অন্যান্য কাজের সঙ্গেই ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যেতে থাকেন, এর ফলে তাঁর মানসিক চিন্তাধারার যথেষ্ট প্রসার ঘটে।

তাঁর স্বামী হাতে-কলমের অর্থাৎ টেকনিক্যাল কাজ করতেন; ১৮৯৮ সালে এবং ১৯০৩ সালে দু'বার মেশিনে কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনার ফলে তিনি তাঁর হাতের সমস্ত আঙ্গুলগুলিকে হারান। কাজ করবার ক্ষমতা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল তাঁর, এ-অবস্থায় ১৯০৪ সালে তাঁর স্বামী যখন বোম্বাইতে ফিরে আসেন, তখন স্বামীর হয়ে উপার্জনের দায়িত্ব অভন্তীকাবাঈকেই নিজের উপর তুলে নিতে হোলো। তিনি ধাত্রীবিদ্যার কাজ শুরু করে দিলেন। অভন্তীকাবাঈ-এর একার উপার্জনে তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর সংসার চলতে থাকে; তাঁদের কোনো সন্তান হয়নি। দম্পতি উভয়েই ঠিক করেছিলেন যে তাঁরা কোনোদিনই সন্তানের জন্ম দেবেন না; এর কারণ অভন্তীকার একার উপার্জন এবং অক্ষম স্বামী—ফলে সাংসারিক অর্থের অভাবের মধ্যে নতুন কোনো দায়িত্ব আনতে তাঁরা ইচ্ছুক ছিলেন না।

১৯০৪ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত অভন্তীকাবাঈ ধাত্রীবিদ্যার কাজ করে যান। এই সময় সংসার এবং উপার্জন ছাড়া বাইরের জগতের কোনো বিষয়ের প্রতি তেমন আগ্রহ ছিল না তাঁর। ১৯১৩ সাল থেকে তিনি সমাজসেবার কাজে যুক্ত হতে থাকেন; এই বছরই সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান সোস্যাল-সার্ভিস লীগে (Social Service League) যোগ দেন একজন সমাজসেবী হিসাবে। তিনি শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে থাকেন এবং খুব অল্প দিনের মধ্যেই তাদের মধ্যে সুপরিচিতি অর্জনে সক্ষম হন। এই বছরেই অর্থাৎ ১৯১৩ সালে তিনি আইচল করাঞ্জীর রাণীর সঙ্গী হিসাবে লণ্ডন পরিভ্রমণে যান এবং সেখানে কয়েকজন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হন। এঁরা হলেন—জি. কে. গোখলে, সরোজিনী নাইডু এবং লণ্ডনের কয়েকজন খ্যাতনামা সমাজকর্মী। লণ্ডনে থাকাকালীন তিনি সেখানকার কয়েকটি হাসপাতাল এবং ক্লিনিক পরিদর্শন করে ডাক্তারীর কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন।

১৯১৬ সালে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে অভন্তীকাবাঈ এবং তাঁর স্বামী, প্রথম গান্ধীজীর সঙ্গে পরিচিত হন ; গান্ধীজী এই গোখলে দম্পতিকে তাঁর সাবরমতী আশ্রমে আমন্ত্রণ জানান। আশ্রম পরিদর্শনের পর অভন্তীকাবাঈ এবং তাঁর স্বামী উভয়েই গান্ধীজীর আদর্শ ও নীতিকে গ্রহণ করবার জন্য মানসিক দিক দিয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯১৭ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের শুরুতেই অভন্তীকাবাঈ বিহারের চম্পারণ অঞ্চলের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। গান্ধীজীর অভিভাবকত্বে তিনি গ্রামে গ্রামে স্বাক্ষরতা অভিযানের কর্মসূচীকে কার্যকরী রূপদানের জন্য বেরিয়ে পড়েন ; এবং একই সঙ্গে গ্রামের মানুষদের নৈতিক চরিত্র গঠন, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করবার ব্যবস্থা করেন। বিহারে চম্পারণে থাকবার সময়েই গান্ধীজীর জীবনী সম্বলিত 'মহাত্মাগান্ধী ইয়ানচেন চরিত্র' নামক পুস্তকটি লেখেন।

১৯১৮ সালে ২৭শে নভেম্বর অভন্তীকাবাঈ মহিলাদের সংগঠিত করবার জন্য বোম্বাইতে 'হিন্দু মহিলা সমাজ' নামে সংগঠনটির উদ্বোধন করেন। দীর্ঘ আটত্রিশ বছর তিনি এই সংস্থার সভাপতি হিসাবে কাজ করেন। সংস্থাটিতে মহিলাদের সেলাই, হাতের কাজ, বোনা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হোতো—সংস্থার প্রতিটি কার্যকলাপের পিছনে ছিল তাঁর অদম্য প্রচেষ্টা এবং একান্ত সমর্থন। ১৯২৬ সালে তিনি বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং সদস্যা হিসাবে নির্বাচিত হন। বেশ কয়েক বছর তিনি মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে মিউনিসিপ্যাল হাসপাতাল এবং ক্লিনিকগুলির সার্বিক উন্নতির দিকে নজর দেন এবং উন্নতি ঘটাতেও সক্ষম হন। মিউনিসিপ্যালিটির কাজে যুক্ত কর্মীদের সন্তানদের স্বাস্থ্য, লেখাপড়া প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতির ব্যাপারেও তিনি চেষ্টা করেন। কর্পোরেশন থেকে তিনি যে সাম্মানিক অনুদান পেতেন তা সেবা প্রতিষ্ঠানগুলিতে দান করে দিতেন।

১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের জাতীয় কর্মসূচীগুলিতে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। মুখ্য ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তাঁকে বেশ কয়েকবার কারাবরণ করতে হয়। ১৯৩২ সাল থেকে তিনি হরিজনদের জন্য কাজ করতে থাকেন, তাদের সঙ্গে মিলে যান, তাদের সুখে-দুঃখে নিজেকে তাদের সাথী করে তাদেরকে নিয়ে বিভিন্ন আন্দোলনের কাজে এগিয়ে যান। তিনি খদ্দরের পোষাক পরিধান করতেন ; ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক

বছরই তিনি তাঁর নিজের হাতের তৈরী একজোড়া খদ্দরের ধুতি গান্ধীজীকে উপহার দিতেন।

বোম্বাই এবং মহারাষ্ট্রের মহিলাদের জাতীয় এবং সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করানোর ব্যাপারে তিনি যে দায়িত্ব পালন করেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। ১৯৩০ সালে বোম্বাইতে প্রতিষ্ঠিত 'দেশ সেবিকা দলের' তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু মহিলা সমাজের' মাধ্যমে তিনি সমাজ, ধর্ম এবং জাতীয়সেবার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের পদ্ধতিগত শিক্ষা ছড়িয়ে দেন মহিলাদের মধ্যে। ১৯৪৯ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতালাভের বছর দু'য়ের মধ্যেই স্বাধীন ভারতের মাটি থেকে, অগণিত ভারতবাসীর কাছ থেকে চিরবিদায় নিলেন এই একান্ত অনুরাগী দেশপ্রেমিক।

অরুণা আসফ আলী

(১৯০৯—   )

স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে শুরু করে চলেছিল চারের দশক পর্যন্ত এবং বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করে ভারতবাসী তার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মূল্য পেয়েছে, ১৯৪৭ সালের ১৫-ই আগস্ট। বেশ কয়েক দশক পার করে আজ আমরা যদি এই বিগত দিনগুলির দিকে ফিরে তাকাই, তাহলে দেখব যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের অগণিত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সুফল আমরা আজ উপভোগ করছি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রামের উষ্ণ বাতাস ভারতের আকাশ-বাতাসকে ভরিয়ে তুলেছিল সেদিন, বিশেষ করে, বাংলায়। বাংলার মাটিতে পা রেখেছিলেন, সেদিন বহু নর-নারী, তাঁদের জন্মভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য। বাংলার বহু মহান ও মহিয়সী ব্যক্তিত্ব উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের অমূল্য জীবন। এপার ওপার বাংলার মানুষজন সেদিন কিন্তু একই মঞ্চে একটিই উদ্দেশ্য নিয়ে জড়ো হয়েছিল তাঁদের নেতৃত্বের আহ্বানে। দুই বাংলার মানুষ আজকের মতো তখন বিচ্ছিন্ন ছিল না, আন্দোলনকে জোরদার করতে দু' বাংলার মানুষ সেদিন তাঁদের অমূল্য প্রাণ বলি দিয়েছেন।

পূর্ববাংলার এক মহিয়সী নারীর প্রসঙ্গে আমাদের আজকের আলোচনা; ইনি হলেন অরুণা আসফ আলী, যিনি প্রথম যৌবনে ছিলেন জাতীয়তাবাদী এবং পরবর্তী সময়ে সমাজসেবী। ১৯০৯ সালে পূর্ববাংলার (অধুনা বাংলাদেশের) এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের পরিবার ছিল ব্রাহ্মণ গাঙ্গুলী পরিবার। তাঁর পিতা

ছিলেন উত্তরপ্রদেশের নৈনিতালের একজন হোটেল ব্যবসায়ী। অরুণা বাল্যকাল থেকে নৈনিতালে পিতার কাছে থাকতেন, সেখানে স্কুলে পড়তেন। শৈশবের দিনগুলি তাঁর কেটেছে শুধুমাত্র লেখাপড়া নিয়ে; কৈশর গেল, যৌবনে পা দিলেন তিনি; রাজনীতিতে অনাগ্রহী অরুণা তাঁর দিনগুলিকে কাটিয়ে দিতেন সামাজিক নানাবিধ কাজের মধ্য দিয়ে। উনিশ বছর বয়সে তাঁর জীবনের পরিবর্তন আসে অপ্রত্যাশিতভাবেই। দিল্লীর একজন বিখ্যাত আইনজীবী আসফ আলীর সঙ্গে অরুণার ঘটনাচক্রে পরিচয় হয়। আসফ আলী পেশাগত দিক দিয়ে আইনজীবী হলেও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন, দিল্লীর একজন কংগ্রেস নেতৃত্ব। আসফ আলীর সঙ্গে অরুণা ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন এবং পিতার প্রচণ্ড আপত্তি থাকা স্বত্ত্বেও তাঁর মতের বিরোধিতা করে অরুণা, আসফ আলীকে বিবাহ করেন ১৯২৮ সালে। পিতার আপত্তির কারণ ছিল, আসফ আলী অরুণার চেয়ে কুড়ি বছরের বড় ছিলেন।

বয়সের বিস্তর ব্যবধান কিন্তু নব দম্পত্তির মধ্যে ফাটল ধরাতে পারেনি এতটুকু; তাঁরা খুব সুখেই বাস করছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা উভয়েই সংসার জীবন থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে লাগলেন। তবে বিবাহের পর থেকেই তিনি রাজনীতিতে স্বামীর সঙ্গেই যুক্ত হতে থাকেন। রাজনৈতিক কর্মধারায় তাঁর স্বামী ছিলেন সক্রিয়। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও জাতীয়তা আন্দোলনের কাজে আত্মোৎসর্গ করেন। গান্ধীজী ও আজাদের মতো কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন; স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ক্রমশঃ পরিলক্ষিত হতে থাকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক সভায় যোগ দিতে থাকেন তিনি, সঙ্গে বক্তব্যও রাখতে থাকেন।

তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পট্টবর্ধন' রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখ কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির নেতাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই সব নেতৃত্ব তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বচ্ছ করবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন; তবে তাঁর জীবনের সবচেয়ে কাছের উৎসাহদাতা যিনি ছিলেন তিনি হলেন তাঁর স্বামী আসফ আলী। স্বামীর সঙ্গেই তিনি বহুদেশ পরিভ্রমণ করেন। যদিও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার ডিগ্রীধারী ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন একজন ক্ষুধার্ত পাঠক: তাঁর পাঠের বিষয় ছিল

—রাজনীতি, অর্থনীতি, মার্কসীয় সাহিত্য। তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে প্রচণ্ড জাতীয়তাবাদী। এর বহিঃপ্রকাশ হিসাবে তাঁকে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম করতে দেখা গিয়েছে। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তাঁকে জেলে যেতে হয়। ব্রিটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ যখন গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংগঠিত হয়, তখন তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং এই কারণেই ১৯৪১ সালে আবার তাঁকে গ্রেপ্তারবরণ করতে হয়।

১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের সময় তাঁর জীবনের আর এক ধাপ পরিবর্তন এল। রাজনৈতিক আন্দোলনের কংগ্রেস নেতারা তখন একে একে গ্রেপ্তার হচ্ছেন ব্রিটিশের কারাগারে; অরুণার দায়িত্ব বেড়ে গেল। কাজ শুরু করে দিলেন তিনি, তাঁর সোসালিষ্ট বন্ধুদের সঙ্গে আত্মগোপন করে গোপনে আন্দোলনের প্রস্তুতি গড়ে তুলতে লাগলেন। পুলিসের নজর এড়িয়ে কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; জনসাধারণের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তুলতে লাগলেন তাঁর উদ্দীপনাময়, সুদৃঢ় বক্তব্যের মাধ্যমে। তাঁর এই একান্ত আত্মপ্রচেষ্টার ফলে কংগ্রেসের বন্ধপ্রায় আন্দোলনকে আবার তিনি সম্পূর্ণ সংগঠিত করতে সক্ষম হলেন ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই। তবে এই সময় থেকেই তাঁকে আত্মগোপন করতে হয়েছিল ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলে না নেওয়া হয়। আত্মগোপন করাকালীন সময়ের মধ্যে অরুণাকে দলের কাছ থেকে কিছুটা সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গান্ধীজী বলেছিলেন, "Aruna would rather unite Hindus and Muslims of the barricades than on the constitutional front".

এতদ্‌সত্ত্বেও অরুণা তাঁর কার্যবিধি অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন; আগষ্ট আন্দোলনের পক্ষে আত্মসমর্পণ জানিয়ে অরুণা এবং পট্টবর্ধন, আবুল কালাম আজাদকে যে পত্র লিখেছিলেন, সেখানে তিনি বলেছেন, "আমাদের যে সমস্ত কংগ্রেস বন্ধুরা এখনও গ্রেপ্তার হননি, আমাদের দায়িত্ব আছে তাঁদেরকে সংগঠিত করে আন্দোলনের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া; ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্টের রেজলিউশনকে কার্যকরী রূপ দেওয়া।" ১৯৪৬ সালে আত্মগোপন অবস্থা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন অরুণা, নেমে পড়লেন আন্দোলনের কাজে জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে। ১৯৪৭

সালে তিনি দিল্লী প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন ; কিন্তু তাঁর চরমপন্থী মনোভাবের জন্য তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে থাকতে পারলেন না, স্বাধীনতার পূর্বেই কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর বিবাদ শুরু হয়ে গেলো। বস্তুতপক্ষে তিনি তাঁর স্বামীর এবং পূর্ববর্তী দলের মতাদর্শকে গ্রহণ করতে পারলেন না।

১৯৪৮ সালে, ভারত স্বাধীনতা লাভের পর তিনি সোসালিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। কিন্তু দু'বছর পরেই তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন। বাম সমাজতন্ত্রবাদী দল (লেফট সোসালিস্ট গ্রুপ) গঠন করলেন এবং সেই সঙ্গে ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন। ১৯৫৫ সালে বাম সমাজতন্ত্রবাদী দলটি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে একত্র হয়ে গেল এবং তিনিও এর সঙ্গে যুক্ত হলেন। এই বছরেই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা এবং সর্বভারতীয় ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ১৯৫৮ সাল থেকে তিনি তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে দূরে সরে দাঁড়াতে থাকলেন ; কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করলেন। এরপরও কিন্তু তিনি তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারলেন না। আবার কয়েক বছর পরেই অর্থাৎ ১৯৬৪ সালে নেহেরুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি কংগ্রেসে যোগ দিলেন। এবারে যদিও তিনি কংগ্রেসে যোগ দিলেন, কিন্তু সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে দূরেই রইলেন।

১৯৫৮ সালের আগে পর্যন্ত জনজীবনের সঙ্গে অরুণা আসফ আলী সক্রিয় ভাবেই যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৮ সালে তিনি জনসংঘ প্রার্থীকে পরাজিত করে দিল্লীর প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন, তবে ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত কাজ করার পর এ পদে ইস্তফা দিলেন। ইন্দো-সোভিয়েট কাল্চার সোসাইটির তিনি ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয় সদস্যা। 'অল ইন্ডিয়া পীস কাউন্সিল' এবং "ন্যাশানাল ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ওম্যান"-এর তিনি সদস্যা ছিলেন। নতুন দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'লিঙ্ক' এবং 'দি প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা দু'টির সঙ্গেই তিনি যুক্ত ছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেব ক্ষেত্রে এই মহিলা ছিলেন স্বাবলম্বী, সচেতন, ভাববাদী, সুস্বভাবের অধিকারিণী, চরমপন্থী মনোভাবের একজন দৃঢ়চেতা মহিলা। রাজনীতির ক্ষেত্রে, নিজের মতবাদের

বাস্তবতার বিরুদ্ধে তিনি কখনও আপোস করেননি, দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছেন। রাজনীতি থেকে এই শতাব্দীর ষাটের দশকের পর থেকেই তাঁকে দূরে সরে দাঁড়াতে দেখা গেলেও সামাজিক কার্যকলাপ থেকে তাঁকে কখোনো দূরে সরে থাকতে দেখা যায় নি। তিনি সমাজ সেবার কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছেন। এই মহিয়সী নারীকে আমরা চিরদিন মনে রাখব।

আনসুয়াবাঈ কালে

(১৮৯৬—১৯৫৮)

ভারতের বিভিন্নপ্রান্তের অগণিত নর-নারী যেদিন একটি মাত্র মন্ত্র নিয়ে একত্রে সংগ্রামের মঞ্চে জড়ো হয়েছিলেন, সেদিন এই বিশাল জনতাকে নেতৃত্ব দেবার জন্য যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, আত্মোৎসর্গ করে ছিলেন দেশের কাজে, তাঁদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা স্বল্প হলেও নগণ্য ছিল না। কারণ, তাঁরাও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভারতের বিভিন্নপ্রান্তের নর-নারীকে। বর্তমানে যাঁকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব তিনি হলেন জন্মসূত্রে বেলজিয়ামবাসী কিন্তু কর্মসূত্রে মধ্যপ্রদেশের নাগপুরের কংগ্রেস সংগঠনের একজন নেতৃত্ব ; নাম, আনসুয়াবাঈ কালে।

১৮৯৬ সালে বেলজিয়ামে এক চিতাপভন সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ পরিবারে আনসুয়াবাঈ কালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সদাশিব বিভাটে, পেশায় একজন আইনজীবী ; মাতা গাঙ্গুবাই ছিলেন তাঁর পিতার দ্বিতীয়া স্ত্রী। তাঁরা ছিলেন তিনভাই ও তিনবোন, শৈশবের পড়াশুনা তিনি তার জন্মভূমিতেই করতে থাকেন। ১৯১৩ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি পুনার ফারগুসন্ কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু পরের বছরই কলেজ পরিবর্তন করে বরোদা কলেজে ভর্তি হন ১৯১৬ সালে পি. বি. কালের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ; পি. বি. কালে ছিলেন পেশায় একজন ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার। তিনি ছাব্বিশ বছরের বিপত্নীক যুবক ছিলেন ; আনসুয়ার যখন তাঁর সঙ্গে বিবাহ হয়, তখন তিনি ছিলেন কুড়ি বছরের যুবতী।

১৯২৬ সাল থেকে এই নবদম্পতি নাগপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস

করতে থাকেন। নাগপুরে থাকাকালীন আনসূয়াবাঈ কালে বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়তে থাকেন। ১৯২৮ সালে তিনি সি. পি. লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন; এরসঙ্গে তাঁর আর একটি বর্দ্ধিত দায়িত্ব ছিল, মহিলা বন্দীদের তদারক করা। পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ১৯২৯ সালে তিনি ইন্টারন্যাশনাল উইটলে লেবার কমিশনের হয়ে সি পি পরিভ্রমণে যান এবং ইন্টারন্যাশনাল অরগানাইজেশনের সদস্য নিযুক্ত হন।

১৯৩০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন যখন ভারতের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, সেই সময় তিনি এ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলেন গান্ধীজীর সঙ্গে। একই সঙ্গে তিনি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করেন। আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য তিনি গ্রেপ্তার হলেন; তাঁকে চারমাসের জন্য কারাবরণ করতে হোলো। ১৯৩২ সালে একবছরের জন্য তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির (A.I.C.C. / All India Cangress Committee) সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৩ সালে তাঁর কাজের দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়, তিনি নেমে পড়লেন গান্ধীজীর সঙ্গে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কাজে, প্রচার অভিযান, বিভিন্ন জনসভায় বিশেষ করে করপোরেশনের মাধ্যমে বৈষ্ণব জনসভায় গিয়ে মানুষজনকে বোঝাতে লাগলেন।

১৯৩৫ সালে তিনি নাগপুর কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন, ১৯৩৬ সালে মোহপাতে যে সি. পি. হরিজন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৭ সালে নাগপুরের বিরার কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দিতা করে তিনি নির্বাচিত হন। বিধানসভার প্রথম যে অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনের উদ্বোধন হয় তাঁরই কণ্ঠের গান 'বন্দেমাতরম' পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। এই বিধান-সভায় তিনি ডেপুটী স্পীকার হিসাবে নির্বাচিত হন। বিধানসভার ডেপুটী স্পীকার পদে কাজ করা কালীন তাঁকে বিভিন্ন অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হতে দেখা গিয়েছে সর্বদাই। এই পদে আসীন হবার কিছুদিন পরে সি. পি. সরকারের শিক্ষাবিভাগের একজন পরিদর্শক জাফর হোসেন এক যুবতীকে ধর্ষণের অপরাধে জেলে বন্দী হয়। জাফর হোসেনকে কারামুক্ত করবার জন্য সরকারী একজন মুসলমান মন্ত্রী, নাম শরিফ, প্রচণ্ড চেষ্টা করতে লাগলেন। শরিফ জাফর হোসেনের মুক্তির জন্য মন্ত্রীসভায় আলোচনা না করেই চেষ্টা করতে লাগলেন; কিন্তু তাঁর

সে চেষ্টা কার্যকরী রূপ নিতে পারল না, এর কারণ আনসূয়ার হস্তক্ষেপ। এর বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে তদন্ত কমিশন গঠিত হলো ; এইসব কর্মসূচীর কার্যকরী রূপ প্রদানের জন্য আনসূয়ার প্রচেষ্টাই ছিল মূলতভাবে। অপরাধীকে সমর্থন করা, সত্যের বিরুদ্ধে কাজ করবার চেষ্টাকে তিনি ব্যর্থ করতে সক্ষম হন। অন্যায়কারীকে সমর্থন করবার জন্য ১৯৩৮ সালে শরিফের মন্ত্রীত্ব বাতিল হয়।

এই বছরেই অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে তিনি নাগপুরের মহিলা সম্মেলনের কাজে নেমে পড়েন ; মহিলাভবন তৈরীর জন্য সরকারী পক্ষের অনুদান মঞ্জুর হলো এবং একই উদ্দেশ্যে একটি অর্থসংগ্রহ তহবিল গঠন করা হোলো। তহবিল গঠন করবার ক্ষেত্রে পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন আনসূয়াবাঈ স্বয়ং। ১৯৪২ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় তাঁরই নেতৃত্বে নাগপুরের অন্তর্গত চিমুর ও আস্তি অঞ্চল দু'টিতে সেই অঞ্চলের অধিবাসীরা আন্দোলনে নেমে পড়ে ; অঞ্চল দু'টির অধিবাসীরা ছিল আদিম ও জঙ্গী। সেইকারণে তাদের আন্দোলনের মধ্যে জঙ্গীভাবের প্রকাশ স্পষ্টতঃ হয়ে উঠেছিল। এর ফলে অঞ্চল দু'টির অংশগ্রহণকারী দলের সাতজন আদিবাসীকে জঙ্গী আইনে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। আনসূয়া তখন ছুটে যান দিল্লীতে গান্ধিজী এবং দিল্লীর বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, যথাসাধ্য প্রচেষ্টার ফলে সাতজনকে মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করেন। এছাড়া, সামাজিক কর্তব্যবোধও তাঁর মধ্যে ছিল যথেষ্ট ; সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণকারী আদিবাসীদের মধ্যে সাতজন আদিবাসী বন্দী থাকাকালীন তাদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের দায়িত্ব আনসূয়ার উপরই পড়ে এবং অর্থসংগ্রহের মাধ্যমে তিনি তাঁদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন।

১৯৩৭ সালে নাগপুরে তাঁরই পরিচালনা এবং উদ্যোগে সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ; মহিলাদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক কর্মক্ষেত্রে সংগঠিত করবার কাজে তিনি যথেষ্ঠ সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হন। ১৯৭৭ সালে সর্বভারতীয় মহিলা সংগঠনের জেনারেল বডির কর্মপরিষদের সভাপতি হন। ১৯৪৮ সালে গান্ধীজীর হত্যাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয় ; এর প্রভাব পড়েছিল সমগ্র ভারতে, কিছু না কিছু ভাবে। এই সময় তিনি সংগঠিতভাবে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গতদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান তাদের সাহায্য করবার জন্য।

১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত সময়ের জন্য তিনি লোকসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে কানাডায় অনুষ্ঠিত কমন্‌ওয়েলথ্‌ কনফারেন্সে (Common Wealth Conference) প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, সংযুক্ত মহারাষ্ট্রের পক্ষে।

১৯৫৮ সালে স্বামী, তিনপুত্র এবং তিনকন্যা বর্তমান রেখে এই সংগ্রামী মহিয়সী ইহোলোকের মায়া ত্যাগ করে পরোলোকে যাত্রা করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর স্মৃতি চিরউজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

অ্যানী মাসক্রেনে

(১৯০২—১৯৬৩)

অ্যানী মাসক্রেনে ছিলেন কেরালার একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক এবং সামাজিক কর্মী। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত হয়ে থাকবার দাবি রাখে। অ্যানী মাসক্রেনে জন্মেছিলেন ১৯০২ সালের ২৫শে মে তারিখে কেরালা রাজ্যের ত্রিভান্দ্রমের আরনাকুলাম জেলার অন্তর্ভুক্ত মালয়াট্টুর নামক স্থানের এক দরিদ্র লাতিন খৃষ্টান পরিবারে। পরবর্তী সময়ে অবশ্য তাঁরা তাঁর জন্মভূমির জেলা থেকে স্থান পরিবর্তন করে ত্রিভান্দ্রম শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।

তাঁর পিতা গাব্রিয়েল মাসক্রেনে ছিলেন একজন স্বল্পবেতনের সরকারী কর্মচারী। আর্থিক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাঁর পিতা কন্যার সুশিক্ষার প্রতি নজর দিয়েছিলেন। বি. এ. (স্নাতক) এবং এম. এ. ডিগ্রীলাভের পর অ্যানী মাসক্রেনে শিলং-এ চলে আসেন, শিলং-এর একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকার চাকরি নিয়ে। তিন বছর শিলং-এ চাকরি করবার পর তিনি আবার ত্রিভান্দ্রমে চলে আসেন। ত্রিভান্দ্রমে এসে আবার উচ্চশিক্ষার্থে মনোনিবেশ করলেন। ল' কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩৬ সালে আইন (বি. এল.) পাশ করবার পর তিনি আইন ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু তিন বছর কাজ করবার পর তিনি আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ সময়ের জন্য রাজনৈতিক এবং সামাজিক কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করেন।

রাজনৈতিক কর্মমুখর জীবনে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সারা

জীবন অবিবাহিতা থাকার পথ বেছে নেন। তাঁর কর্মমুখর জীবনে প্রবেশ করবার শুরুতেই অ্যানী মাসক্রেনে প্রথমেই একটি ল্যাটিন খৃষ্টান কমিউনিটির মধ্যে তাদের নেতৃত্ব দিয়ে তাদেরকে জড়ো করবার কাজে এগিয়ে এলেন। তদানীন্তন সময়ে এই কমিউনিটির লোকজন সমাজের বিভিন্ন দিক দিয়ে পিছিয়ে ছিলেন; এদেরকে জড়ো করে, এদের বঞ্চনার প্রতিবাদ ধ্বনিত করবার কাজে এদেরকে সংগঠিত করবার দায়িত্ব নিলেন শ্রীমতী মাসক্রেনে। এরই পাশাপাশি তিনি আরো একটি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন; এটি হচ্ছে 'নিভাবথনম্' অর্থাৎ সংযোগ; এর উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি ভিন জাতিদের একসঙ্গে যুক্ত হওয়া, বিচ্ছিন্ন মনোভাব দূর করে উভয় জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা। এই আন্দোলনে অ্যানী মাসাক্রেনের ভূমিকাও ছিল সক্রিয়। তিনি এইসব মানুষকে সংগঠিত করেন এবং এদের পক্ষে রাজ্য বিধান সভায় দাবীপত্র পেশ করা হয়।

১৯৩৮ সালে ত্রিভাংকুর রাজ্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেস রাজ্যের মধ্যে দায়িত্বপূর্ণ সরকার প্রতিষ্ঠা করবার দাবী নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করে; এ-আন্দোলনেও অ্যানী মাসক্রেনের ছিল সক্রিয় অংশগ্রহণ। এই সময় থেকেই তিনি কংগ্রেসের কাজে নিজেকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে থাকেন। আন্দোলন চলাকালীন তাঁকে নির্মমভাবে নির্যাতন সহ্য করতে হয় এবং তিনি গ্রেপ্তার হন। বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেস আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে এর পরেও বেশ কয়েকবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। রাজ্য কংগ্রেস আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং গান্ধীজীর প্রভাবে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁকে কংগ্রেসের বিভিন্ন কর্মসূচীতে দেখা গিয়েছে সক্রিয় ভূমিকায়।

বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল। স্বাধীনতালাভের পরও অ্যানী মাসক্রেনে রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সক্রিয়ভাবেই। স্বাধীনতা আসবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যা এবং একই সঙ্গে রাজ্য বিধান সভার সদস্যা নির্বাচিত হন। কিছুদিনের জন্য ত্রিভাংকুর-কোচিন রাজ্যের মন্ত্রী হন এবং জনস্বাস্থ্য, বিদ্যুতের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রের কিছু কিছু দুর্নীতি তাঁর নজরে পড়লে তিনি তার প্রতিবাদ করেন; এর ফলে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং তিনি কংগ্রেস

পার্টি থেকে ইস্তফা দেন।

১৯৫১ সালে তিনি লোকসভা নির্বাচনে একজন নির্দল প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং যথাযথভাবে নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেত্রী রূপে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক মহিলা সম্মেলনে (International Democratic Women's Conference) যোগদান করেন। পরবর্তী নির্বাচনেও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন কিন্তু পরাজিত হন। এরপর থেকেই কিছুদিনের মধ্যে তিনি সক্রিয় জনজীবনের কার্যাবলী থেকে অবসর নেন ; তাঁর শরীর ক্রমশঃ ভেঙে পড়তে থাকে। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ সাহসী, উদার মনোভাবাপন্ন, স্বাধীনচেতা মহিলা। তাই জীবনের শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সংগ্রামের মঞ্চে কাজ করেছেন। কিন্তু তাঁর স্বাধীন মনোভাব অসাধু কার্যকলাপ বরদাস্ত করতে পারেনি ; তাই তিনি প্রতিবাদও করেছেন দৃঢ়ভাবে। ১৯৬৩ সালে এই মহিয়সী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে চিরনিদ্রায় শায়িতা হলেন।

আম্মা এ. ভি. কুট্টিমালু

(১৯০৫—)

দক্ষিণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলনের পুরোধা যে সমস্ত পুরুষ এবং মহিলার নাম করা যেতে পারে, তার মধ্যে মহিলা নেতৃত্ব হিসাবে প্রথম সারির যে নামগুলি ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলনের ইতিহাসের পাতায় মুদ্রিত হবার যোগ্যতা রাখে সেগুলির মধ্যে যাঁর নাম করা যেতে পারে তিনি হলেন আম্মা এ. ভি. কুট্টিমালু। বর্তমানের কেরালার পূর্বের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী বিভাগের মালাবার জেলায় আম্মা এ. ভি. কুট্টিমালু তাঁর মামার বাড়ীতে ১৯০৫ সালের, ২৩-শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হিন্দু নায়ার সম্প্রদায়ের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের। তাঁর পিতা ছিলেন পেরুমপিলাভিল গোবিন্দ মেনন। ইনি মাদ্রাজ সরকারের রাজস্ব দপ্তরে কর্মরত ছিলেন। তাঁর মাতার নাম মাধবী আম্মা।

১৯২৫ সালে কুট্টিমালুর বিবাহ হয়, তাঁর স্বামী কোজিপুরথু মাধব মেনন, পেশায় এডভোকেট্ এবং সামাজিক কর্মধারার দিক দিয়ে কালিকুট নামক শহরের নেতৃত্ব স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে একজন হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁদের দুই পুত্র এবং দুই কন্যা ছিল। বাল্যের শিক্ষাপ্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলা যেতে পারে যে কুট্টিমালুর শিক্ষাগ্রহণ হয় কয়েকটি স্থানের বিদ্যালয় থেকে; এগুলি হোলো, টেলিচেরী, মাদ্রাজ এবং কালিকুট। এইসব স্থানের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের

মাধ্যমে তিনি ইংরেজী, মালায়লাম, তামিল, তেলেগু, হিন্দি প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। এই সব ভাষাগুলির উপর তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল ; তিনি এই ভাষাগুলি পড়তে ও লিখতে পারতেন।

বিবাহের পর আম্মা এ. ভি. কুট্টিমালু তাঁর স্বামীর আদর্শে প্রভাবিত হন এবং তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন কাজে ধীরে-ধীরে যুক্ত হয়ে পড়েন। কাজিপুরথ্ মাধব মেনন ছাড়া আর যে সমস্ত ব্যক্তির অনুপ্রেরণা তাঁকে রাজনৈতিক কার্যাবলীর প্রতি আগ্রহী করেছিলো, তাঁরা হলেন,—সরোজিনী নাইডু, গান্ধী এবং কুট্টিমালুর বিমাতা কে. এম. আম্মা। গান্ধীজীর শিক্ষা, সরোজিনী নাইডুর ব্যক্তিত্বপূর্ণ অনুপ্রেরণা, রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যকলাপ, স্বামীর সহযোগিতা প্রভৃতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ক'রে তাঁকে সামাজিক, রাজনৈতিক কার্যাবলীর দিকে আগ্রহী করে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ১৯২৫ সালে তাঁর বিবাহের পর তিনি যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিলেন, তখন থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু হয়। এরপর থেকেই তিনি তাঁর কর্মধারাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন।

কর্মমুখর দিনগুলির মধ্য দিয়ে তিনি এগিয়ে চলেন, বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদমর্যাদার মধ্য দিয়ে তিনি কংগ্রেস সংগঠনে নিজেকে উন্নীত করতে থাকেন। তাঁর কর্মের পরিধি দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে চলতে থাকল,—কালিকুট টাউন কংগ্রেস কমিটির তিনি সভাপতি হন ; তিনি মালাবার জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদে নির্বাচিত হন এবং পরবর্তী সময়ে ১৯৩২ সালে কেরালা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পরিচালনার দায়িত্বভার নেন। বিভিন্ন সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তাঁকে যথাক্রমে ১৯৩২ সাল, ১৯৪০ সাল এবং ১৯৪২ সালের জন্য তিনবার কারাবরণ করতে হয়। এছাড়া, ভেলোরে মহিলাদের প্রেসিডেন্সী জেলে তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য বন্দী জীবন কাটাতে হয়।

১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত, মাদ্রাজ বিধান-সভার তিনি সদস্যা হিসাবে নির্বাচিত থাকেন। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সময়ের জন্য তিনি মাদ্রাজ ইউনিভারসিটির সিনেটের সদস্যা ছিলেন। স্বাধীনতার পরেও তিনি তাঁর, রাজনৈতিক কর্মধারাকে অব্যাহত রাখবার চেষ্টা করেছেন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে তিনি কেরালা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেস

কমিটির সদস্যা নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল, চার বছরের জন্য তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যা নির্বাচিত হন।

কুট্টিমালু আম্মা সমাজসেবামূলক কাজের প্রতি গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন। কালিকটের 'পুওর হোম সোসাইটির' তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি। এখানে তাঁকে প্রতিবন্ধী, অনাথ, দরিদ্র, কুষ্টদের সেবার কাজ করতে হোতো। হরিজন সমাজ-কল্যাণ কেন্দ্রের তিনি ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা। এছাড়া, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে, বিধবা বিবাহের পক্ষে, অসবর্ণ বিবাহের পক্ষে এবং খাদিবস্ত্র পরিধান অভিযানের পক্ষে তিনি সবসময়ই কাজ করে গিয়েছেন। সামাজিক পদক্ষেপ হিসাবে, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়তা এবং স্বনির্ভর আয়ের পথ প্রশস্ত করে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। জাতীয় সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিজেকে একটা উদাহরণ হিসাবে দাঁড় করিয়ে তিনি মালাবার এবং তামিলনাড়ুর মহিলাদের কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং তাদের সংগ্রামের এবং বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করাবার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন যথেষ্ঠ ভাবে।

আম্মু স্বামীনাথন্

(১৮৯৪—)

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ারে দক্ষিণ ভারতের বিপ্লবীরা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন; পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে বেরিয়ে এসেছিলেন মাতৃভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করবার আহ্বানে। সংখ্যা বিচারে নগণ্য হলেও সেদিন কিছু মহিলা এ আন্দোলনের জোয়ারের বিপরীত গতির তীব্রতাকে উপেক্ষা করে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতে এগিয়ে এসেছিলেন। আম্মু স্বামীনাথন্ এঁদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম।

আম্মু স্বামীনাথন্ ১৮৯৪ সালে আনাক্কায়া শহরের ভেদাকাথ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গোবিন্দ মেনন ছিলেন পেরামপিলাভিল পরিবারের; তিনি মাদ্রাজ সরকারের অধীনে অফিসারের পদে চাকুরী করতেন। আম্মু স্বামীনাথনের মাতার নাম ছিল আম্মু আম্মা। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উত্তর কেরালার সুপরিচিত নায়ার পরিবারের সন্তান। ১৯০৮ সালে মাদ্রাজের একজন প্রখ্যাত আইনজীবী ডঃ স্বামীনাথনের সঙ্গে আম্মুর বিবাহ হয়। আম্মু স্বামীনাথনের শিক্ষাগত মান প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত; কিন্তু বিবাহের পর তিনি স্বামীর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করতে থাকেন। তাঁর জ্ঞান এবং সামাজিক দক্ষতা পরবর্তীজীবনে পরিপক্কতা লাভ করে এত বেশী যে, তিনি বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের তুলনায় অনেক বেশী জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ, বিবাহিত জীবনে তিনি শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপরিক্রমা এবং বিভিন্ন সামাজিক সমিতিতে কাজের

সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। এ ব্যাপারে তাঁর স্বামীর উদ্যোগ এবং সহযোগিতাই তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

ডঃ স্বামীনাথন্ যখন মাদ্রাজে আইন ব্যবসা করতেন, তিনি তখন তাঁর স্ত্রীকে জনগণের কাজের মধ্যে যুক্ত হবার জন্য প্রেরণা দিতেন, বিশেষকরে সমাজকল্যাণমূলক কাজে। মাদ্রাজের সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলনের জন্য গঠিত কমিটির সদস্যাদের মধ্যে আম্মু স্বামীনাথন্ ছিলেন একজন। তাঁর চিন্তাকে আদর্শ রূপ দেবার মূলে উদ্যোগ ছিল শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, লালা লাজপত রাও, জওহরলাল নেহেরু, প্রমুখ নেতৃত্বের; এইসব নেতৃবৃন্দ তাঁকে কাজে এগিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট প্রেরণাও দিতেন। ১৯৩৪ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি মাদ্রাজ শহরের কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৪২ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলন দেশব্যাপী এক কর্মকাণ্ডের উদ্দীপনায় মেতে ওঠে। এই সময় তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে নেমে পড়েন। আন্দোলনের কাজে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তাঁকে দু'-দুবার কারাবরণ করতে হয়। ১৯৪৬ সালে কেন্দ্রীয় রাজ্যসভা এবং পরবর্তী বছরে সংবিধান তৈরী কমিটির সদস্যা নির্বাচিত হন। স্বাধীনতালাভের পরও তিনি দেশের কাজে তাঁর কর্মধারাকে অব্যাহত রাখবার চেষ্টা করেছেন। ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে ১৯৪৮ সালে তিনি ইথোপিয়া, ১৯৪৯ সালে জেনেভায় UNESCO সম্মেলনে এবং সেই বছরই কোপেনহেগেনের আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি লোকসভার সদস্যা ছিলেন। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত রাজ্যসভার সদস্যা হিসাবে কাজ করেন।

আম্মু স্বামীনাথন্ কিছুদিনের জন্য মাদ্রাজের আঞ্চলিক এবং কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেনসর বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া, ফিল্ম সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত তিনি ভারত স্কাউট এণ্ড গাইডস্-এর সভাপতি ছিলেন। ভারত স্কাউট এণ্ড গাইডস্-এর সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন তিনি বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মধ্যে বিশেষকরে নারী ও শিশুকল্যাণ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ষাটের দশকের শেষে বলতে গেলে সত্তরের দশক থেকেই তিনি তাঁর কর্মমুখর জীবন থেকে কিছুটা ছুটি চাইছিলেন, বয়সের ভারও তাঁকে

ভারাক্রান্ত করে দিচ্ছিল। দেশমাতৃকার সেবার পাশাপাশি তিনি তাঁর সংসারজীবনের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন সবসময়ই। তাঁর সন্তানদের মধ্যে গোবিন্দ মাদ্রাজের এড্‌ভোকেট জেনারেল; সুব্বরাম আই. এন. এ.-র লক্ষ্মী সেনাবাহিনীর প্রধান পদে নিযুক্ত; কন্যা মৃণালিনী সরাভাই বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী। তাঁর চিন্তাধারা ছিল অত্যন্ত প্রগতিশীল। ধর্মগত প্রথা এবং সামাজিক বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞাগুলিকে তিনি সবসময়ই মেনে নিতে পারেন নি মন থেকে, প্রতিবাদও করেছেন। নারী-পুরুষ সমানাধিকারের প্রশ্নে তাঁর মত ছিল সর্বদাই পক্ষে; এর পক্ষে তাঁর কণ্ঠও ছিল সোচ্চার। ফিল্ম বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন তিনি সবসময়ই সুরুচিসম্পন্ন সিনেমা তৈরীর পক্ষে রায় দিয়েছেন।

তাঁর এ ধরনের কার্যকলাপ তদানীন্তন যুবসমাজের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। জাতীয়তাবাদের প্রভাবশালী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তিনি কেরালা থেকে এসেছিলেন। জীবনের চলার পথে প্রতিটি দিনের জন্য নিপীড়িত মানুষজনের পাশে থাকবার, তাদের ব্যথা অনুভব করবার চেষ্টা করে গিয়েছেন। জনগণের মধ্যে এবং সামাজিক কার্য পরিধির মধ্যে তিনি চেরিয়াম্মা অর্থাৎ আন্টি নামে পরিচিত ছিলেন।

অ্যানী বেশান্ত

(১৮৪৭—১৯৩৩)

ভারতের মাটিকে ভাল বেসেছেন এমন বিদেশী নারীর সংখ্যা স্বল্প হলেও উল্লেখ করবার মতো। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথমে যে নারীর কর্ম-জীবনের প্রতিমূর্তি ভারতবাসীর সামনে ভেসে ওঠে তিনি হলেন লণ্ডনের অ্যানী বেশান্ত। আইরিশ মাতার গর্ভে ও ইংরেজ পিতার ঔরসে ১৮৪৭ সালের ১লা অক্টোবর, ইংল্যাণ্ডের রাজধানী লণ্ডন শহরে অ্যানী বেশান্তের জন্ম হয়। তাঁর পিতৃদত্ত নাম কুমারী উড্। পিতা উইলিয়াম পেজ উড লণ্ডনের একজন বিশিষ্ট ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তারী শাস্ত্র ছাড়াও দর্শন এবং অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। শৈশবে কুমারী উড্ সঙ্গীত এবং ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় শিক্ষালাভ করেন। বিখ্যাত ইংরেজ নভেল লেখক ক্যাপ্টেন মারায়াটের ভগ্নীর সঙ্গে কৈশোরে তাঁর বিশেষ সম্প্রীতি হয় এবং সেই সময়েই তিনি জার্মানী, ফ্রান্স, প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন।

ইউরোপ পরিভ্রমণ শেষ করে তিনি যখন স্বদেশে ফিরে আসেন, তখন তাঁর ঘটনাবহুল দীর্ঘজীবনের সূত্রপাত ঘটে। ১৮৬৭ সালে রেভারেণ্ড মিঃ ফ্রাঙ্ক বেশান্ত নামক এক ধর্ম যাজকের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দাম্পত্য জীবন শুরু হবার সঙ্গেই তাঁর জীবনের ধারা বদলে গেল ; রেভারেণ্ড বেশান্তের সঙ্গে তাঁর অন্তরের কোনো মিল হোলো না, দুজনের প্রবৃত্তি, মনোবৃত্তি, শিক্ষা ও আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের হওয়ার দরুন তাঁদের বিবাহিত জীবন বিষাদপূর্ণ হয়ে উঠল। এখানে

অ্যানী বেশান্তের চরিত্রের মূলগত বিশেষত্বের উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি যেমন এক অপূর্ব স্বাস্থ্যের অধিকারী, ব্রহ্মচর্য তেমন তাঁর মনের স্বধর্ম। যে তত্ত্ব বা যে আদর্শ তিনি সত্য বলে বিশ্বাস করতেন, মনের সমস্ত আবেগ ও অনুরাগ প্রাবল্য দিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরেছেন এবং সেই আদর্শ অনুযায়ী বাইরের ও ভিতরের সকল জিনিষকে গড়ে তুলেছেন। যদিও জীবনে তিনি বহু মত ও আদর্শের আবর্তের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু যখন যে আদর্শ গ্রহণ করেছেন, তখন সে আদর্শের চরমপন্থা অবলম্বন করেছেন।

বিবাহের যৌন সম্বন্ধের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা ছিল, তাই বিবাহের পর সহসা অন্তরের সেই বিতৃষ্ণার সম্মুখীন হওয়ার ফলে তাঁর আদর্শবাদী মন সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তিনি সমস্ত চিত্তকে সংহত করে খৃষ্টান ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী নানাবিধ কার্যের মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে দিলেন। সেই সময় ইংল্যাণ্ডে খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে এক নতুন স্বাধীন মতবাদের প্রসার ঘটতে আরম্ভ করল। মানুষ ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্ব এমনকি ঈশ্বরকে অস্বীকার করতে শিখল। নবশক্তিতে উদ্বুদ্ধ বিজ্ঞান এই নাস্তিক্যবাদের ভিত্তিকে আরো দৃঢ় করে তুলেছিল। মিলের দর্শন তখন সমগ্র চিন্তাশীল ইংলণ্ডকে এই নব সন্দেহ বাদে চিহ্নিত করেছিল।

এই সময় অ্যানী বেশান্তের জীবনের চারিদিকে নানা প্রকারের অশান্তি ও বিপত্তি জমা হয়ে উঠতে লাগল এবং তাঁর ভাবপ্রবণচিত্তে সেগুলি শতগুণ বর্দ্ধিত হয়ে দেখা দিতে লাগল। শৈশব থেকেই মাতৃ স্নেহে বর্দ্ধিত হওয়ায়, মাতার প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। ঋণের দায়ে তাঁর মাতাকে আদালতের শরণাপন্ন হতে হোলো; নিজের জীবনেও আদর্শগত ও ব্যবহারগত নানারূপ অশান্তি দেখা দিল। এই সমস্ত দুঃখ বা সাংসারিক তিক্ততা সাধারণ চিত্তে কোনো রেখাপাত করে না,—একান্ত স্বাভাবিক বলে মনে হয় বলে তারা এই সমস্ত বিরূপ অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু একপ্রকারের আত্মকেন্দ্রিক ভাবপ্রবণ চিত্ত আছে, যারা সামান্য বিরূপ ঘটনার সম্মুখীন হলেই বিচলিত হয়ে ওঠে এবং সেই সামান্য ঘটনাটুকু এতবড় হয়ে তাঁদের সামনে উপস্থিত হয় যে, ক্ষনিক ঘটনাই তাঁদের সমস্ত আদর্শের বিচারের মানদণ্ড হয়ে ওঠে। অ্যানী বেশান্তের মন ছিল ঠিক সেই ধরনের।

এই সময় একমাত্র শিশুকন্যা মৃত্যুমুখে পতিত হয়: কন্যার মৃত্যু তাঁর চিত্তকে একেবারে আলোড়িত করে তুলল। চারিদিকে যদি যন্ত্রণা,

মৃত্যু, জীবনযাপন করবার দুঃসহ গ্লানি অপ্রতিহতভাবে বিরাজ করবে, তবে ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্ব কোথায় ? কন্যার মৃত্যুর এই সূত্র বেয়ে তাঁর অনুরাগপ্রবণচিত্ত বিশ্বের মূলগত সমস্যা সমাধানের জন্য জাগ্রত হয়ে উঠল। ঈশ্বর যদি না থাকে, তবে কেন এই মিথ্যার বোঝা বয়ে বেড়াই ? তবে কেন নিত্য একমূর্তির সম্মুখে নতজানু হয়ে বসি ? তবে কেন আপনার ক্ষুদ্রত্বকে আরো ক্ষুদ্র করে, যে নাই, তার কাছে জীবনের ব্যাধির প্রতিকারের ঔষধ চাই।

মিসেস স্কট নামে তাঁর এক বিশেষ বান্ধবী ছিলেন ; তাঁরই বাড়ীতে সেই সময়কার ইংল্যাণ্ডের নাস্তিক্যবাদের প্রবর্তকগণের আড্ডা বসত। অ্যানী বেশান্ত সেই দলে যোগ দিলেন। বৈজ্ঞানিক জড়বাদের অন্যতম প্রচারক চার্লস ব্রাডলওর সঙ্গে এইখানেই তাঁর পরিচয় হয় ; তিনি তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়ে ওঠেন। ব্রাডলওর-এর দীক্ষায় তিনি মিল, বেন্হাম্, স্পেন্সারের গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হন এবং বৈজ্ঞানিক নাস্তিক্যবাদের প্রচারের জন্য সর্বান্তঃকরণে সকলশক্তি প্রয়োগ করেন। এখন থেকে গীর্জায় যাওয়া বন্ধ হোলো, নতজানু হোতে তাঁর সর্বদেহমন বিপ্লবী হয়ে উঠল ; স্বামীর সঙ্গে সংঘর্ষ আরো তিক্ত হোতে লাগল। যে আদর্শ তিনি বিশ্বাস করেন না, বাইরের কোনো সুবিধার জন্য, নিজের অন্তরের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারণ ক'রে সেইমত জীবন যাপন করাকে তাঁর অপরাধ বলে মনে হোতে লাগল। শেষ পর্যন্ত, আত্মীয় স্বজনের সমস্ত উপদেশ উপেক্ষা করে ১৮৭৩ সালে তিনি আইনত স্বামীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করলেন। এরপর, এক বছরের মধ্যে তাঁর মাতা, যিনি ছিলেন তাঁর জীবনের একমাত্র আশ্রয়স্থল, তিনি পরোলোক গমন করেন। মাতার লোকান্তর প্রাপ্তির সঙ্গেই তিনি খৃষ্ট ধর্মের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন।

একেবারে আশ্রয়হীন হয়ে তিনি বান্ধবী মিসেস স্কটের আদর্শ গ্রহণ করলেন এবং চিন্তার স্বাধীনতার আদর্শপ্রচারের জন্য আত্মনিয়োগ করলেন। এইসময় থেকেই তাঁর কর্মবহুল জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা শুরু হোলো। জগতের একজন বিশিষ্ট বক্তা হিসাবে অ্যানী বেশান্ত যে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তার প্রথম শিক্ষা হয়, এই চিন্তার স্বাধীনতা প্রচার কল্পে বিভিন্ন বক্তৃতায়। প্রথম প্রথম এই সমস্ত বক্তৃতা প্রদানের জন্য তাঁকে সবিশেষ নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল ; ইষ্টকপ্রহার থেকে শুরু করে আদালত পর্যন্ত বহুবিপত্তি সহ্য করতে

হয়েছে, কিন্তু মানুষ তার স্বাধীন চিন্তার অধিকার পাবে না, যে কথা সে সত্য বলে বিশ্বাস করে, তাকে মানবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে. মনুষ্যত্বের বিকাশের এত বড় প্রতিবন্ধকের বিরুদ্ধে সেদিন ইংল্যাণ্ডে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় তার মধ্যে এই নির্ভীক নারীর কণ্ঠস্বর ইংল্যাণ্ডের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ইংল্যাণ্ডের প্রত্যেক প্রদেশে পরিভ্রমণ করে তিনি স্বাধীন মতবাদের আদর্শ প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর আধার আকাঙ্ক্ষী মন এই নেতিবাদে বহুদিন সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে পারল না; যে সময় তাঁর আশ্রয় প্রবণ চিত্ত একটা আধারের অন্বেষণ করছিল, সেই সময় ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি ও কর্ণেল অলকট 'থিওসফিক্যাল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করে একটা নতুন ভাবতত্ত্বের প্রচার করছিলেন। নাস্তিক্যবাদ থেকে এই নতুন পারলৌকিক তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করবার মধ্যে অ্যানী বেশান্তের জীবন নানাবিধ ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।

১৮৭৪ সালের ২৫-শে আগষ্ট সাধারণ বক্তৃতা মঞ্চে তিনি সর্বপ্রথম বক্তৃতা করেন। এই সময় তাঁর সর্বপ্রথম পুস্তক 'ফ্রেঞ্চ রেভ্যালুশন' (ফরাসী বিপ্লব) প্রকাশিত হয়। ১৮৭৫ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডের ন্যাশানাল সেকিউলার সোসাইটির সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন। চার্লস ব্রাডল ছিলেন এর সভাপতি। ১৮৭৭ সালে তিনি ন্যাশানাল রিফর্মার নামে পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ঐ বছরেই জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে প্রকাশিত পুস্তক 'নোল টন প্যামফেট'-টি পুনঃপ্রকাশ করবার অপরাধে চার্লস ব্রাডলের সঙ্গে তিনিও রাজদ্বারে অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁদের পক্ষেই রায় আসে এবং তাঁদের প্রচেষ্টায় জন্মনিয়ন্ত্রণের আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডে 'ম্যালথুসিয়ান লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। অ্যানী বেশান্ত এই লীগের সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।

১৮৭৯ সালেই সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতির যোগসাধন ঘটে। এই বছরে ভারতীয় গভর্ণমেণ্টকে তীব্র সমালোচনা করে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর প্রথম পুস্তক 'ইংল্যাণ্ড, ইণ্ডিয়া এণ্ড আফগানিস্থান' প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবার জন্য ১৮৭৯ সালে তিনি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আভেবারীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ঐ বছরেই তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৮ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস. সি

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দক্ষিণ কেনসিংটন কলেজে বিজ্ঞানের আটটী বিষয়ে শিক্ষকতা করেন।

১৮৮০ সালে ইংল্যাণ্ড গভর্মেণ্টের তীব্র সমালোচনা করে অ্যানী বেশান্ত "কো-ইরোসিয়ন ইন্ আয়ারল্যাণ্ড, ব্রিটিশ রেজাণ্ট" নামে একটি পুস্তিকা বের করেন। আয়ারল্যাণ্ডে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মিশরীয় নীতির সমালোচনা করে 'আওয়ার শেমফুল ইজিপশিয়ান পলিসি' পুস্তিকা বের করেন। আয়ারল্যাণ্ডে ব্রিটিশ নীতির প্রতিবাদে তিনি নানাস্থানে বক্তৃতা দেন। ভারতবর্ষ, আয়ারল্যাণ্ড ও মিশর সম্বন্ধে ব্রিটিশ নীতির এই প্রতিবাদে সমগ্র ইংল্যাণ্ড ও সংলগ্ন উপনিবেশগুলির দৃষ্টি সহসা এই নারীর উপর নিপতিত হোলো। ১৮৮৩ সালে অ্যানী বেশান্তের সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা 'আওয়ার করনার' প্রকাশিত হয়; তদানীন্তন সময়ের বিশিষ্ট লেখক—বার্নার্ড শ, হেকেল প্রমুখ এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন।

১৮৮৫ সালে ফেবিয়ান সোসাইটিতে একজন বিশিষ্ট সভ্যরূপে তিনি যোগ দেন। সোসাইটির পক্ষে ইংল্যাণ্ডে সাম্যবাদ প্রচারের জন্য এবং শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি গভীরভাবে প্রচারকার্য করতে লাগলেন। এই সময় তাঁকে ইংরেজ সাংবাদিকদের কাছ থেকে বহু বিদ্রূপ ও কঠোর ব্যঙ্গ সহ্য করতে হয়। ইংল্যাণ্ডে সাম্যবাদের সেই প্রথম অভ্যুত্থানের সময় শ্রমিকদের শোভাযাত্রা করবার অপরাধে পুলিস গ্রেপ্তার করত এবং পুলিসের কথাতেই তাদের কারাদণ্ড হোতো। এই ব্যবস্থার প্রতিরোধ করবার জন্য অ্যানী বেশান্ত 'সোসালিষ্ট ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করলেন। শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করবার জন্য তিনি নানান প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন এবং শ্রমিকদের জন্য 'দি লিঙ্ক' (The Link) নামে আর একটি পত্রিকা বের করলেন।

থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ম্যাডাম ব্লাভাটস্কীর সঙ্গে ১৮৮৯ সালে অ্যানী বেশান্তের প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং এই বছরেই ১০-ই মে, তিনি এই সোসাইটির সভ্য হন। ব্লাভাটস্কীর মৃত্যুর পর এই সোসাইটি পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়ে অ্যানী বেশান্তের উপর। এই মতবাদ গ্রহণ করবার পর তিনি বহু পুস্তক রচনা করেন। প্রধান প্রধান পুস্তকগুলি হোলো,—'দি অ্যানসেণ্ট উইসডম্', 'ষ্টাডী ইন কনসাসনেস্', 'থিওজফি এণ্ড দি নিউ সাইকলজি,' 'দি ষ্টোরী অব দি গ্রেট ওয়ার,' 'রামচন্দ্র', 'দি আইডিয়াল কাইণ্ড,' 'ভগবত্গীতা, 'রিলিজিয়ান, অব

ইণ্ডিয়া, 'অটোবায়োগ্রাফী'।

('The Ancient Wisdon', 'Study in Consciousness, 'Theosophy and the New Psychology', 'The Story of the Great War', 'Ram Chandra', 'The ideal kind', 'Bhagavat Gita', 'Religions of India', 'Autobiography'.)

১৮৯৮ সালে হিন্দু কালাচার প্রচারের জন্য অ্যানী বেশান্ত ভারতবর্ষে এলেন এবং সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে অর্থ সংগ্রহ করেন এবং ভারতের অনেক রাজা মহারাজের নিকট থেকে অর্থ সাহায্য আদায় করেন। এই হিন্দু কলেজকেই কেন্দ্র করে বেনারসের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। ১৯১০ সালে কৃষ্ণমূর্তি এবং নিত্যানন্দ নামক দুই ব্রাহ্মণ বালককে তিনি তাঁদের অভিভাবকদের কাছ থেকে পোষ্য রূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯১২ সালেই ঐ বালকদ্বয়ের পিতা অ্যানী বেশান্তের কাছ থেকে পুত্রদ্বয়কে ফিরিয়ে নেবার জন্য আদালতে নালিস করে; চার বছর ধরে মামলা চলবার পর মামলা প্রিভি কাউন্সিলে ওঠে এবং পুত্রদ্বয়ের পিতার পক্ষেই রায় যায়। এ ব্যাপারে তিনি বেশ মর্মাহত হন।

১৯১০ সাল থেকে অ্যানী বেশান্ত ভারতের রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত হন। ভারতের শাসন সংস্কার সম্বন্ধে জনমত গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে তিনি এই সময় 'কমনওয়েলথ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করলেন। ভারতের স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য যে কয়খানি সংবাদপত্র এই শতাব্দীর প্রথমে সংগ্রামের তূর্যধ্বনি রণিয়া তোলে, সেগুলির মধ্যে অ্যানী বেশান্তের 'নিউ ইণ্ডিয়া' বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। ভারতের স্বায়ত্ব শাসন, অ্যানী বেশান্তের ভাষায় 'হোমরুল' প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। অ্যানী বেশান্তের প্রচার কার্যের ফলে সেদিন ভারত সমস্যা আবার সমস্ত পৃথিবীর সামনে, বিশেষ করে 'ইংল্যাণ্ডের সম্মুখে বড় হয়ে দেখা দিল। ১৯১৬ সালে মাদ্রাজে তিনি হোমরুল লীগের প্রতিষ্ঠা করলেন এবং সমস্ত ভারতবর্ষে তা প্রচার করবার জন্য রীতি মত ব্যবস্থা ও আয়োজন শুরু করলেন। ভারতের জনগণের কাছে তিনি তখন একান্ত সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। তাঁর এই প্রচার কার্যের ফলে ইংল্যাণ্ডের লোকরাও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বেশী মাত্রায় সজাগ হয়ে উঠলেন।

'নিউ ইণ্ডিয়ার' প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি তাঁর দিকে পড়ল; হঠাৎ প্রেস এ্যাক্ট অনুযায়ী ১৯১৬ সালের ২৬-শে মে তারিখে 'নিউ ইণ্ডিয়ার' কাছ থেকে দু' হাজার টাকা জরিমানা চাওয়া হোলো। এই ব্যাপারে সারা ভারতবর্ষে এক তুমুল আন্দোলন দেখা দিল। নিউ ইণ্ডিয়ার ডিফেন্স ফান্ড খোলা হোলো—ভারতবর্ষের চারিদিক থেকে সেখানে সাহায্য আসতে লাগল। অ্যানী বেশান্ত মাদ্রাজ হাই কোর্টে এই তলবের বিরুদ্ধে আপিল করলেন, রীতিমত মামলা চলতে লাগল। প্রেস এ্যাক্ট তুলে দেবার জন্য ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে সভা-সমিতি হতে লাগল। ভাইসরয়ের কাছে ডেপুটেশন পাঠানো হোলো; কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না। হাইকোর্টে তাঁর মামলা টিকল না। ভাইসরয় ডেপুটেশনের কথায় কর্ণপাত করলেন না।

কিন্তু এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ হোমরুল আন্দোলন ভারতের সর্বত্র আরো গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। অ্যানী বেশান্তের লেখনী ও বক্তৃতা অবিরাম ধারায় অনল বর্ষণ করতে লাগল। ১৯১৬ সালের ১০-ই জুলাই বোম্বাইয়ের গভর্ণমেণ্ট তাঁকে বোম্বে প্রবেশ করতে নিষেধ করে অনুজ্ঞা জারী করলেন। এই উপলক্ষে অ্যানী বেশান্ত লেখেন,—

"The more they try to strike me, the more resolved does India become to win freedom from such tyranny."

ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল একই অর্থাৎ এই বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে মধ্য-প্রদেশের সরকারও বোম্বাই সরকারের পন্থা অনুসরণ করলেন। অ্যানী বেশান্তকে মধ্যপ্রদেশে প্রবেশ করতে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হোলো। এই দমননীতিতে শ্রীমতী বেশান্ত বিন্দুমাত্র প্রতিহত হলেন না, কংগ্রেসও মুসলীম লীগের সঙ্গে যোগ দিয়ে তিনি আরো গভীরভাবে ব্যাপক আন্দোলন চালাতে লাগলেন। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে স্বায়ত্ব শাসনের প্রস্তাব সমর্থন করে অ্যানী বেশান্ত একটি অপূর্ব বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন :

"ভারতবর্ষ এখনও ইংল্যাণ্ডকে ভালবাসে; তবে সে প্রেস এ্যাক্টের ইংল্যাণ্ড নয়, ক্রিমিন্যাল এ্যামেণ্ডমেণ্ট আইনের ইংল্যাণ্ড নয়, সে ক্রমওয়েলের ইংল্যাণ্ড; হ্যামপ্ডেন, পিমের ইংল্যাণ্ড; মিলটন, শেলীর ইংল্যাণ্ড। ভারতবর্ষ ভালবাসে সেই ইংল্যাণ্ডকে যে ইংল্যাণ্ড একদিন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ম্যাটসিনীকে আশ্রয় দিয়েছিল; যে ইংল্যাণ্ডের লোক ইতালীর মুক্তি দাতা বলে গ্যারীবল্ডীকে প্রকাশ্যভাবে অভ্যর্থনা করে নিয়েছিল।"

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পর থেকে শ্রীমতী বেশান্ত কংগ্রেসের কার্যে সাক্ষাৎভাবে যোগদান করে ভারতের চারিদিকে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। এই সময় তাঁর লেখনী থেকে পুস্তিকার পর পুস্তিকা প্রকাশ হতে লাগল। তাঁর কার্যবিধি লক্ষ্য করে মাদ্রাজ-গভর্ণমেণ্ট তাঁকে দমন করবার বিষয় চিন্তা করতে লাগলেন। তখন লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড মাদ্রাজের গভর্ণর। তিনি অ্যানী বেশান্তকে ওটাকামণ্ডে ডেকে পাঠালেন, কিন্তু কারণবশতঃ তাঁদের মধ্যে সাক্ষাৎকার হোলো না। তখন লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড স্বয়ং মাদ্রাজে এসে অ্যানী বেশান্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ১৯১৭ সালের ১৬-ই জুন এই সাক্ষাৎকার হয়। সাক্ষাৎকার শেষ করে চলে আসবার সময় লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড বললেন, 'মিসেস বেশান্ত, আমি আপনাকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি, আপনার সমস্ত গতিবিধি বন্ধ করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নাই।'

শ্রীমতী বেশান্ত উত্তরে বললেন, "ক্ষমতা আপনার হাতে। আপনার যা ইচ্ছা আপনি তাই করবেন। কিন্তু একটা কথা বলতে চাই, এই আঘাত ভারতে ব্রিটিশের প্রভুত্বের উপর পড়বে।"—

এই সাক্ষাৎকারের এক ঘণ্টা পরেই সমগ্রভারতে দাবানলের মতো এই সংবাদ প্রচারিত হোলো যে, অ্যানী বেশান্ত ওটাকামণ্ডে (ইণ্টারনড্) নজরবন্দীরূপে আবদ্ধ হয়েছেন। অ্যানী বেশান্ত তাঁর এই অন্তরীণ-বাসের কথা পূর্বাহ্নেই জানতেন। তিনি একটা বিদায়বানী লিখে যান—

"ভারতবর্ষকে ভালবেসেছি বলেই এবং নিঃশেষে শেষ হয়ে যাবার পূর্বে তাকে জাগিয়ে তুলবার সহায়তা করেছি বলেই, বলপূর্বক আমাকে নিস্তব্ধ ও বন্দী করে রাখা হোলো। অন্যায়ের সহায়তা করা অপেক্ষা সেই বেদনা ভোগ করা শ্রেয়। আজ আমি বৃদ্ধা, কিন্তু আমার অন্তরের গভীর বাসনা যে মরিবার পূর্বে যেন আমি ভারতের স্বাধীনতা (হোমরুল) পাওয়া দেখে যেতে পারি। যদি সেই স্বপ্নকে সত্য করবার সাধনার অনুমাত্র সহায়তা করে থাকি, তাহলে আমি চরিতার্থ হয়েছি। ভগবান ভারতবর্ষকে রক্ষা করুণ, বন্দে মাতরম্।"

অ্যানী বেশান্ত যখন অবরুদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করছিলেন, ভারত-বর্ষে তখন ধীরে ধীরে জনগণমন সংক্ষুব্ধ করে একটা বিরাট আন্দোলন নিদ্রা অন্তে বাসুকীর মাথা তুলে উঠেছিল। এতদিন ধরে যে মোহ-নিদ্রায় এই কোটী কোটী লোক আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, বহুদিনের প্রচারের ফলে তারা নতুন সূর্যের আলোকে ধীরে ধীরে জেগে উঠছিল। ভারত

সমুদ্রের তীরে নবোদিত সূর্য্যের এই রশ্মিচ্ছটা ইংল্যাণ্ডের শাসক সম্প্রদায় লক্ষ্য করছিলেন—তারা লক্ষ্য করেছিলেন দিন দিন সেই সূর্য্য মধ্যাহ্ন রবির গৌরব অর্জন করতে চলেছে। তাই সেদিন ইংল্যাণ্ড থেকে ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু ঘোষণা করলেন যে, ভারত শাসন সংস্কার দেওয়া হবে এবং প্রত্যক্ষভাবে ভারতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবার জন্য তিনি ভারতে আসবেন।

১৯১৭ সালের শেষের দিকে অ্যানী বেশান্ত মুক্তি পান। মুক্তিলাভের পর তিনি ভারতের যে নগরে পদার্পণ করেছেন, সেই নগরেই তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য এক মহাসমারোহের সৃষ্টি হয়েছে। মুক্তির পর তিনি কলকাতা কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হলেন। কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তিনি যেদিন কলকাতায় প্রবেশ করেন, সেদিনের অভ্যর্থনা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা চিরদিন তা স্মরণে রেখেছেন। এরপর দু'টি ঘটনা ভারতবর্ষের রাজনীতিকে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় পরিচালিত করল,—একটি মিঃ মণ্টেগুর শাসন সংস্কার এবং অপরটি জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড। একদল মণ্টেগুর প্রবর্তিত শাসন সংস্কারকেই ভারতের স্বাধীনতার প্রতিকূল বিবেচনা করে তাকে বর্জন করল। অপর দল একে গ্রহণ করল। শ্রীমতী বেশান্ত দ্বিতীয় দলে যোগদান করলেন এবং এই শাসন সংস্কারের দানকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সুফল বলে প্রচার করতে লাগলেন।

ভারতের ভাগ্যাকাশে তখন দ্বাদশ সূর্য্যের জ্যোতি নিয়ে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল। তারই কিরণচ্ছটায় পাঞ্জাব থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠল। তিনি হলেন অহিংসা আন্দোলনের বাণী বহনকারী মহাত্মা গান্ধী। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে জালিয়ানওয়ালাবাগের হিন্দু-মুসলমান শিখের মিলিত রক্তের অভিনব অর্ঘ্য নিয়ে ভারতে নব যুগ এলো। স্বাধীনতার নতুন সংজ্ঞা হোলো,—সংগ্রামের নতুন ধারা প্রবর্তিত হোলো। শ্রীমতী বেশান্ত এই নতুন ধারার সঙ্গে নিজের অন্তরের মিল পেলেন না। তিনি প্রকাশ্যভাবে মহাত্মা গান্ধীর কর্মপন্থার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করলেন। কিন্তু 'Young India'-র বাণী 'New India'-র ভাষাকে মলিন করে দিল। আর সেদিন থেকেই অ্যানী বেশান্ত কংগ্রেসের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন; তাঁর লেখনী কখনো কংগ্রেসের সপক্ষে, কখনো বিপক্ষে চালনা করে তিনি তাঁর আদর্শমত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে পুষ্ট করবার চেষ্টা

করতে লাগলেন। এর পরবর্তী সময়ে ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৪ সাল, এই সময়ের মধ্যে কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে যদিও তিনি কিছু করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তা ফলবতী হয়নি। তবে শিক্ষা জগতে তাঁর বিচরণ ছিল, ১৯২৫ সালে তিনিই প্রথম তিনটি কমলা বক্তৃতা করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৩০ সাল থেকেই তাঁর শরীর ক্রমে ভাঙতে থাকে এবং ১৯৩৩ সালের ২১-শে সেপ্টেম্বর তিনি চির শান্তির নিদ্রায় শায়িতা হলেন।

তিনি তাঁর সারা জীবনের সংগ্রামের মধ্যে একটি কথাই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যেটা ছিল, 'She tried to follow Truth' অর্থাৎ তিনি সত্যকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন।

আশালতা সেন

(১৮৯৪—১৯৮৬)

স্বাধীনতার উনচল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল ; পরাধীন ভারতকে শৃঙ্খলমুক্ত করবার জন্য যে অগণিত নর-নারী তাঁদের কঠোর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন ভারতবাসীর কাছে আজও তাঁরা নমস্য। দেশ-মাতৃকার কাজে তাঁদের আত্মত্যাগের মহিমা অবর্ণনীয়। বিংশ শতাব্দীর এই আত্মত্যাগমূলক কর্মে যে সকল বীরসেনানী তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ভারতের মাটিতে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের দশকগুলিতেই। ভারতের সর্বত্র বিশেষ করে বাংলার চতুর্দিকে সাজ সাজ রব উঠে গিয়েছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। বাংলার নারীরাও ঘরে বসেছিলেন না। কয়েকজন নেত্রী ও কর্মীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাংলার নারীরা বেরিয়ে এসেছিলেন দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমুক্তির কাজে। যে স্বল্প সংখ্যক কর্মী ও নেত্রী প্রাণপণ প্রচেষ্টায় পূর্ববাংলার নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন, আশালতা সেন তাঁদের অন্যতম।

১৮৯৪ সালের ৫-ই ফেব্রুয়ারী নোয়াখালিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আশালতা সেন। তাঁর পিতা বগলামোহন দাশগুপ্ত নোয়াখালি জজ-কোর্টের উকিল ছিলেন ; মাতা মানদা দাশগুপ্তা। তাঁর পিতৃভূমি ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বিদগাঁও গ্রামে। ছেলেবেলা থেকেই আশালতা [illegible] কবিতা রচনা করবার অভ্যাস ছিল। বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার

বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হয় ১৯০৪ সালে ; সেই বছরেই 'অন্তঃপুর' নামক একটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তাঁর একটি জাতীয়তাভাবমূলক কবিতা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তখন তাঁর বয়স মাত্র দশ বছর। এই সাহিত্যানুরাগ তাঁর জীবনে ক্রমশঃ বিকশিত হয়। পরিণত বয়সে তিনি বাল্মীকির মূল রামায়ণ সংক্ষিপ্ত আকারে বাংলা কবিতায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন।

১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে যখন বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ কার্যকরী রূপ নেয়, তখন আশালতা সেনের মাতামহী নবশশী দেবী, সুশীলা সেন, কমলে কামিনী গুপ্তা প্রমুখ মহিলাগণ 'মহিলা সমিতি', 'স্বদেশী ভাণ্ডার', ইত্যাদি স্থাপন করে বিক্রমপুর অঞ্চলে স্বদেশী প্রচারে উদ্যোগী হন। এই সময় নবশশী দেবী বিলাতী বর্জনের সংকল্পপত্র, দৌহিত্রী আশালতাকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে স্বদেশীব্রতে দীক্ষিত করেন এবং গ্রামের মেয়ে ও বৌদের স্বাক্ষর করাবার দায়িত্বভারও তাঁর উপর অর্পণ করেন। সেই এগারো বছর বয়সেই ছোট্ট মেয়ে আশালতা গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরে স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে থাকেন ; দেশের কাজে এই প্রথম তাঁর হাতেখড়ি।

ক্রমে দিদিমা নবশশী দেবীর প্রেরণায় আশালতা সেন টডের রাজস্থান, শিখ যুদ্ধের ইতিহাস, মণিপুরের টিকেন্দ্রজিতের কাহিনী, ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনী ইত্যাদি নানান পুস্তক পাঠ করতে থাকেন। এর মধ্যে কখন তাঁর মানসলোকে নিজের দেশের স্বাধীনতা-লাভের আকাঙ্খার বীজ উপ্ত হয়। অল্প বয়সেই তাঁকে সংসার-জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয়। সংসারজীবন যাপনের কয়েক বছর পরে ১৯১৬ সালে তাঁর স্বামী সত্যরঞ্জন সেনের অকাল মৃত্যুতে তিনি শিশুপুত্র নিয়ে অত্যন্ত বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে পড়েন। এরপর থেকেই তিনি রাজনৈতিক কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় মহাত্মাগান্ধীর আদর্শ তাঁকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করে। তিনি তখন কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন ; তিনি ঢাকার গেণ্ডারিয়ায় তাঁর শ্বশুরমহাশয়ের সহায়তায় নিজেদের বাড়ীতে মহিলাদের জন্য 'শিল্পাশ্রম' নামে একটি বয়নাগার স্থাপন করেন। এ বয়নাগারে তিনখানা ফ্লাই-শাট্‌ল তাঁত যখন মহিলাদের হাতে স্বশব্দে চলতে থাকত তখন সেই তাঁত বোনার কাজ দেখতে পাওয়া তখনকার দিনে দুর্লভ ছিল, পাড়ার মহিলাগণ এই খদ্দর বোনার কাজ দেখতে ভীড় করে এসে দাঁড়াতেন।

১৯২২ সালে ঢাকা জেলার মহিলা প্রতিনিধিরূপে তিনি যোগদান

করেন গয়া কংগ্রেসে। সেই সময় থেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ হন। মহিলাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা এবং গান্ধীজীর বাণী প্রচার করবার উদ্দেশ্যে ১৯২৪ সালে তিনি সরমা গুপ্তা ও সরযূবালা গুপ্তার সহযোগিতায় 'গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি' নামক সংগঠনটি স্থাপন করেন। সমিতির মহিলাগণ নিজেরাই খদ্দরের বোঝা কাঁধে নিয়ে অনেক দূরে দূরে চলে যেতেন এবং ঘরে ঘরে গিয়ে খদ্দর বিক্রি ও প্রচারকার্য করতেন। সমিতির বার্ষিক শিল্পমেলাতে একটি 'গান্ধীমণ্ডপ' তৈরী করা হত। সেখানে বুদ্ধদেব থেকে শুরু করে গান্ধীজী পর্যন্ত, বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত মূর্তি ও ছবি রাখা হত। কিভাবে আড়াই হাজার বছর পূর্বে বুদ্ধদেবের প্রচারিত অহিংসার বাণী গান্ধীজীর ভিতর দিয়ে বর্তমান যুগে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে সে সম্বন্ধে মেলায় সমবেতভাবে লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া হত। এই 'গান্ধীমণ্ডপ'টি সকলের নিকট একটি আকর্ষণের বস্তু ছিল।

১৯২৫ সালে আশালতা সেন নিখিলভারত কাটুনী সংঘের (A.I.S.A) সদস্য হন এবং ব্যাপকভাবে খদ্দর প্রচারের কাজে ব্রতী হন। ১৯২৭ সালে ঢাকায় মহিলা কর্মী তৈরী করবার জন্য তিনি 'কল্যাণ কুটির আশ্রম' স্থাপন করেন। আশ্রম গঠনে তিনি তাঁর শ্বশুর এবং 'বিদ্যাশ্রমে'র প্রতিষ্ঠাতা ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, উভয়ের সহযোগিতা পান। ১৯২৯ সালে গেণ্ডারিয়ার নিকটবর্তী জুড়ান নামক একটি নমশূদ্রপ্রধান গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে সরমা গুপ্তার সহযোগিতায় তিনি 'জুড়ান শিক্ষা মন্দির' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই অঞ্চলে তাঁরা ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতা দিয়ে অনুন্নত সম্প্রদায়ের গ্রামবাসীদের চিত্ত আকৃষ্ট করতেন এবং গ্রামবাসীদের নিজেদের উন্নতি সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করতেন।

সাধারণ গ্রামবাসীদেরও যে শিক্ষা পাবার, উন্মেষিত হবার, মানুষের মতো মানুষ হবার অধিকার আছে—এইসব ছবি যখন তারা চোখের সামনে দেখতো তখন তারা আকৃষ্ট হত, মুগ্ধ হয়ে শুনত তাঁদের কথা। তারা এক অনাগত সুখের স্বপ্ন দেখল, সেইদিনের, যেদিন তাদের মত দুঃস্থ এবং অবহেলিত সম্প্রদায়ের লোকেরাও শিক্ষিতের সম্মানে সম্মানিত হবে, সকল মানুষের ভালবাসা পাবে ; এর মধ্যে দিয়ে তারা চিনে নিতো গান্ধীজীকে, ভালবাসত তাঁর আদর্শকে এবং কংগ্রেসকে। 'জুড়ান শিল্প

মন্দির'-এর কাহিনী সরমা গুপ্তার জীবনীতে পাওয়া যাবে বিষদ ভাবে, এখানে শুধুমাত্র সংক্ষেপে উল্লেখিত হল।

১৯৩০ সালের ২২শে মার্চ, আশালতা সেন ও সরমা গুপ্তা তাঁদের সহকর্মীদের নিয়ে ঢাকায় 'সত্যাগ্রহী সেবিকা দল' নামে একটি সংগঠন করেন। তাঁরা এইসব কর্মীর দ্বারা আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন। ১৯৩০ সালের ১৩-ই এপ্রিল নোয়াখালি গিয়ে আশালতা সেন, সরমা গুপ্তা, উষাবালা গুহ প্রভৃতি লবণ আইন অমান্য করেন। নোয়াখালি থেকে বে-আইনী লবণ জল নিয়ে তাঁরা ঢাকায় এলেন। ঢাকায় বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে করোনেশন পার্কের বেদীর উপর উনুন জ্বালিয়ে তারা যখন একটি মৃৎপাত্রে লবণ জ্বাল দিতে থাকেন, তখন হাজার হাজার লোকের সমুদ্র যেন প্রবল উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। লবণ তৈরীর পর কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, কে কত তাড়াতাড়ি বে-আইনী লবণ কিনে আগেভাগে গ্রেপ্তার হতে পারবেন। আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডিত হন সত্যাগ্রহী সরযুবালা গুপ্তা, সুনীতি বসু, কামিনী বসু ও প্রতিভা সেন।

১৯৩০ সালের বিভিন্ন সময়ে আশালতা সেন ঢাকার বাইরে গিয়েও কংগ্রেস আন্দোলনের প্রচারকার্য পরিচালিত করেন। শ্রীহট্টের সরলাবালা দেবের আহ্বানে তিনি সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে শ্রীহট্টের বহু জায়গায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে বক্তৃতা ও প্রচারকার্য করতে থাকেন। এই একই উদ্দেশ্যে সুধাময়ী দাশগুপ্তের আহ্বানে তিনি ময়মনসিংহ ও জামালপুরে যান এবং পঙ্কজিনী দেবীর আহ্বানে চাঁদপুরে যান। তাঁর আহ্বানে জনসাধারণ গান্ধীজী ও কংগ্রেসের প্রতি একটা চুম্বকের আকর্ষণ বোধ করত, তাঁরা দলে দলে এ আন্দোলনে যোগ দিতে লাগল। ১৯৩১ সালে আশালতা সেন 'বিক্রমপুর রাষ্ট্রীয় মহিলা সংঘ' সংগঠন করেন। এই সংঘের বহু শাখা, তিনি বিক্রমপুরের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করে স্থাপন করেন। ফলে ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে বিক্রমপুরের মহিলাগণ বহু সংখ্যায় যোগদান করবার প্রেরণা লাভ করেন ও কারাবরণ করেন।

এইসময় গ্রামের পর গ্রাম পরিভ্রমণ করে যেতে যেতে আশালতা সেন ও তাঁর সহকর্মীগণ দুপুরে ও সন্ধ্যায় যেমন হিন্দু বাড়ীতে আশ্রয়গ্রহণ করতেন, তেমনি কখনো কখনো মুসলমান বাড়ীতেও আশ্রয়গ্রহণ করতেন। হিন্দু-মুসলমান নর-নারী নির্বিশেষে সকলেই কংগ্রেসের প্রতি এত

সহানুভূতিশীল ছিল যে, সর্বত্রই তাঁরা সমাদর ও সহযোগিতা পেয়েছেন। এই সময়কার একটি করুণ কাহিনীর উল্লেখ করছি। একদিন দুপুরে তাঁরা একটি গ্রামে এসে উপস্থিত হন। সেখানে একটি মুসলমান তাঁতী-বাড়ীতে তাঁরা আশ্রয়গ্রহণ করলেন। আশালতা দেখলেন, একটি সদ্য বিধবা মুসলমান বধূ তাঁতের কাপড় বুনবার জন্য 'তানা হাঁটছেন'। তাঁর বৃদ্ধা শাশুড়ী বাড়ীর এককোণে বসে দশ-বারোদিন পূর্বে মৃত যুবকপুত্রের জন্য উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করছেন। বিধবা বধূটি আশালতা সেনকে দেখে তাঁর 'তানা হাঁটা' কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রেখে কাছে এসে অশ্রুজলে বক্ষ ভাসিয়ে তাঁর সদ্য বৈধব্যের কাহিনী বললেন। কিন্তু দারিদ্রের শোক করবার জন্যও সময় নাই। তিনি তখনি আবার 'তানা হাঁটতে' উঠে গেলেন। কারণ ঐ 'তানা হেঁটে' তিনি যা উপার্জন করবেন তাই দিয়ে তাঁর দুই-তিনটি শিশুসন্তানসহ নিজের অন্নসংস্থান হবে। কাজেই সদ্য মৃত স্বামীর জন্য বুক ভেঙে গেলেও কিছুক্ষণ বসে বুক হালকা করবার অবসর তাঁর নেই। তাঁর দেহে একটি অনাগত শিশুর শীঘ্র আবির্ভাবের সম্ভাবনা সুস্পষ্ট। এই করুণ দৃশ্যটি আশালতা সেনের মনে চিরদিনের মত গাঁথা হয়ে যায়।

১৯৩১ সালের আগস্ট মাসে ঢাকাতে আশালতা সেন 'নারী কর্মী শিক্ষাকেন্দ্র' স্থাপন করেন। শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষাদাতার আসন গ্রহণ করেন মানভূমের কংগ্রেস নেতা নিবারণ দাশগুপ্ত। কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই নেতা গান্ধীজীর আদর্শ সম্বন্ধে কর্মীদের শিক্ষা এবং প্রেরণা দিতেন; তাঁর শিক্ষাদানের ধারা এমন ছিল যা আন্দোলনের সময় কর্মীদের প্রচার কার্যের সঙ্গে কর্মপ্রেরণা বিস্তার করতে করতে দলে নতুন কর্মীসহ গ্রেপ্তার বরণ করতে মানসিক শক্তির সঞ্চার করত। এই শিক্ষা শিবিরে ঢাকা শহর এবং বিক্রমপুর থেকে পঞ্চাশজন কর্মী শিক্ষাগ্রহণ করতেন। এদের মধ্যে শ্রীহট্ট থেকে আসা চারজন মহিলা ছিলেন। প্রথমে মেদিনীপুরে কাঁথির একটি গ্রামে এরূপ একটি নারী কর্মী শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়। এরপর ঢাকার এবং শ্রীহট্টের কর্মীরা ঐরূপ একটি শিক্ষাকেন্দ্র খোলেন। এই তিন জায়গার শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষাগুরু ছিলেন নিবারণ দাশগুপ্ত।

পিতাকে ঘিরে বসে যেমন করে মেয়েরা তন্ময় হয়ে গল্প শুনে শিক্ষা-গ্রহণ করে, ঠিক তেমনি করে এই পিতাসম গুরুর কাছে তাঁরা শিক্ষা নিতেন। মেদিনীপুরের শিক্ষাকেন্দ্র সম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন,

তিনি একবার শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষাদানের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন ; তিনি দেখলেন, মেয়েরা মন্ত্রমুগ্ধের মত ঋষিকল্প নিবারণ দাশগুপ্তের কথা শুনছেন,—কারো মাথায় কাপড় সরে গেছে, কারো বেশবাস অসম্বৃত, কেউ সন্তানকে স্তন্যপান করাচ্ছেন, কিন্তু সেদিকে কারো ভ্রূক্ষেপও নেই—কেবলমাত্র একাগ্রমনে গুরুর কথা শুনেই যাচ্ছেন ; হঠাৎ সেসময়ে বাইরের লোক উপস্থিত হওয়া মাত্র কর্মীরা লজ্জা ও সংকোচে বিব্রত ও সজাগ হয়ে উঠলেন। ঋষি নিবারণ দাশগুপ্ত ও সংসারী আগন্তুকের মধ্যে এই ছিল পার্থক্য। যে কয়েকটি কারণে মেদিনীপুর, ঢাকা ও শ্রীহট্টের মহিলা কর্মীগণ এত অধিক সংখ্যায় আন্দোলনে যোগদান করতেন এবং কারাবরণ করবার প্রেরণালাভ করতেন, তার মধ্যে গুরু নিবারণ দাশগুপ্তের শিক্ষা ও প্রেরণা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

১৯৩২ সালের ৪-ঠা জানুয়ারী গান্ধীজী গ্রেপ্তার হন ; এর ফলে বিভিন্নস্থানে আইন অমান্য আন্দোলন চলতে থাকে। ঢাকাতে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য ব্যাপকভাবে সভাসমিতির মাধ্যমে প্রচার কার্য চলতে থাকে। ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসেই 'গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি'-কে বেআইনী ঘোষণা করা হয় এবং 'কল্যাণ কুটির'-এর কর্মীদের আবাসগৃহ পুলিস তালা বন্ধ করে রাখে। সেই সময় আশালতা সেন শুধু ঢাকা শহরে নয়, বিক্রমপুরের অনেক মহিলাদেরও ঢাকায় এবং অন্যান্য স্থানে এনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করাতে থাকেন।

তিনি বিক্রমপুরের নশংকর গ্রামে গিয়ে স্থানীয় কর্মী কিরণবালা কুশারী ও প্রভাসলক্ষ্মী দেবীর সহায়তায় 'নশংকর মহিলা শিবির' স্থাপন করেন। এই শিবির স্হাপনের ব্যাপারে তিনি বিক্রমপুর মহিলাদের কাছ থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পান। ১৯৩২ সালের মার্চ মাসে গ্রেপ্তার হবার কিছুদিন আগে সরযূবালা সেনের উপর তিনি 'নশংকর মহিলা শিবির' পরিচালনার ভার দেন। এই গ্রাম পরিভ্রমণের সময় এই শিবিরের মহিলারা গ্রামের দফাদারদের কাছ থেকে যথেষ্ট সহানুভূতি পেতেন। আশালতা সেন তখন দৈনিক চার-পাঁচটা গ্রামে বক্তৃতা করে বেড়াতেন। গ্রামের সরকারী দফাদারেরা মিটিংয়ে বসে খুব আগ্রহের সঙ্গে কিছুক্ষণ বক্তৃতা শুনত। তারপর ধীরে সুস্থে উঠে থানায় গিয়ে এমন সময় সংবাদ দিত যে, থানার লোক আসবার আগেই মিটিংয়ের কাজ শেষ হয়ে যেত। কংগ্রেস আন্দোলনের উপর দফাদারদের এ ধরনের সহানুভূতি না থাকলে তাঁদের পক্ষে গ্রামে গ্রামে গিয়ে দিনের পর দিন অজস্র মিটিং করা অনেক

সময়েই দুঃসাধ্য হত ; দফাদারদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান ছিলেন।

শিবিরের মহিলাদের নিয়ে আশালতা তাঁদের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে গিয়ে দিনের পর দিন যখন এইভাবে শত শত লোকের ভিতর বক্তৃতা দিয়ে অগ্রসর হতেন, তখন তাঁরা শেষ রাত্রে একগ্রাম ছেড়ে রওনা হতেন। সন্ধ্যার পর যে গ্রামে পেঁছোতেন সেখানে সারাদিনের বিশ্রাম গ্রহণ করতেন ; মাঝখানে কেবল দুপুরে কোনো গ্রামে খেয়ে নিতেন। রাতের বিশ্রামের পর, পরদিন প্রত্যুষে আবার শুরু হত তাঁদের যাত্রা। দুপুরের খাওয়া এবং রাতের বিশ্রাম ছাড়া তাঁদের ছিল প্রায় অবিরাম যাত্রা। ১৯৩২ সালের ৬-ই জানুয়ারী থেকে আরম্ভ করে ৭-ই মার্চ, গ্রেপ্তার হবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঢাকা জেলার একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত প্রায় এক-ষট্টিটি গ্রাম ও শহরে ঝড়ের বেগে ঘুরে ঘুরে আন্দোলন পরিচালনা করে গিয়েছেন। এতো পরিশ্রমের মধ্যে কিন্তু কখনোও তাঁর ক্লান্তি বা অবসাদ আসেনি ; অফুরন্ত কর্মপ্রেরণা নিয়ে তিনি তাঁর কর্মধারা অব্যাহত রেখে গিয়েছেন।

ঢাকা জেলার যেসব সত্যাগ্রহী ১৯৩২ সালের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে কারাবরণ করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আশালতা সেনের প্রচেষ্টায় আন্দোলনে যোগদান করেন। 'সত্যাগ্রহী সেবিকা দলের' কর্মীরা ঢাকা জেলার পঁয়ত্রিশটি গ্রামে ঘুরে ঘুরে আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন। কারারুদ্ধ মহিলা ছাড়াও বহু সংখ্যক মহিলা আন্দোলনে যোগদান করবার ফলে পুলিসের হাতে লাঞ্ছনাও ভোগ করেন। পুলিস অনেক মহিলাকে গেপ্তার করে বহু দূরের গ্রামে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিত। অনেককে গেপ্তার না করে তাঁদের পেছনে এমনভাবে ধাওয়া করত যেন তাঁরা কোথাও আশ্রয় না পান। সুরবালা সেনের পরিচালনায় শোভা-যাত্রাকারী—এমনি একটি মহিলা দলকে পুলিস দুদিন দুরাত্রি ধরে সঙ্গে সঙ্গে থেকে অবিরাম মাটঘাটের ভিতর দিয়ে ঘোরাতে থাকে। অবশেষে তাঁদের একটা নৌকায় উঠিয়ে নিয়ে মাঘ মাসের শীতের মধ্যে রাত্রির গভীর অন্ধকারে এক নির্জন নদীর ধারে নামিয়ে রেখে পুলিস নৌকা নিয়ে চলে যায়। বিপন্ন মহিলারা তখন অনাহারে অনিদ্রায় প্রায় অর্ধ-মৃত ; এমতাবস্থায় বিপন্ন মহিলারা দুর্গন্ধ মাঠের পথ পার হয়ে একটা গ্রামে পেঁছে গ্রামবাসীদের সাহায্য পেয়ে কিছুটা সুস্থ হন।

সুরবালা সেন ও তাঁর সহকর্মীগণ এর পরেও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারাদন্ডে দণ্ডিত হন। এমনই গভীর ছিল তখন গান্ধীজীর ও

কংগ্রেসের প্রভাব ও স্বদেশ সেবার প্রেরণা। আন্দোলনের সময় এই সত্যাগ্রহী সেবিকা দলের মহিলাদের উপর প্রায়ই লাঠিচার্জ করা হত। ফলে সতেরজন মহিলা আহত হন। তার মধ্যে আঘাত গুরুতর ছিল কমলা দেবী, হেমনলিনী গাঙ্গুলী ও সুনীতি বসু প্রমুখ মহিলাদের। লাঠিচার্জ এবং পুলিসের জুলুম তাঁদের যতই নির্যাতন করেছে, আন্দোলনের ধারা ততই জোরদার হয়েছে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে তাঁরা সভা-সমিতি করেছেন, চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন করেছেন। এর ফল কিন্তু ভোগ করতে হত গ্রামবাসীদের। তাদের মালপত্র ক্রোক করা হত। মালপত্র ক্রোকের দ্বারা সাধারণ গৃহস্থদের বহু ক্ষতি হলেও তারা তাতে বিচলিত হত না। তাছাড়া ইউনিয়ন হেড অফিস ও ইউনিয়ন কোর্টে তাঁরা পিকেটিং করতেন ; মদ, গাঁজা ও বিলাতী দ্রব্যের দোকানে পিকেটিং করতেন এবং সাইক্লোস্টাইল করে, এগুলি যে বে-আইনী তা প্রচার পত্রের মাধ্যমে প্রচার করতেন।

আশালতা সেন ১৯৩২ সালের ৭-ই মার্চ গ্রেপ্তার হন। তাঁর বিরুদ্ধে দুটি মামলার শাস্তি চাপানো হয় ; শাস্তি ভোগের পর ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কারামুক্ত হন। মুক্তি লাভের পর তিনি নিজেকে বিভিন্ন গঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করেন। এই সময় থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত তিনি ঢাকা জেলার কংগ্রেসের সহ-সভানেত্রী ছিলেন। ১৯৩৯ সালে উত্তরবঙ্গের কংগ্রেস কর্মী ননীবালা দেবীর অনুরোধে তিনি তাঁর সহকর্মী হেমাঙ্গিনী দেবী এবং বরিশালের ইন্দুমতী গুহঠাকুরতাকে সঙ্গে নিয়ে দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, রংপুর, গাইবান্ধা প্রভৃতি জেলা পরিভ্রমণ করেন। এই জেলাগুলিতে 'কংগ্রেস মহিলা সংঘ' স্থাপনের কাজে তিনি মহিলা কর্মীদের প্রভূত সাহায্য করেন। উত্তরবঙ্গের 'কংগ্রেস মহিলা সংঘ' গঠনে স্থানীয় মহিলা কর্মীদেরও তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেন। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, হাওড়া, বাঁকুড়া, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, খুলনা প্রভৃতি জেলাতেও তিনি কংগ্রেসের কাজের জন্য—পরিভ্রমণ করেন।

১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনের জোয়ারে সমস্ত ভারতভূমি প্লাবিত ; ভারতের আকাশে-বাতাসে তখন ধ্বনিত হচ্ছে স্বাধীনতার ধ্বনি। এ আন্দোলনে যে সব সংগ্রামী বীর এগিয়ে এসেছিলেন জনতাকে পথ চলবার কাজে সাহায্য করতে, আশালতা সেন ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। ঢাকার তালতলা অঞ্চলে পুলিশের গুলিতে নিহত তরুণ যুবকের জন্য

আহুত এক শোকসভায় সশস্ত্র সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত হয়ে তিনি অন্যান্য কংগ্রেস কর্মীসহ গ্রেপ্তার হলেন; আট মাস কারাদণ্ডের পর ১৯৪৩ সালে ঢাকা জেল থেকে মুক্তি পান। কারামুক্তির পরেই তিনি এসে পড়লেন দুর্ভিক্ষ কবলিত দেশের মধ্যে; ঢাকা শহর ও পাশের গ্রামগুলির মধ্যে দুর্গত মানুষের সেবাকর্মে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন; এই বছরেই নভেম্বর মাসে নোয়াখালির দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করতে থাকেন। সেখানে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে তিনি ঢাকা জেলার অবস্থা জ্ঞাপন করেন। ঢাকার অবস্থাও তখন শোচনীয়; তাই সেখান থেকে ফিরে এসে বিক্রমপুর অঞ্চলে গিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হলেন।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকে তিনি পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে সেখানকার বিভিন্ন গঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। তাঁর দীর্ঘকালের সহকর্মী ছিলেন হেমাঙ্গিনী দেবী। নেত্রী-স্থানীয় নিরলস কর্মী আশালতা সেন আপন অন্তরে দেশসেবার অনির্বাণ প্রেরণা জ্বালিয়ে নিয়ে বাংলার, বিশেষ করে পূর্ববাংলার পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে দেশপ্রেমের একটা প্রবল উন্মাদনা জাগিয়েছিলেন, ঘরের মেয়েদের সেদিন তিনি নিজের সঙ্গে কর্মস্রোতে প্রবাহিত করে নিয়ে চলেছিলেন বিপুল আকর্ষণে। পরে তিনি এ বাংলায় চলে আসেন। ইচ্ছে থাকলেও শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি নিজেকে সমস্ত কাজ থেকে মুক্ত করে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন জীবনের শেষের দিকে। ১৯৮৬ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তাঁর জীবনাবসান হয়। আজ আমরা স্বাধীন ভারতবাসী নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর জীবনের বাণী স্মরণ করব এবং তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করব।

ইন্দুমতি সিংহ

(১৮৯৯—১৯৬৭)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জোয়ার যখন বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে দুই বাংলার প্রতিটি জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন আন্দোলনের নেতৃত্বরা তাঁদের জনবলের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র ও অর্থবল জোরদার করবার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এপার ও ওপার বাংলার, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম ও আর কিছু জেলায় যুবকের রক্ত ফুটছে টগ্‌বগ্‌ করে, স্বাধীনতা তাদের চাই-ই। এদের নেতৃত্বরাও তাই সেদিন নিজেদের সংগঠিত শক্তিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন। আর সেই কারণেই চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই কার্যকরী রূপ নিয়েছিল। এর ফলে নতুন করে যে দায়িত্ব এসে পড়ল তা হোলো, একাজ করতে গিয়ে যে সমস্ত বিপ্লবীরা ধরা পড়েছেন তাঁদেরকে মুক্ত করবার দায়িত্ব। তবে সেদিন ভারতের অগণিত মানুষ স্বাধীনতা লাভের কাজে যে কোনো গুরু দায়িত্বকে মাথা পেতে নিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হননি। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এগিয়ে এসেছিলেন একাজে।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ধৃতবিপ্লবীদের মামলা পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন একজন মহিয়সী নারী,—ইন্দুমতী সিংহ। ইনি ছিলেন বিপ্লবী নেতা অনন্ত সিংহের

বড় ভগ্নী। ১৮৯৯ সালের ১২ই জুলাই, চট্টগ্রামের এক রাজপুত পরিবারে ইন্দুমতী সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গোলাব সিংহ, মাতার নাম রাজকুমারী দেবী। চট্টগ্রামের বিশেষ করে ত্রিশের দশকের বিখ্যাত বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে নন্দলাল সিংহ এবং অনন্ত সিংহের নাম করা যেতে পারে।

ইন্দুমতী দেবী কলা বিষয়ে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেন এবং পরে হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন। বন্দুক এবং রিভলবার চালনার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি একজন ভাল জিমন্যাসিয়ানও ছিলেন। এছাড়া গাড়ী চালানোর ক্ষেত্রেও তাঁর দক্ষতা ছিল। ভাইয়ের সংস্পর্শ তাঁকে স্বদেশী কাজে আকর্ষণ করেছিল এবং এই স্বদেশী চেতনা তাঁকে আদর্শবতী করেছিল। ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে তিনি বিদেশী বস্ত্র পরিত্যাগ করে স্বদেশী খদ্দর পরিধান করতে থাকেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি খাদিবস্ত্র পরিধান করেন। মাষ্টারদা অর্থাৎ সূর্যসেনের বিপ্লবীদলে ডাক পেয়েও তিনি গেলেন না। কারণ এদলে তখন মহিলাদের সামনের সারির সৈনিক হতে দেওয়া হোতো না অর্থাৎ মাষ্টারদা সরাসরি মহিলাদের মিলিটারী গুলির সামনে দাঁড়াতে দিতে চাইতেন না। এই কারণে তিনি চট্টগ্রাম সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৮৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল তিনি চট্টগ্রাম সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিলেন।

এখানে শিক্ষাগ্রহণ করবার উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনে সক্রিয় অংশ-গ্রহণের প্রস্তুতি নেওয়া। যদিও তিনি মাষ্টারদার দলে যোগ দিতে পারেননি এবং এর জন্য তাঁর অশ্রুজল পড়েছিল, কিন্তু মাষ্টারদা তাঁকে চিঠি দিয়ে তাঁর প্রতি প্রশংসা এবং উৎসাহ প্রকাশ করতেন। তিনি ছিলেন সমস্ত বিপ্লবী দলের দিদি। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ধৃত বিপ্লবীদের মামলা পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁকে প্রত্যেক মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়েছে।

তিনি ইংরেজী জানতেন না, কোথাও হিন্দিতে, কোথাও ভাঙা বাংলাতে কথা বলে তিনি মানুষদের বুঝিয়েছেন, প্রেরণা এনেছেন দাতার হৃদয়ে। কোথাও আবার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা নিয়ে শূন্য হাতে ফিরে এসেছেন। কিন্তু দমবার পাত্রী ইন্দুমতী সিংহ ছিলেন না, ভারতের নানা স্থান ঘুরে বেড়িয়েছেন অর্থ সংগ্রহের আশায়। তিনি যখন এলাহাবাদে যান, তখন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু পাঁচশত একটাকা

তাঁর অর্থ তহবিলে দান করেন। চট্টগ্রাম জেলের মধ্যে বন্দীদের বাইরে বের করে আনবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোলো। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইন্দুমতী তাঁদের বাইরে আনবার জন্য ডিনামাইটের তিনটি লাঠি সংগ্রহ করে জেলের ভিতরে পাঠিয়ে দিলেন, সিদ্ধান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়ায় এর কার্যকরী রূপ গ্রহণ করা সম্ভব হোলো না। কিন্তু তিনি পুলিসের কড়া নজরে পড়ে গেলেন। তাঁকে খুঁজে বার করবার জন্য পুলিস নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু কোনো কাজই হোলো না।

অনেক চেষ্টার পর ১৯৩১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হোলো। ডিসেম্বর মাসে তিনি যখন অর্থ সংগ্রহের জন্য কুমিল্লায় যান, সেই সময় পুলিস তাঁর সন্ধান পায় এবং গ্রেপ্তার করে। তাঁর গ্রেপ্তার হবার আগের দিনই শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে ঐ কুমিল্লা শহরে গুলি করে নিহত করেন। ইন্দুমতী সিংহকে রাজবন্দীরূপে হিজলী জেলে রাখা হয়। প্রায় ছয় বছর বন্দীজীবনের পর ১৯৩৭ সালে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। জেলের বন্দীজীবনেও দেশের কথা, বিপ্লবীদের কথা চিন্তা করে ছট্ফট্ করতেন রাত-দিন। মামলার অর্থ সংগ্রহের কঠিন দায়িত্ব কে নেবে এই ছিল তাঁর রাত-দিনের চিন্তা। এই চিন্তা থেকে কিছুটা অন্যমনা থাকবার জন্য তিনি নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দেবার জন্য জেলের মধ্যে লীলা নাগের কাছে পড়শুনা করতেন।

বন্দী দশাতেই তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। বন্দী দশা থেকে মুক্ত হবার পর তিনি জীবনবীমা কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। পাশাপাশি চলল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের পাশে থেকে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য সাধনা। ১৯৪১ সালে নেতাজী যখন অন্তর্ধান হলেন তখন তাঁর উপর চলল পুলিসের জেরা এবং নিষ্ঠুর অত্যাচার—উদ্দেশ্য সুভাষের খবর চাই। সেদিন কিন্তু এই নারীর মুখ থেকে একটি সংবাদও পুলিস আদায় করতে পারেনি, তিনি সব অত্যাচার সহ্য করেছিলেন দৃঢ় চিত্তে।

এই মহীয়সী স্বাধীনতালাভের জন্য তাঁর সাহসিকতা, আদর্শ এবং মর্যাদা রক্ষার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতা এলো এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, স্বাধীনতালাভের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে যে দুঃখের গ্লানি বহন করে নিতে হয়েছে তা হোলো দেশ বিভাগের। ইন্দুমতী সিংহকেও এ-দুঃখ আহত করেছিল, তিনি অবশ্য এ-বাংলাতেই বাকী জীবন কাটান। ১৯৬৭ সালের ৪ঠা মে কলকাতায়

এই তেজস্বিনী মহিয়সীর দেহাবসান হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন যে সমস্ত মহীয়সীরা ভারত তাদের জন্য গৌরবান্বিত।

উর্মিলা দেবী

(১৮৮৩—১৯৫৬)

স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার যখন ভারতের মাটি প্লাবিত করেছিল দেশজুড়ে, সে সময়টি ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত এবং বিংশশতাব্দীর দ্বারে সদ্য প্রবেশের শুভ মুহূর্তে। দেশজুড়ে আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল একটি ধ্বনি—'স্বাধীনতা'। বাংলার মাটিতে যাঁরা এসেছিলেন, আন্দোলনের সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই শুধু বাংলায় নয় সমগ্র ভারতের আন্দোলনে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের কার্যকরীরূপ দিতে অন্যান্য প্রদেশের পাশাপাশি বাংলার বহু নেতৃত্ব এগিয়ে এসেছিলেন, সংগঠিত করেছিলেন ভারতের প্রাণ শক্তিকে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, যিনি শুধু বাংলার নয়, ছিলেন সমগ্র ভারতের বন্ধু অর্থাৎ 'দেশবন্ধু'। বাংলার এই পুরুষ নেতৃত্বকে অনুসরণ করে বাংলার ঘরের পর্দানসীন মা-বোনেরাও সেদিনের সেই সংগ্রামের মঞ্চে এসে জড়ো হয়েছিলেন। তাঁরা নেতৃত্বও দিয়েছেন সংগ্রাম আন্দোলনের। দেশবন্ধুর ভগিনী ঊর্মিলা দেবীও সেদিন ভ্রাতার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলেন দেশের কাজে।

১৮৮৩ সালের ৩-রা ফেব্রুয়ারী ঢাকার টোলিরবাগ নামক স্থানে ঊর্মিলা দেবী জন্ম গ্রহণ করেন, উচ্চ মধ্যবিত্ত হিন্দু বৈদ্য পরিবারে। তাঁর পিতা ভুবন মোহন দাস ছিলেম একজন প্রসিদ্ধ আইনজীবী ও আইনজ্ঞ। জন্ম সূত্রে রূপোর চামচ মুখে নিয়ে অর্থাৎ পারিবারিক আর্থিক স্বচ্ছলতা নিয়েই পৃথিবীতে আসবার ফলে তাঁর ছেলেবেলার শিক্ষা হয় কলকাতার

লরেটো স্কুলে। কিশোর বয়সেই তাঁর অনন্ত নারায়ণ সেনের সঙ্গে বিবাহ হয়। বিবাহের পর তাঁকে সাংসারিক দায়িত্বের ভার গ্রহণ করতে হয়; কিন্তু এর মধ্যেই তিনি নিজের জন্য সময় করে নিয়ে, গৃহশিক্ষা গ্রহণের কাজ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হন। তিনি ভাল বাংলা বলা এবং লিখবার দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের দিন থেকেই বাংলার রাজনৈতিক দৃশ্যের দ্রুত পরিবর্তন খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে আগ্রহ নিয়ে অনুসরণ করেছিলেন ঊর্মিলা। কলকাতায় ভ্রাতা চিত্তরঞ্জন দাসের বাড়ীতে তিনি সব সময়ই আসতেন। এখানে তিনি নানান মতের ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করবার, ঘনিষ্ঠ হবার, আলোচনা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এর ফলে তিনি নিজেকে শিক্ষিতও করতে পেরেছিলেন। যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দরা দেশবন্ধুর বাড়ীতে আসতেন, তাঁদের মধ্যে ঊর্মিলা দেবী শান্তভাষী মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রভাব-দ্বারা ঊর্মিলাকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯২০ সালে গান্ধীজী অহিংস এবং অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। এই বছরেই ঊর্মিলার স্বামী মারা যান; শোকে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে খুব একটা মানসিক অবসাদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন ঊর্মিলা দেবী; কিছু একটা করতে চাইছিলেনও মনের ভারকে কিছুটা লাঘব করবার জন্য। একটা উপায়ও এসে গেল তাঁর সামনে, তিনি অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী হাতে পেয়ে গেলেন। ১৯২১ সালে তিনি এ আন্দোলনে যোগ দিলেন। সর্বদাই তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে ছিলেন; ১৯৩৩ সালে গান্ধীজী যখন দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণে যান তখনও ঊর্মিলা দেবী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। গান্ধীজীর এই সময় দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ ভারতের অস্পৃশ্যতার ব্যাধিকে সমূলে উৎপাটন করা।

ঊর্মিলা ছিলেন বাংলার নারীদলের মধ্যে প্রথম দলভুক্ত যিনি অসহযোগ আন্দোলনের সময় খাদি বস্ত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী অমান্য করেন। এবং এইজন্য তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। ১৯২১ সালের ২৮-শে ডিসেম্বর প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্স্ যখন ভারতে আসেন, তখন হরতালের ডাক দেওয়া হোলো কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তিনি গ্রেপ্তার হন। কারামুক্ত হবার পর তিনি অসহযোগ আন্দেলন এবং অন্যান্য জাতীয় কর্মসূচী পালনে নারীদের অংশগ্রহণের প্রসার ঘটাবার জন্য শুধুমাত্র মহিলাদের জন্যই 'নারী কর্ম মন্দির' সংগঠন

তৈরী করেন। কিন্তু সংগঠনটি চালু হবার কিছুদিনের মধ্যেই অবৈধ কারণ দেখিয়ে সরকার পক্ষ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হোলো।

১৯২৬ সালে ঊর্মিলা দেবী কংগ্রেস সভানেত্রী সরোজিনী-নাইডুর সঙ্গে সমস্ত ভারত পরিভ্রমণ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি বিদেশীবস্ত্র বিক্রয়ের দোকান গুলির সামনে পিকেটিং করবার জন্য নারী-সত্যাগ্রহ সমিতি গঠন করেন, সমিতির উদ্দেশ্য ছিল বিদেশীবস্ত্র বিক্রয়ে বাধাদান করা। দেশবন্ধুর জন্মদিনে এই সমিতির পরিচালনায় যখন সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শোভা যাত্রা বের করা হয়, তখন আইন-পূর্বক সমিতিকে বন্ধ করে দেওয়া হোলো। ঊর্মিলা দেবী গ্রেপ্তার হলেন, তাঁকে ছয় মাসের জন্য কারাবরণ করতে হোলো। ১৯৩১ সালে কারামুক্ত হবার পর আবার তাঁকে গ্রেপ্তার হতে হয়; এই সময় তিনি হিজলী জেলে বন্দীদের উপর তীব্র অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়ে তদন্ত কমিশন গঠনের দাবীতে হাওড়া জেলায় সভা করেন এবং উত্তেজনাপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তাঁর এই উত্তেজনাপূর্ণ বক্তব্য প্রদানের ফলে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলে তাঁকে গ্রেপ্তার হোতে হয়। পরবর্তী সময়ে পরপর দু'বার তাঁকে বিভিন্ন কারণে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯৩৩ সালে তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে দক্ষিণ ভারত যান, গান্ধীজী সেখানে হরিজন মিশন এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য মালাবার মন্দির উদ্বোধন করেন। ১৯৪৬ সালে শারীরিক দিক দিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে নোয়াখালিতে তাঁর 'শান্তি মিশনে' যান এবং সেখানে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ান। ১৯৫৬ সালে ১০-ই মে, তিনি তাঁর ৩৫ বছরের দীর্ঘ কর্মজীবনের অবসান ঘটিয়ে চিরতরে বিশ্রাম নিলেন চিরনিদ্রার কোলে। শেষ হোলো এই নারীর সংগ্রামী জীবনের। একথা বলা যেতে পারে যে, ঊর্মিলা দেবী তাঁর ভ্রাতা চিত্তরঞ্জন দাসের পাশে দাঁড়াবার জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন; দুই ভাই-বোন নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন দেশ মাতৃকার কাজে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের পাতায় তিনি নারীদের মধ্যে একজন হয়ে থাকবেন, যিনি ভারত মাতার শৃংখলমুক্তির জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

উন্নাভা লক্ষ্মীবায়াম্মা

(১৮৮২-১৯৫৬)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সমস্ত ব্যক্তিত্বরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বিপ্লবী বাঘাযতীন, মাষ্টারদা, বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখের নাম করা যেতে পারে ; এঁরা সকলেই আমাদের ভারতবাসীর, বিশেষত বাংলার মানুষ-জনের কাছে অতি পরিচিত। এছাড়া আছেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। এঁদের সকলের সংঘবদ্ধ নেতৃত্বে ভারতবাসী সেদিন সব চিন্তা ভুলে গিয়ে একটিমাত্র উদ্দেশ্যে একটিই মঞ্চে জড়ো হয়েছিলেন, আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। পুরুষ নেতৃত্বের পাশাপাশি মহিলা নেতারাও কাজ করেছেন, একই সঙ্গে পুরুষদের পাশে থেকে ; সংখ্যায় পুরুষের তুলনায় কম হলেও কিন্তু সেদিনকার সামাজিক নানাবিধ কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে তাঁরা নিজেদেরকে মুক্ত করে এগিয়ে এসেছেন। উন্নাভা লক্ষ্মীবায়াম্মা অন্ধ্রপ্রদেশের একটি নাম যা স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৮৮২ সালে গুনটুর জেলার (বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশের) সত্তেনাপল্লী তালুকের একটি গ্রাম আমীনাবাদে উন্নাভা লক্ষ্মীবায়াম্মা জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যবিত্ত নিয়োগী ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত নাদিমপল্লী সীতাবামাম্মা ছিলেন তাঁর পিতা এবং লক্ষ্মীমাম্মা ছিলেন তাঁর মাতা। পিতা-মাতার তিনি ছিলেন চতুর্থ এবং শেষ সন্তান, অন্যান্য তিন সন্তানের মধ্যে দু'জন

পুত্র এবং একজন কন্যা অর্থাৎ উন্নাভারা দুই ভাই এবং দুই বোন ছিলেন, পিতা সীতা রামাম্মা ছিলেন একজন করনাম অর্থাৎ রেভেনিউ অফিসার, চাকরী সূত্রে গ্রামে তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। পিতার সর্বশেষ সন্তান হিসাবে লক্ষ্মীবায়াম্মা প্রভূত স্নেহ ও স্বাধীনতাভোগের অধিকারী হন; সেইকারণে তদানীন্তন সামাজিক সংস্কার থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রাইমারী শিক্ষালাভের জন্য গ্রামের স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ পেয়েছিলেন, এখানেই প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাচীন কিছু পুস্তক সম্বন্ধে তাঁর বিদ্যালাভের সুযোগ ঘটে।

দশবছর বয়সে নিজের পছন্দ অনুসারে উন্নাভা লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়; এই বিবাহ ছিল সত্যিকারের আদর্শ বিবাহ। তিনি শুধুমাত্র একজন মানুষকে বিবাহ করেন নি, তাঁর সামাজিক এবং রাজনৈতিক আদর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। বিবাহের দিন থেকেই স্বামী যা বলতেন এবং যা করতেন তাই তিনি সানন্দে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, তিনি তাঁর স্বামীর মুখপাত্র হিসাবে কাজ করতেন। উন্নাভা লক্ষ্মীবায়াম্মার সহযোগিতার জন্যই লক্ষ্মী নারায়ণের পক্ষে একজন সাহিত্যিক, লেখক এবং দার্শনিক হিসাবে সমাজের মানুষের কাছে পরিচিতি অর্জন সম্ভব হয়েছে; স্বামীর সমস্ত পরিকল্পনাই তাঁর মাধ্যমে জনগণের মাঝে পেঁছাতো।

পরবর্তী জীবনে তাঁর স্বামীর মাধ্যমে তিনি মহাত্মাগান্ধীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং বিপ্লবী কাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। এছাড়া যে সমস্ত নেতৃত্ব তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন তাঁরা হলেন, ডুভুরী সুব্বায়াম্মা, পেনেকা কনাকাম্মা, যামিনীপূর্ণ তিলকম্ প্রমুখ। অসহযোগ, লবণ সত্যাগ্রহ, ভারত ছাড়ো প্রভৃতি আন্দোলনের সময় এঁদের সঙ্গে তিনি ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন একজন দক্ষিণাভি মহিলা অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণের (এটা অন্ধ্রের একটা প্রচলিত কথা, গুণটুর জেলার কৃষ্ণবর্ণকে দক্ষিণাভি বলা হতো); তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়, কৃষ্ণবর্ণের এবং দৃঢ়তাপূর্ণ গড়নের মহিলা। তিনি খুব পরিশ্রমী ছিলেন। প্রচণ্ড দায়িত্বভারের চাপ, জীবনের তীক্ষ্ম অভিজ্ঞতা, নানান ঝুঁকি ও বিপদের সম্মুখীন হবার এবং নিদারুণ কষ্ট সহ্য করবার ফলে শারীরিক সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অসুন্দর এবং অনলংকৃত। কিন্তু ব্যক্তিগত চরিত্রের-দিক দিয়ে তিনি ছিলেন প্রচণ্ড ধীশক্তিসম্পন্ন এবং দয়ালুস্বভাবের। তবে জীবনের শেষ দিকে

'সারদা নিকেতন' যখন প্রচণ্ড আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়ে তখন তিনি খুব কঠোর, একগুঁয়ে স্বেচ্ছাচারী, এমন কি উম্মাদ পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

জীবনে ব্যর্থতা কাকে বলে তিনি জানতেন না ; এমন একটা সময় তাঁর জীবনে এসেছিল যখন তাঁকে এবং তাঁর স্বামীকে সমাজ এবং ধর্মীয় বিভিন্ন কার্যাবলীর অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়, তখনও তাঁকে দেখা গিয়েছে তাঁর স্বভাবজনিত সাহস নিয়ে এই প্রচণ্ড প্রতিকূল অবস্থার প্রতিরোধ করতে, ভগবানে বিশ্বাসী হলেও তিনি গোঁড়ামীকে প্রশ্রয় দিতেন না, হিন্দুধর্ম এবং সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে কাজ করে গিয়েছেন। কিন্তু অন্য ধর্মেরও তিনি কখনো বিরোধিতা করেননি। তাঁর কাজের প্রধান ক্ষেত্রগুলি ছিল সমাজপুনর্গঠন যথা বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, খাদি, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, হরিজনদের উন্নতিসাধন প্রভৃতি এসমস্ত কাজের প্রতি ছিলেন আগ্রহশীল, এবং এগুলি তিনি অন্যান্য কাজের সঙ্গেই করতেন।

তাঁর জীবনে ১৯১০ সাল, ১৯১৩ সাল এবং ১৯২১ সাল—এই তিনটি বিশেষ সময় ছিল খুবই উল্লেখ্য ; এইসময় তিনি তাঁর জীবনের অমূল্য সময়কে উৎসর্গ করেছিলেন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে। প্রথমটিতে বিধবা বিবাহের মতো সমাজ সংস্কারমূলক কাজে, দ্বিতীয়টিতে রাজনৈতিক আন্দোলনগুলিতে বিশেষ করে প্রাদেশিক অর্থাৎ অন্ধ্রপ্রদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির মূল দায়িত্বে ছিলেন ; তৃতীয় সময়টিতে তিনি জাতীয় রাজনৈতিক স্তরের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং একাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। রাজনৈতিক আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে ১৯১১ সাল থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে অন্ততঃ ছয়বার তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে, ১৯30 সালে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে এবং ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে সক্রিয় যোগদানের জন্য তাঁকে দীর্ঘ কয়েক বছরের জন্য কারাবরণ করতে হয়। অরুণ ডালপেটের বাসিন্দা বেনডামুণ্ডী হনুমায়াম্মার বিবাহ দিয়েই তিনি বিধবা বিবাহের কাজ শুরু করেন এবং জনজীবনে প্রচারের কাজে নেমে পড়েন। বেনডামুণ্ডী গুনটুর জেলার অরুণডালপেটের বাসিন্দা। এই কাজটি তিনি তাঁর স্বামীর সাহায্য নিয়ে করেন। সেই দিন থেকে প্রায় একদশক কাল অর্থাৎ বছর দশেক তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে সংস্কারমূলক কাজ করে যান। বহু বিধবা বিবাহ

কার্য তাঁদের দ্বারা সম্পন্ন হয়।

১৯২২ সালে তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের অসহযোগ এবং লবণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। গান্ধীজী তাঁর মনে গভীর বিশ্বাস উৎপন্ন করতে সক্ষম হন ; তিনিও কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত নতুন কর্মসূচীতে যথাসম্ভব শীঘ্রই সাড়া দিলেন। একজন সমাজ-সংস্কারক হিসাবে তিনি অনাথা মহিলাদের জন্য একটি মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবার চিন্তা ভাবনা করে তাকে কার্যকরী রূপ দেবার জন্য এগিয়ে যান, বিধবা এবং অনাথাদের সমাজে নিজের জায়গা করে নেবার জন্যই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ। ১৯২৩ সালে কারামুক্ত হবার পরই তিনি গুনটুর জেলায় বাসস্থান সমেত মেয়েদের বিদ্যালয় 'সারদা নিকেতন' স্থাপন করলেন। কাকনি পুরুষোত্তমের বাড়ীতে মাত্র দশজন ছাত্রী নিয়ে এই বিদ্যালয় শুরু হয় ; ধীরে ধীরে ছাত্রী সংখ্যা বাড়তে লাগল। গ্রামের পর গ্রাম চলে যেতেন চাঁদা সংগ্রহের কাজে, গ্রামবাসীর কাছ থেকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদা সংগ্রহ করতেন। কিছুদিনের মধ্যে এই 'সারদা নিকেতন' গুণ্টুর জেলার ব্রডিপেটে স্থানান্তরিত করা হোলো ; স্থায়ীভাবেই এইখানে নিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ের জমিটি দান করেন মুথয়ালার রাজা ; বাড়ী তৈরী করে দেন কাশিনাথুনি নাগেশ্বররাও পন-টুলু। তিন থেকে চার একর জমির উপর এই বাড়ীটি। এখানে সবার প্রবেশাধিকার আছে, কোনো ধর্ম, জাতি অথবা সম্প্রদায়ের বিধিনিষেধ সেখানে নেই। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় উন্নতি এবং বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রদান। সংস্কৃত, হিন্দি, তেলেগু প্রভৃতি ভাষা শিক্ষাদান করা ; হাতের কাজের মধ্যে বোনা, চরকায় সুতো কাটা, আঁকা, গানকরা প্রভৃতি বিষয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। এ সব বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃক ডিগ্রী প্রদানেরও ব্যবস্থা ছিল ; যেমন—সাহিটি (Sahiti), বিদুষী (Vidushi) প্রভৃতি নামের ডিগ্রী প্রদান করা।

যদিও প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের সময় ইংরেজী শেখানো হোতো না, তবে পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনে অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষালাভে দক্ষতা প্রকাশ পেলে সেই সব ছাত্রীদের ইংরেজী শেখানো হোতো। ত্রিশের দশকের থেকে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিদ্বান ওরিয়েণ্ট্যাল ডিগ্রী লাভের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে পাঠানো হতে থাকে। ১৯৪৪ সালে এই প্রতিষ্ঠান ওয়ালটেয়ারের অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বীকৃতি লাভ করে।

মূলভবনের বাইরে আছে প্রাথমিক স্কুল, উচ্চবিদ্যালয়, শিল্প সংস্থা এবং দেশীয় বিদ্যালয়। প্রকাশমের মন্ত্রীসভার সময় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত রিপাল্লীতে পঁচিশ একর জলাজমি এবং নিরানব্বই একর শুকনো জমির হিসেব পাওয়া যায়। বিদ্যালয় বহু অনাথা শিশুকে আশ্রয় দিয়েছে, বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে গঠনমূলক কর্মসূচী সম্প্রদান করবার জন্য একটি সেবাদল গঠন করা হয়, বিদ্যালয়ের কর্মসূচী ছাড়াও এই দল তদানীন্তন সময়ে কংগ্রেসকে সাহায্য করবার কাজ করত। ১৯৪৮ সালে বিদ্যালয়ের পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসব পালিত হয় এবং প্রাক্তন ছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকে লক্ষ্মী-বায়াম্মাকে 'আম্মা' অর্থাৎ মা বলে ডাকত।

সমাজ-সংস্কার, সমাজ সেবামূলক কাজের বাইরেও আর যে একটি সংগ্রামী মূর্তিময়ীরূপে লক্ষ্মীবায়াম্মাকে দেখতে পাওয়া যায়, তা হোলো, তাঁর রাজনৈতিক জীবন। ১৯১১ সালে তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। এই সময় তিনি প্রথম অন্ধ্র রাজ্য কংগ্রেসের সভায় যোগ দেন। ১৯২১ সালে পালনাড অঞ্চলে যে বন-আন্দোলন শুরু হয় সেখানে তাঁর ভূমিকা ছিল সক্রিয়; এই কর্মসূচীটি তিনি তাঁর স্বামীর অনুপস্থিতিতেই পালন করেছিলেন। ১৯২২ সাল, ১৯৩০ সাল এবং ১৯৪২ সালে তিনি সমস্ত অন্ধ্রঅঞ্চল পরিক্রমা করেন এবং শত শত জনসমক্ষে বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর উদ্দিপনাপূর্ণ বক্তৃতার মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনে জনগণকে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানান; তাঁর বক্তৃতায় জনগণ উদ্দীপিত হয় এবং তাঁর আহ্বানেও তারা সাড়া দিয়েছিল।

ভারত-ছাড় আন্দোলনের সময় তিনি নেলোর টাউনহলে এক উদ্দীপনা-পূর্ণ স্মরণীয় বক্তব্য রাখেন। স্বাধীনতার পর, কিন্তু আমরা তাঁকে আর সক্রিয় ভূমিকায় দেখতে পাই না। এই সময় তিনি রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ অবসর নিয়ে, শুধুমাত্র সারদা নিকেতনের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব-গ্রহণ করেন সম্পূর্ণভাবে। এর কারণ ছিল তাঁর বার্ধক্য আগমনের সূচনা; বার্ধক্য তাঁকে পূর্বের মতো কঠিন পরিশ্রম করবার ক্ষেত্রে অক্ষম করে। তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। সারদা নিকেতনের দায়িত্ব পুরোপুরি গ্রহণ করবার পরও তিনি এ প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণরূপে সুষ্ঠভাবে পরি-চালনা করবার কাজে দক্ষতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়ে পড়েন। বিভিন্ন কারণে; যথা প্রশাসনিক দক্ষতার অভাব, হিসাব রক্ষণের গাফিলতি, বেশী মাত্রায় আত্মপরিচয় প্রকাশ করবার প্রবণতা প্রতিষ্ঠানের সুনামে কালিলেপনে

সাহায্য করে এবং এইসব প্রচণ্ড সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ; এর ফলে, লক্ষ্মীবায়াম্মাকে প্রচুর নিন্দা এবং সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। বেশ কিছুকাল ধরে দীর্ঘ বাকবিতণ্ডার পর সরকার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

যে মহিয়সী নারী তাঁর জীবনকে শুরু করেছিলেন সমাজ সংস্কার, সমাজ সেবা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম আন্দোলন প্রভৃতি পবিত্র কার্যগুলিকে নিয়ে এবং এইসব কর্মসূচীগুলিকে জীবনের পাথেয় করে এগিয়ে চলেছিলেন, সেই মহিয়সীকেও জীবনের শেষ দিনগুলিতে নিন্দা এবং সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু অন্ধ্রের মহিলা নেতৃত্ব হিসাবে নিজের গুরুত্বপূর্ণ স্থানটিকে প্রতিষ্ঠা করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সারদা নিকেতনের দায়িত্বভার তাঁর হাত থেকে হস্তান্তরিত হলেও সারদা নিকেতনের—প্রতিটি ছাত্রীর এবং কর্মীর কাছে তিনি 'আম্মা' নামে পরিচিত হয়ে আছেন চিরকালের জন্য। তিনি ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক ; তিনি সর্বদা খাদি বস্ত্র পরিধান করতেন ; গান্ধীজীর আদর্শেই তিনি ছিলেন আদর্শায়িত। ১৯৫৬ সালে দীর্ঘ রোগ ভোগের পর এই মহিয়সী ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে চিরদিনের মতো চলে গেলেন পরলোকে, রেখে গেলেন স্বাধীন দেশের মানুষের জন্য তাঁর কর্মমুখর জীবনের কিছু উজ্জ্বল স্মৃতি।

এন. লক্ষ্মী মেনন

(১৮৯৯—   )

এন. লক্ষ্মী মেনন ১৮৯৯ সালে ত্রিভান্দ্রমে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রামভার্মা থম্পন। তাঁর মাতা মাধুরী কুট্টী আম্মা ছিলেন ত্রিভাঙ্কুরের সম্ভ্রান্ত নায়ার পরিবারের সন্তান। লক্ষ্মী মেনন তাঁর শৈশব ও কৈশোরে ভারতের এবং বহির্ভারতের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা গ্রহণ করেন ; এইসব স্থানগুলি হোলো যথাক্রমে ত্রিভান্দ্রম, মাদ্রাজ, লক্ষ্মৌ এবং লণ্ডন। এইসব স্থান থেকে তিনি যথাক্রমে এম. এ., এল. টি., এল. এল. বি. এবং টিচার্স্ ডিপ্লোমা নেন। গৃহজীবনের কর্মধারা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ তাঁর প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করে ; এছাড়া শিক্ষাগ্রহণকালে এবং কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে এসেছেন যাঁরা তাঁর প্রতিভা বিকাশে এবং পাশাপাশি তাঁর কর্মধারা সঠিক পথে সঠিক গতি বজায় রাখবার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। এঁদের মধ্যে জওহরলাল নেহেরু, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ নেতৃদ্বয়ের নাম করা যেতে পারে যাঁরা কর্মজীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করবার ফলে তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে।

১৯২২ সালে লক্ষ্মীমেনন কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ১৯২২ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত তিনি মাদ্রাজের কুইন মেরি কলেজে শিক্ষকতা করেন। এবছর কিছুকালের জন্য তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং এখানকার গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯৩০ সালে কোচিনের

কারর‍ুপথ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বিশিষ্ট অধ্যাপক ভি. কে: নন্দন মেননের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। নন্দন মেনন বিদ্বান এবং সুপণ্ডিত ; তিনি তাঁর কর্মজীবনে যথেষ্ট পারদর্শিতার সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি কিছুকাল ত্রিভাংকুর এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদে আসীন থাকেন ; এরপর নতুন দিল্লীর 'ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ্‌ পাব্‌লিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে'র ডাইরেক্টর পদে কাজ করেন।

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত লক্ষ্মী মেনন লক্ষ্ণৌ ইসাবেলা থোবার্ন কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত, তিনি শিক্ষকতার কাজে ইস্তফা দিয়ে এ্যাড্‌ভোকেট হিসাবে প্রাক্‌টিস্‌ করেন। কর্মজীবনের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী আরও কিছু কাজ করতে থাকেন, স্বদেশের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করতে থাকেন। এর ফলে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন সক্রিয়ভাবে এবং নেতৃত্বের আসনে উপবিষ্ট হন। সারা ভারত মহিলা সম্মেলনের তিনি ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা। কিছুকালের জন্য তিনি এই সংস্থার সেক্রেটারী এবং সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি 'রোশনাই' নামে একটি কাগজের সম্পাদনার কাজও করেছিলেন কয়েক বছরের জন্য।

১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি পাটনা টিচার ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী এবং উদ্যোগী জাতীয়তাবাদী। ১৯৫২ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী তালিকায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহের‍ুর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এই নির্বাচনে তিনি কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হন। রাজ্য সভায় তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় সদস্যা। দেশের প্রতি তাঁর সেবা ছিল অপরিসীম। বিধান সভার সদস্যা থাকাকালীন তিনি ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত, এই সময়ের জন্য সারা ভারত মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারী নির্বাচিত ছিলেন। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিনি বিধান সভার আইনমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রমন্ত্রী (বহির্বিভাগীয়) ছিলেন।

ইউ. এন. ও: (U. N. O.) সাধারণ এ্যাসেমব্লীতে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৪৯-৫০ সালের জন্য তিনি মহিলা এবং শিশুদের ইউ. এন. সেকসনের চীফ্‌ ছিলেন। এ সমস্ত

দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে লক্ষ্মী মেনন দক্ষতার সঙ্গে তাঁর করণীয় কার্য সমাধান করেছেন এবং যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। দেশের জন্য এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি সব সময়ই এগিয়ে এসেছেন। ভারতের এবং বহির্ভারতের বিভিন্নস্থানে সরকারী এবং বেসরকারী বিভিন্ন কাজে তাঁকে যেতে হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও তিনি যোগদান করেন। এ সমস্ত বিবিধ কাজের জন্যই যেখানেই তিনি যোগ দিয়েছেন সেখান থেকেই তিনি তাঁর প্রশংসার পাত্র পূর্ণ করে ফিরেছেন।

বিদেশ ভ্রমণের সময় ভারতের রাজনৈতিক বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা করেন। তাঁর বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় এবং প্রশংসনীয় দক্ষতা ছিল এই যে, ভারত-চীন সীমান্ত বিবাদের সময় তিনি বিভিন্ন দেশে ভ্রমণকালে, সেইসব দেশের সামনে এই বিবাদের বিষদ ব্যাখ্যা করেন। 'ফেডারেশন অব্ ইউনিভারসাম্রি ওম্যান্'-এর তিনি ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা; কিছুকালের জন্য তিনি ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন আর রাজ্য বিধান সভার নির্বাচন যুদ্ধে প্রতিনিধিত্ব করবেন না এবং রাজনৈতিক কর্মজগৎ থেকে বিদায় নেবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লক্ষ্মী মেনন রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে, সংস্কৃতি ও সামাজিক কল্যাণ সেবাকাজে ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে নেমে পড়লেন। বহু প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন সংকলন ছাড়াও 'দি পজিশন অব্ ওম্যান্' শিরোনামে একটি পুস্তক রচনা করেন, যার বিষয়বস্তু ছিল, ভারতের নারীদের দুর্ভাগ্যের এবং ক্রমশঃ পরিবর্তনের কথা। ছোট ছোট পুস্তিকাও তিনি রচনা করেন, যেগুলির মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন নারী প্রগতির পথ এবং এজন্য সরকারের কি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, এরই পাশাপাশি ভারতের নারী-সমাজকে সমাজের কাছ থেকে এবং সরকারের কাছ থেকে সামাজিক অধিকার অর্জনের জন্য অনবরত আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা।

নারীদের মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সমাজের মধ্যে নিজেদের জায়গা করে নেবার কাজে সাহায্য করবার জন্য লক্ষ্মী মেনন ছিলেন আগ্রহী। তাঁর জীবনের প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্য হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন নারীদের উন্নতি এবং প্রগতির কাজ; বিশেষ করে ভারতের নারীদের। মহিলাদের মধ্যে সামাজিক পুনর্গঠনের কাজে তিনি সর্বদাই তাদের পাশে থাকতেন; তাদের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ প্রসারের কাজে তাঁর অকুণ্ঠ এবং অনবরত সমর্থন নারীদের সাহায্য করেছে সর্বতোভাবে। তিনি

বিশ্বাস করতেন যে, জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে মহিলাদের অবস্থার উন্নতির উপর। হিন্দু ধর্মান্ধতার ব্যাপারে তিনি ছিলেন উদার এবং কুসংস্কার বর্জিত। রাজনীতির ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতা বা সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারে তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী।

তাঁর প্রতিভা এবং সেবাকার্যের জন্য ১৯৫৭ সালে তিনি পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত ও পুরস্কৃত হন। তিনি মহিলা ও শিশুদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি হলেন একান্ত অনাড়ম্বর, কঠোর আত্মসংযমী এবং সেবাপরায়ণা। বিধান সভার সদস্যা ও মন্ত্রী থাকাকালীন পার্লামেণ্টে এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বক্তব্য রাখবার ক্ষেত্রে, বৈঠক পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিলেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন শান্ত এবং সংযত। জাতীয় আন্দোলনে, সমাজ সেবার কাজে, এমনকি গৃহকর্মের ক্ষেত্রেও তিনি একই সঙ্গে সমান দক্ষতার পরিচয় রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

এস. মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী

(১৮৮৬—১৯৬৮)

১৮৮৬ সালের ৩০শে জুলাই এস. মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী পুডুকোট্টা রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তাঁর মাতা চন্দ্রম্মাল এবং পিতা এস. নারায়ণ স্বামী আয়ারের জ্যেষ্ঠা কন্যা। তাঁর পিতা এস. নারায়ণ স্বামী আয়ার ছিলেন একজন ইংরেজী সাহিত্যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তি; তিনি পুডুকোট্টার মহারাজা কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাজের দায়িত্বে ছিলেন; এস. মুথুলক্ষ্মীর দাদু ছিলেন একজন কৃষক। পারিবারিক পরিচয় অনুযায়ী এস. মুথুলক্ষ্মী ছিলেন মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের সন্তান। সরকারী শাসনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাপারে অভিমত প্রকাশ করবার ফলে এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এস. নারায়ণ স্বামীর মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়ার ফলে তিনি অধ্যাপনার কাজে ইস্তফা দিলেন।

পিতার এই আকস্মিক কাজে ইস্তফা দেবার জন্য এস. মুথুলক্ষ্মীদের গোটা পরিবারকে এক নিদারুণ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। এই সময় তিনি ছিলেন স্কুলের ছাত্রী; তিনি ছিলেন খুব বুদ্ধিমতী এবং রাজ্যের মধ্যে মেধাগত মানে প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্রী। এইজন্য রাজ্য প্রদত্ত সরকারী বৃত্তিতেই তাঁর পড়াশুনা চলত। কিন্তু পারিবারিক অভাব থাকা সত্ত্বেও মুথুলক্ষ্মী তাঁর প্রচেষ্টায় এবং মেধায় নিজেকে সাফল্যের দ্বারে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর অতীত জীবনকে তুলে ধরবার অর্থ হোলো এই যে, পরবর্তী সময়ে দেখতে পাওয়া যায় যে, তিনি সবসময়ই দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।

অসুস্থ যুবক এবং দুস্থরা সবসময়ই তাঁর সাহায্য পেয়েছে।

১৯১৪ সালে ডঃ টি. সুন্দরা রেড্ডীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ডঃ টি. সুন্দরা রেড্ডী ছিলেন এফ. আর. সি. এস. ডাক্তার; তাঁকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে খুব পরিশ্রম করতে হয়। তাই তাঁদের বিবাহের পর বেশ কিছুদিন মুথুলক্ষ্মীকে অর্থনৈতিক অসুবিধার মধ্যে কাটাতে হয়। তাঁর পিতা-মাতা, বিশেষত পিতা সবসময় তাঁকে মহৎ আদর্শ সম্বন্ধে অনুপ্রাণিত করেছেন। এস. মুথুলক্ষ্মী ভারতীয় এবং বিদেশী বেশ কয়েকজন মহান ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে স্বামী-বিবেকানন্দ এবং মহাত্মা গান্ধী; বিদেশীদের মধ্যে যৌবনে সুইডিস মিশনারীর আদর্শ ছাড়াও জোসেফিন বাটলার, মারগারেট কাজিন্‌স্ এবং অ্যানী বেশান্ত প্রমুখ তাঁর জীবনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ঈশ্বর জ্ঞানধর্মী মিসেস স্ট্যাণ্ড-ফোর্ড ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

সমাজ সেবার কাজে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। সামাজিক এবং রাজ-নৈতিক কাজে মহিলাদের বিষয়ের প্রতি তাঁর সুগভীর নজর ছিল; বিশেষ করে রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচীতে মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রতি এবং পাশাপাশি তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি সবসময়ই আগ্রহী ছিলেন এবং যথেষ্ট চেষ্টাও করেন। রাজনৈতিক কর্মধারার থেকেও তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশী যে কাজটি ছিল আকর্ষণীয় তা হোলো শিশুদের অবস্থার উন্নতি করা। রাজনৈতিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন গান্ধীজীর অন্ধ অনুসরণকারী।

পারিবারিক বিভিন্ন কারণবশতঃ পিতা-মাতার কাছ থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ কম পেলেও এস. মুথুলক্ষ্মী নিজের প্রচেষ্টায় উচ্চ ডিগ্রী-লাভে সমর্থ হন এবং মেডিসিনে ডক্টরেট করবার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর অতীতের, বাল্যের ও কৈশোরের জীবনের দিকে যদি একবার চোখ ফেরানো যায়, তবে দেখা যাবে যে, পাঠ্যাবস্থায় তিনি ছিলেন একমাত্র বালিকা যিনি সেই রাজ্যে তখন ইংরেজীতে শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং ১৯০৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশন্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবং সমস্ত বাধা ও সামাজিক সংস্কারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে তিনিই প্রথম ১৯০৫ সালে 'মহারাজা কলেজ ফর মেন' থেকে ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় পরীক্ষা দেন। এই কলেজ থেকে তিনি ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার পর ১৯০৭ সালে উচ্চশিক্ষার্থে মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে এম. বি. সি. এম. কোর্সে

ভর্তি হন ; এই রাজ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম মহিলা ছাত্রী যিনি মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। পাঁচ বছর এই কোর্সের পাঠ সম্পন্ন করবার পর ১৯১২ সালে ডিস্টিংশন নিয়ে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মেডিসিন, সার্জারী এবং মিডওয়াইফারী বিষয়ে প্রথম হবার জন্য তিনি প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য স্বর্ণপদক পুরস্কার এবং সাম্মানিক প্রশংসাপত্র পান।

কর্মজীবনে প্রবেশ করবার প্রথমেই তিনি সরকারের অধীনে মেটারনিটি হাসপাতালে কিছুদিনের জন্য হাউস সার্জেন হিসাবে কাজ করেন। এরপর নিজেই পেশাগত ব্যবসা শুরু করেন। ডাক্তারী প্র্যাকটিস্ শুরু করবার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি সুখ্যাতি অর্জনে সক্ষম হন। ১৯২৫ সালে তিনি ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে শিশু ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হবার জন্য শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে যান। উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা করলেও, এর আগে থেকেই অর্থাৎ ১৯১৩ সাল থেকেই তিনি জীবিকা উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। তবে এই সময়ের আগে থেকেই তিনি সমাজকল্যাণমূলক কাজের প্রতি আগ্রহী ছিলেন।

খুব অল্প বয়স থেকেই মুথুলক্ষ্মী সমাজকল্যাণ কাজের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েন এবং মহিলা ও শিশুদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ করতে থাকেন, ফলে একজন সক্রিয় সমাজসেবী হিসাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পরিচিত হন। ১৯১৩ সালে তিনি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান. 'ওম্যান্স্ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোশিয়েশন অব মাদ্রাজের' সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ১৯১৭ সাল পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন : তিনি 'উইডোস্ হোমে' দরিদ্র মহিলা ও শিশু রোগীদের বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করতেন। ১৯১৭ সালে তিনি লেডি হোয়াইট হেডের দ্বারা সংগঠিত 'সোস্যাল সার্ভিস লীগের' জন্য কাজ করেন। মুসলিম লেডিস এ্যাসোশিয়েশনের' তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন। 'সারদা হোম', 'মাদ্রাজ সেবাসদন', 'সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ান লেডিস সমাজ ফর প্রোটেক্শন অব মাইনর গার্লস' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

সামাজিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে ধীরে তিনি রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন এবং বস্তুতপক্ষে বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। ১৯২৬ সালে বিদেশ থেকে ফিরে আসবার পর,

তিনি মাদ্রাজ বিধান পরিষদের প্রথম মহিলা সদস্যা নির্বাচিত হন। ১৯২৮ সালে তিনি এই পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর কারাবন্ধনের জন্য তিনি এই পদের দায়িত্ব থেকে প্রতিবাদ-স্বরূপ পদত্যাগ করেন। ১৯২৭ সাল থেকেই মূলত তাঁর জীবনের পরিবর্তন আসে, তিনি এক পরিবর্তিত অবস্থায় এসে দাঁড়ান। ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তাঁর সমাজসেবার পাশাপাশি জাতীয় সেবার ক্ষেত্রে অবদান ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে। একজন বিধান পরিষদের সদস্যা হিসাবে ১৯২৬ সালে নির্বাচিত হবার পর তিনি, সামাজিক এবং নৈতিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের কাজ করেন। এই সময় তিনি মহিলা শিক্ষার প্রসার, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রসূতি এবং শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতি বিষয়ে ফলপ্রসূ কার্য সম্পাদন করেন।

নিজের দায়িত্বে তিনি শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে নিয়মিতভাবে শিশুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কাজে সুবিধার জন্য একটি অভিভাবক কমিটি গঠন করেন, যাঁরা শিশুদের হাসপাতালগুলিতে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটি শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ে অনুসন্ধানপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এছাড়া, শিশুদের জন্য বিভিন্নস্থানে তিনি মহিলাদের তত্ত্বাবধানে শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। মাদ্রাজ ভিজিলেন্স এ্যাসোশিয়েশনের তিনি ছিলেন একজন সংগঠক; বেশ কয়েক বছরের জন্য তিনি এ প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি পদে কাজ করেন। এখানে কাজ করতে গিয়ে তিনি 'ফার্স্ট রেসকিউ হোম' (First Rescue Home) প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারেও তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না; তিনি এ ব্যাপারে 'ফিলানথ্রোপিক ইন্‌স্টিটিউশন' এবং মাদ্রাজের 'ওম্যান্‌স্‌ ইন্‌স্টিটিউশনের' নিকট হইতে অনুদান পান।

মহিলাদের অবস্থার উন্নতির জন্য, সমাজে তাদেরকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার ব্যাপারে মুথুলক্ষ্মীর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। দুস্থ বালিকাদের পড়াশুনা করবার জন্য বেতন ফ্রি করা, মুসলমান বালিকাদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্হা করা, হরিজন বালিকাদের জন্য সরকারী স্কলারশিপ এবং গৃহবিজ্ঞানের কোর্স চালু করা, প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি তাঁর একান্ত প্রচেষ্টা ফলবতী হয়। বাল্যবিবাহ বন্ধ করা এবং হিন্দু-মন্দিরে দেবদাসী প্রথা উচ্ছেদ করা, এই দুইটি দাবীর জন্য আইনসভায়

একটি দাবি সনদ পেশ করেন এবং এ দাবি আদায়ের ব্যাপারেও প্রচেষ্টা চালান। বিবাহের ব্যাপারে ১৯২৮ সালে ছেলে এবং মেয়েদের বিবাহের বয়স বৃদ্ধির জন্য যে সারদা এ্যাক্ট আইন হিসাবে বিধিবদ্ধ হয় সে ব্যাপারে তাঁর অদম্য প্রচেষ্টা ছিল।

কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় যে প্রচেষ্টা কার্যকরীরূপ নিয়েছিল তা হল, ১৯২৭ সালে দেবদাসী ব্যবস্থা বন্ধ করে দেবার আইন এ্যাক্ট নং ৫, যাতে হিন্দু রিলিজিয়াস এনডাউমেন্ট এ্যাক্ট-এর সংশোধন হয়। মেয়েদের মন্দিরে উৎসর্গ করা, এবং নাচের দলে সমর্পণ করবার ব্যাপারে যথেষ্ট শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ১৯২৯ সালে মাদ্রাজ বিধানসভা এই আইনকে কার্যকরীরূপ দিতে সাহায্য করে। ১৯৩০ সালে এস. মুথুলক্ষ্মীরই প্রচেষ্টায় পতিতালয় বন্ধ করবার আইন রূপ হিসাবে 'সাপ্রেশন অব্ ব্রোথেল' এবং 'ইম্মরাল ট্রাফিক' এ্যাক্ট অনুমোদন লাভ করে। বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সাহায্যে তিনি মহিলাদের বাইরে বের করে আনবার এবং সমাজের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত করবার প্রচেষ্টা চালান। তাঁরই প্রচেষ্টায় আঞ্চলিক কমিটিতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়।

মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে তিনি জনগণের মধ্যে একটা আইন সম্বন্ধীয় অনুভূতি জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৩০ সালে যখন আইনের মাধ্যমে সমাজের পুনর্গঠনের কাজে বিঘ্ন ঘটে তখন তিনি আইনসভার সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন (c. f. Tribute paid by K.M. Balasubramaniam, Published in the 49 th. Annual Report of the W.I.A.)। কিন্তু এজন্য তাঁর সামাজিক কাজকর্মে কোনো ব্যাঘাত হয়নি। তিনি ওম্যান্স্ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোশিয়েশন এবং অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে তাঁর সমাজ সেবার কাজ চালিয়ে যান। ১৯৩০ সালে ধর্মাধর্ম বিচারহীন অনাথ শিশুদের এবং দুঃস্থ শিশুদের জন্য তিনি মাদ্রাজের আডওয়ারে 'অভ্ভাই হোম' প্রতিষ্ঠা করেন। ধীরে ধীরে এই সংস্থার আরো উন্নতি এবং প্রসার ঘটে এবং প্রতিবন্ধী মহিলা ও শিশুদের সেবার কাজে এই সংস্থা আত্মনিয়োগ করে।

১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত, তিনি মাদ্রাজ চিল্ড্রেন্স্ এইড্ সোসাইটির সেক্রেটারী ও সংগঠক হিসাবে কাজ করেন এবং জুনিয়র ও সিনিয়র সার্টিফাইড স্কুলগুলির জন্য জুভেনাইল কোর্ট সংগঠিত করেন। ১৯৩৫ সালে লাহোরে যে সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলন হয়, সেখানে

তিনি সভাপতিত্ব করেন। এই সংগঠনে যথাক্রমে সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদের দায়িত্বে তিনি ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। সর্ব-এশিয়ান মহিলা কনফারেন্সে (All Asian Women Conference) তিনি ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং কমিটির সভাপতি পদে নির্বাচিত হন ; এই পদে তিনি ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত থেকে কাজ করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি মাদ্রাজ করপোরেশনের প্রথম মহিলা অল্ডারম্যান নির্বাচিত হন এবং দু'বছরের জন্য এ পদের দায়িত্বে থেকে কাজ করেন। এই সময় তিনি শিশুশিক্ষা এবং শিশু কল্যাণের ব্যাপারে যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালান এবং বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান করেন।

১৯১৭ সাল থেকে মুথুলক্ষ্মী ওম্যান্‌স্ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোশিয়েশনের সহ-সভাপতি হন ; এবং ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত এ পদে থাকেন ; ১৯৩৩ সালে অ্যানী বেশান্তের মৃত্যুর পর তিনি এ-সংগঠনের সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। ১৯২৬ সালে প্যারীসে অনুষ্ঠিত মহিলাদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি ছিলেন ভারতীয় প্রতিনিধি এবং ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে ১৯৩৩ সালে যে মহিলা আন্তর্জাতিক সম্মেলন চিকাগোতে অনুষ্ঠিত হয় সেখানেও তিনি যোগদান করেন। অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলনের নীতি পদ্ধতির ব্যাপারে অভিভাবকত্ব করেন। মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করাবার ব্যাপারে তাঁর অদম্য প্রচেষ্টা ছিল। সেই কারণেই ওম্যান্‌স্ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোশিয়েশনের মাধ্যমে তিনি মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকারগুলিকে অর্জন করবার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালান এবং সফলতাও লাভ করেন। এই এ্যাসোশিয়েশনের মাধ্যমেই মহিলাদের প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার এবং রাজনৈতিক অধিকারগুলির মধ্যে কিছু কিছু অর্জন করা সম্ভব হয়।

১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪০ সাল এই সময়ের মধ্যবর্তী সময় অসহযোগ আন্দোলনের সময় ; এই সময় তিনি এ-আন্দোলনের পাশাপাশি 'স্ত্রী ধর্ম'' নামক পত্রিকাটির সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন। নির্বাচনে সাধারণের প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার এবং মহিলাদের জন্য অসংরক্ষিত আসনের দাবীতে প্রমাণ পত্র সংযোগে লণ্ডনের জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটির সামনে দাবি পেশ করেন ; এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে ছিলেন মিসেস হামিদ আলি ও রাজকুমারী অমৃত কাউর। ১৯৬৬ সাল থেকে তিনি তার কার্যধারার গতি পরিবর্তন করলেন। এ-বছর থেকে তিনি ক্যানসারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন ; ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত এ আন্দোলন

অব্যাহত থাকবার পর, তাঁর অদম্য উৎসাহ এবং শ্রান্তিহীন প্রচেষ্টার ফলে ১৯৫৪ সালে মাদ্রাজের আডওয়ারে ক্যানসার ইন্সটিটিউট স্থাপিত হয়। এটিই ছিল আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনের অধিকারী ভারতের প্রথম ক্যানসারের রোগ গবেষণা কেন্দ্র।

স্বাধীনতার পরও তিনি সমাজসেবা কাজের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি বিধান পরিষদের সদস্যা হন। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল, এই সময়ের জন্য তিনি ষ্টেট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এডভাইজারী বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান হন এবং এই বোর্ডের একটি চারিত্রিক দৃঢ় রূপ দিতে সক্ষম হন। ১৯৬৮ সালে তাঁর মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি সমাজসেবামূলক কার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি সর্বদাই মাদ্রাজের সমাজসেবীদের মধ্যে থেকে কাজ করেছেন, তাদের কাজে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, পরিচালনার ভূমিকায় থেকেছেন। তাঁর এই সমাজসেবা কাজের স্বীকৃতিও তিনি পেয়েছেন, মহিলা ও শিশুদের জন্য বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করবার জন্য ভারত সরকারের পক্ষে স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৬ সালে তিনি পদ্মভূষণ সম্মানে পুরস্কৃত হন।

সরল দৃঢ়চেতা এবং বীর ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হয়ে তিনি নৈতিক উৎসাহ এবং আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন সব সময়ই। কোনো আদর্শপূর্ণ কার্য গ্রহণের ক্ষেত্রে লক্ষ্যে না পেঁাছান পর্যন্ত তিনি বিশ্রাম নিতেন না। হিন্দু ধর্মের প্রতি অনুরাগী হোলেও, এ ধর্মের প্রতি তাঁর কোনো গোঁড়ামি ছিল না। মানসিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন দর্শনে বিশ্বাসী। সমস্ত ধর্মের ব্যাপারে তিনি জ্ঞাত ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল, কিন্তু কোনোরকম কুসংস্কারকে তিনি মনে কখনো স্থান দেননি, সব সময়ই তার প্রতিবাদ করেছেন। সব ধর্মই সমমতের, এ বিশ্বাস তাঁর ছিল এবং সব ধর্মমতকেই তিনি শ্রদ্ধা করতেন। কোনো রকম জাতিগত প্রথায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুবই আধুনিক এবং বাস্তবসম্মত। বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করে তাঁর কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছিল। সতীদাহের মত প্রথাকে তিনি ঘৃণ্য বলে মনে করতেন; বিধবাবিবাহের সপক্ষে তাঁর মত ছিল। পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই তিনি উচ্চনৈতিকতা বোধের মনোভাব প্রকাশের পক্ষে আগ্রহী ছিলেন।

তিনি ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী মনোভাবের মহিলা ; দেশের জন্য তাই বিধান সভার ডেপুটি স্পীকারের পদে ইস্তফা দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। স্বাধীন সংঘবদ্ধ ভারতের মাটিতে সমগ্র ভারতবাসী বাস করবেন এই ছিল তাঁর কাম্য। ভাষাগত এবং ধর্মগত বিভেদের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ সর্বদাই ধ্বনিত হয়েছে, এমন কি ভাষাগত দিক দিয়ে ভারত বিভাগের বিরোধিতার মনোভাবও তিনি পোষণ করেছেন, কিন্তু এতে কোনো সুফল পাওয়া যায়নি, স্বাধীনতার মুক্তির আনন্দের পাশাপাশিই দেশ বিভাগের গ্লানিকে ভারতবাসীর গ্রহণ করতে হয়েছিল। মুথুলক্ষ্মীও এতে মর্মাহত হয়েছিলেন।

একজন কংগ্রেস সদস্যা এবং গান্ধীজীর আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে তিনি গ্রামের মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের সুখে-দুঃখে। খাদি এবং এর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কুটীর শিল্পের প্রসারের বিষয়ে তাঁর ছিল প্রচণ্ড আগ্রহ এবং একাজ তিনি দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন। জাতীয়তা আন্দোলনের ক্ষেত্রে অহিংস আন্দোলনের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট আস্থা ছিল। আর সেই কারণেই তিনি এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ভারতের ব্রিটিশ শাসনের যেসব দিকগুলি তাঁর কাছে ভাল বলে মনে হোতো, সেগুলি হোলো,— খৃষ্টান মিশনারী কর্তৃক প্রবর্তিত বিভিন্ন সমাজসেবামূলক এবং মহিলাদের সপক্ষে করণীয় কিছু কাজ-কর্ম এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা প্রভৃতি। স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব তিনি খাদ্যের চেয়েও অধিক বলে উপলব্ধি করেছিলেন। ১৯২৮ সালে তিনি হার্টগ এডুকেশন কমিটির একজন সদস্য হিসাবে ভারতের সমস্ত স্থানে পরিভ্রমণ করেন। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি নিজস্ব জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ভারতে এবং বার্মায় এবিষয়ে পড়াশুনা করেন বেশ কিছুকাল। পিছিয়ে পড়া মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের এবং প্রচেষ্টার এতটুকু ঘাটতি কখনো পরিলক্ষিত হয়নি। উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে তিনি সব সময়ই মেয়েদের উৎসাহিত করেছেন এবং এর ফলে বহু মহিলা তাঁর উৎসাহের আলোকে আলোকিত হতে সক্ষম হয়েছিলেন ; যে সমস্ত প্রথা এবং কুসংস্কার মহিলাদের শারীরিক ও মানসিক শ্রীবৃদ্ধিতে বাধাস্বরূপ হয়েছে সেই সব বাধার বিরুদ্ধেই তিনি তাঁর প্রতিবাদের কণ্ঠ সোচ্চার করেছেন। এবং মহিলাদের এগুলির বিরোধিতা করবার মতো সাহস সঞ্চার করবার চেষ্টা করেছেন, সুফলও

পেয়েছেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে জাতীয়তাবাদের প্রবর্তন করা এবং তা সমাজের পক্ষে ফলপ্রসূ হয়ে সমাজকে সংস্কৃতির আলোকে আলোকিত করবে, এই ছিল তাঁর মত।

তিনি ছিলেন সুবক্তা। তামিল, তেলেগু ভাষার উপর এবং ইয়োরোপিয়ান সাহিত্যের উপর তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। বহু সভায় তিনি তাঁর উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন। একজন লেখিকা হিসাবেও তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়, তদানীন্তন ইংরাজী পত্রিকাতে সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার উপর প্রবন্ধ লেখা থেকে। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি 'স্ত্রীধর্ম' পত্রিকার সম্পাদিকার কাজ করেন। ইংরেজী এবং মাতৃভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর তিনি বহু পুস্তিকা লেখেন। এ ছাড়া আত্মজীবনী এবং দুটি পুস্তক তিনি প্রকাশ করেন নাম,—'ওয়ার্ক অব মিসেস মার্গারেট কাজিন' এবং 'মাই এক্সপিরিয়্যান্স অ্যাজ এ লেজিসলেটর'। বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে ডঃ এস. মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী ছিলেন একজন মহিয়সী মহিলা। তিনি ছিলেন মাদ্রাজের প্রথম মহিলা চিকিৎসাবিদ, প্রথম মহিলা মাদ্রাজ বিধান সভার সদস্য, মাদ্রাজ করপোরেশনের প্রথম মহিলা অল্ডারম্যান এবং আইন পরিষদের প্রথম মহিলা সহ-সভাপতি। একজন সমাজ-সংস্কারক হিসাবে অগ্রণী এই নারী ১৯৬৮ সালে পরোলোক গমন করেন। দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত কবি সুব্রামানিয়া ভারতী তাঁর রচনায় মুথুলক্ষ্মীকে এঁকেছেন একজন আদর্শ মহিলা হিসাবে।

এস. আম্বুজাম্মাল

(১৮৯৯—   )

শ্রীমতী এস আম্বুজাম্মাল, যিনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সৈনিক। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের রণতূর্য যখন ভারতের প্রতিটি প্রান্তের আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হয়েছিল, উপযুক্ত নেতৃত্বকে সামনে রেখে এগিয়ে চলছিলেন সংগ্রামের ময়দানে অগণিত ভারতবাসী, তখন প্রয়োজনকে উপলব্ধি করেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে নেতৃত্ব দেবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের উপযুক্ত নেতৃবৃন্দ। মাদ্রাজের পুরুষ নেতৃত্বের পাশাপাশি সেদিন আমরা শ্রীমতী এস. আম্বুজাম্মালের মতো মহিলা নেত্রীকেও দেখেছি যিনি ভারতমাতার পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করবার জন্য এগিয়ে এসেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের মঞ্চে অগণিত মানুষের নেত্রী হয়ে।

শ্রীমতী আম্বুজাম্মাল ছিলেন মাদ্রাজের একজন বিখ্যাত আইনজীবী এবং কংগ্রেস নেতা এস. শ্রীনিভাস আয়েনগার-এর একমাত্র কন্যা। শ্রীমতী আম্বুজাম্মালের মাতা ছিলেন শ্রীমতী রঙ্গকিম্মল। ১৮৯৯ সালের ৮-ই জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন; তাঁদের এ পরিবারটি ছিল রামনাভ জেলার গোঁড়া সংস্কারবাদী পরিবার। গোঁড়া সংস্কারের জন্য এ-পরিবারের মেয়েদের বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণে বাধা ছিল, এবং সেই কারণেই তাঁকে শিক্ষাগ্রহণের কাজটি গৃহেই সম্পন্ন করতে হয়েছিল। একজন অভারতীয় মহিলা তাঁকে ইংরেজী শেখানো, আঁকা, সেলাই করা,

ও হাতের কাজ শেখানো প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। তিনি গান শিখতেন এবং ভাল বীণাবাদক ছিলেন।

১৯১০ সালের মে মাসে মাত্র এগারো বছর বয়সে, এক মধ্যবিত্ত জমিদার পরিবারভুক্ত এস. দেশীকাচারীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এসঃ দেশীকাচারী পেশায় ছিলেন এ্যাডভোকেট। বিবাহের পর তিনি তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ী, মাসী শ্রীমতী জানাম্মালের সংস্পর্শে এসে সমাজ সম্পর্কে সচেতন হতে থাকেন। এছাড়া তিনি গান্ধীজীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হন। গান্ধীজীর সুদৃঢ় অর্থনীতি এবং সামাজিক অর্থনীতির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। পরবর্তী জীবনে তিনি সিস্টার সুব্বলক্ষ্মী, ডাঃ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি এবং মিসেস মার্গারেট কাজিন প্রমুখ যাঁরা সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। এছাড়া বহু গ্রন্থ পাঠ করবার ফলে তাঁর কর্ম-ধারা সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল হন, এগুলি হোলো—বাল্মীকি এবং তুলসীদাসের রামায়ণ, বিবেকানন্দের বক্তৃতামালা, বিশেষ করে ভক্তিযোগ এবং কর্মযোগ। এইসব পুস্তকপাঠ করবার পর তিনি বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হন।

১৯৩০ সালে জাতীয় সেবা কার্যে প্রবেশ করবার আগে তিনি শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ নিয়ে সারদা বিদ্যালয়ে আংশিক সময়ের জন্য কাজ করতেন। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি সারদা মহিলা সংগঠনের সদস্যা হিসাবে সিস্টার সুব্বলক্ষ্মীর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করেন। ১৯২৯ সালে তিনি মাদ্রাজের মহিলা স্বদেশী লীগের কোষাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ শুরু করেন এবং যতদিন না দপ্তর বন্ধ হয়ে যায়, তিনি এই সংস্থার সঙ্গে কাজ করে যান। এই লীগ যদিও অরাজনৈতিক সংগঠন ছিল, কিন্তু গান্ধীজীর আদর্শের ভিত্তিতে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচীগুলিকে কার্যকরী রূপ দেবার জন্য এ-সংগঠন কংগ্রেসের একটা শাখা হিসাবে কাজ করে যেত। এ ধরনের স্বদেশী লীগের এবং অন্যান্য সামাজিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকবার সঙ্গে সঙ্গেই আম্বুজাম্মাল রাজনৈতিক কার্যসূচীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন।

১৯৩০ সালে আম্বুজাম্মাল আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিলেন এবং গ্রেপ্তার হলেন। ১৯৩২ সালে কংগ্রেসের মনোনীত তৃতীয় নিরংকুশ ক্ষমতাসম্পন্ন নেতা হিসাবে তিনি সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব দেন, বিদেশীবস্ত্র বয়কট করে আন্দোলন গড়ে তোলেন, এই সময় তাঁকে গ্রেপ্তার হতে হয়

এবং ছয় মাসের জন্য কারাবরণ করতে হয়। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত হিন্দি প্রচার সভার কার্যনির্বাহক কমিটির তিনি সদস্যা ছিলেন। হিন্দি ভাষার প্রসারের দিকে তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল; তিনি নিজেও এই ভাষা প্রচারের জন্য হিন্দি বিশারদ পাশ করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি হিন্দি প্রচার সভার হয়ে সারাভারত পরিক্রমা করেন। বোম্বাইতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি যোগদান করেন এবং সেখানে গান্ধীজীর সঙ্গে ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত ওয়ার্দা আশ্রমে থাকেন। ১৯৩৬ সালে তিনি মাইলাপোর লেডিস্ ক্লাবের সেক্রেটারীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, এই ক্লাবে তিনি মহিলাদের হিন্দি শিক্ষাদানের কাজও করেন কিছুদিন।

ভারতীয় মহিলা সংগঠনের (Women's Indian Association) সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন; ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত সেক্রেটারী এবং ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কোষাধ্যক্ষের পদের দায়িত্বভার তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল, এবং এখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত অবস্থায় তিনি নিজের দক্ষতা প্রকাশে যথেষ্ট সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই সময়ের জন্য তিনি, বাল্যবিবাহ প্রথার উচ্ছেদ করা, দেবদাসী ব্যবস্থা রদ করা, নারীদের অধিকাররক্ষার দাবী, প্রভৃতি বিষয়ে প্রচণ্ড আন্দোলন চালিয়ে যান। মহিলাদের সমাজের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য তাঁর ছিল অদম্য প্রচেষ্টা। এই সংগঠনের পক্ষে তিনি মাদ্রাজ করপোরেশনের মনোনীত সদস্যা নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে মাদ্রাজে যে সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলন হয় সেখানে তিনি ছিলেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির দায়িত্বে।

১৯৪৮ সাল থেকে তিনি শ্রীনিভাস গান্ধী নিলয়ের কার্যকরী সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ হন। ১৯৫৬ সালে তিনি বিনোভা ভাবের ভূদান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। এ আন্দোলনের তামিলনাড়ুর পদযাত্রায় তাঁর দায়িত্বভার ছিল। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিনি তামিলনাড়ুর কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি থাকেন। এবং ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত স্টেট সোশ্যাল-ওয়েলফেয়ার বোর্ডের সভাপতি পদে থাকেন।

হিন্দি এবং তামিল ভাষায় তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান পরিলক্ষিত হয়। সেই সময়কার বেশ কয়েকটি

তামিল পত্র-পত্রিকায় নারী জাগরণ, স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ের উপর তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া গান্ধীজী এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উপরেও তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি তামিল প্রকাশনার মধ্যে 'তুলসী রামায়ণম', 'গান্ধী নিনাইভু মালাই', 'এম. কে. গান্ধী', 'রেমিন সিসেস্ অব্ মাই ফাদার' প্রভৃতি পুস্তকগুলি উল্লেখযোগ্য।

শান্তস্বভাবা, দীর্ঘদেহী, বীরোচিত ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ছিলেন আম্বুজাম্মাল। একজন মনে-প্রাণে কংগ্রেসকর্মী হিসাবে তাঁকে খদ্দর পরিধান করতে দেখা গিয়েছে। গান্ধীজী ওয়ার্ধাতে যে মহিলা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন সেখানে এবং জাতীয়তা আন্দোলনের সময় তিনি তাঁর সমস্ত স্বর্ণালংকার গান্ধীজীর হাতে তুলে দেন জনগণের স্বার্থে। একটি গোঁড়া হিন্দু পরিবারের মধ্যে থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন মানসিক প্রসারতাকে সঙ্গী করে, তাই জাতিগত প্রথা, অস্পৃশ্যতা, নারী অধিকার প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি তাঁর মানসিক প্রসারতার পরিচয় সবসময় পরিলক্ষিত হয়েছে এবং এ সমস্ত সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সবসময়ই তাঁকে জেহাদ ঘোষণা করতে দেখা গিয়েছে।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এস. আম্বুজাম্মাল বিনোভা ভাবের গ্রামীন কর্মসূচী ভারতের অর্থনীতিকে স্বনির্ভর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পারবে বলে মনে করতেন। তিনি অতিরিক্ত শিল্পীকরণের সপক্ষে ছিলেন না। নৈতিকতা এবং আদর্শগত দিক দিয়ে তিনি ছিলেন গান্ধীজীর একান্ত অনুসরণকারী, সেই কারণেই ১৯৪৮ সালে গান্ধীজীর শ্রীনিবাস গান্ধী নিলয়মে তাঁর যথেষ্ট অবদান পরিলক্ষিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি হোলো ভারতীয় মহিলা সংগঠনের (Women's Indian Association) একটি শাখা। এই প্রতিষ্ঠানে দরিদ্র বালিকাদের বিনা-পারিশ্রমিকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে দুঃস্থ মহিলা ও শিশুদের চিকিৎসা করা হোতো। এ-প্রতিষ্ঠানের একটি মুদ্রণ প্রকাশনালয়ও আছে। এছাড়া আছে এনভেলপ্ তৈরীর সংস্থা, কো-অপারেটিভ-সোসাইটি যেখানে দরিদ্র মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং স্বনির্ভর করবার ব্যবস্থা আছে।

ভারতের প্রতিটি প্রান্তে যে জাগরণের কর্মসূচী শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলনকে ভিত্তি করে, এবং সে আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন—তাঁদের অবদান ভারত-

বাসীর কাছে অজ্ঞাত থাকলেও ইতিহাসের পাতায় তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরকাল। সমগ্র ভারতবাসী সেদিন ইংরেজের অধীনে দাসত্ব করতে করতে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। শুধুমাত্র একটু খানি মুক্ত বায়ু উপভোগ করবার আসায় তাকিয়ে ছিল তদানীন্তন সংগ্রামী নেতাদের মুখের দিকে, যাঁরা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলনের পথ প্রদর্শক। সেই সময় পুরুষ নেতাদের পাশাপাশি যে মহিলা নেত্রীরা কাজ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে এস. আম্বুজাম্মাল ছিলেন অগ্রণী।

কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়

(১৯০৩—   )

১৯০৩ সালে দক্ষিণ কর্ণাটকের এক সমৃদ্ধশালী পরিবারে কমলা-দেবী চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাদ্রাজ সিভিল সার্ভিসের একটি বড় পদে চাকুরী করতেন; কাকা ছিলেন একজন আইনজীবী। তাঁর শৈশবের পাঠ হয় ক্যাথলিক কনভেণ্টে। এরপর কৈশোরের পাঠ শুরু হয় ম্যাঙ্গালোর সেণ্ট মেরি কলেজে; পরবর্তী সময়ে তিনি বেডমেণ্ট কলেজ এবং স্কুল অব ইকোনমিক্সে শিক্ষাগ্রহণ করেন। কৈশোরে বিদ্যালয়ে পাঠকালে তাঁর বিবাহ হয়; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বিধবা হন। বিধবা হলেও প্রাচীন গোঁড়ামী তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি সমস্ত হিন্দু সংস্কারের বিরোধিতা করে পরবর্তী সময়ে নিজের পছন্দ অনুসারে হারীন চট্টোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন। এ-বিবাহিত জীবনে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করতে পেরেছিলেন। তিনি নির্দ্বিধায় এবং প্রচুর পরিমাণে উৎসাহ নিয়ে তাঁর স্বামীর সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণে যান এবং সেখানে নাট্য-শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন; নাটক শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে তিনি আগ্রহী ছিলেন, তাই এইসময় তিনি এ বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করেন। ভারতে ফেরবার পর তিনি স্বামীর শিল্পরুচিপূর্ণ নাটক উৎপাদন পরিচালনার কাজে নেমে পড়েন এবং ব্যক্তিগতভাবে রঙ্গমঞ্চের এক আগ্রহী কর্মী হিসাবে কাজ করতে থাকেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তখন চলছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি; ভারতের মাটিতে এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন

বহু মানুষ যাঁরা ভারতের স্বাধীনতা মন্ত্রকে করেছিলেন সঙ্গী। গান্ধীজীর নেতৃত্বে চলছে তখন স্বাধীনতার আন্দোলন; কমলাদেবী, গান্ধীজী, জওহরলাল নেহেরু, সরোজিনী নাইডু, বন্ধুরবা প্রভৃতি নেতাদের সংস্পর্শে আসেন; এঁদের প্রভাব তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। এমনকি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করতে গিয়ে তিনি ইংল্যাণ্ডের কলেজিয়েটে শিক্ষাগ্রহণ থেকেও বিরত হন। এ আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল সক্রিয়; আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তাঁকে পরপর তিনবার যথাক্রমে তেরাওয়াদা, বেলগাম এবং ভেলোর জেলে কারাবরণ করতে হয়। পরবর্তী সময়েও তাঁকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জেলে কারাবরণ করতে হয়।

কর্ণাটকের যুবকদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের প্রেরণা জাগানোর সঙ্গে সঙ্গে জাতির জন্য আত্মত্যাগের মন্ত্র তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিল যুবকরা। ভূমি-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে বিভিন্ন সমস্যার প্রতি তাঁর নজর ছিল এবং তিনি অনুভব করতেন যে ভূমিবণ্টননীতিজনিত সমস্যার সমাধান করা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ। জমি ভোগ দখলের ব্যাপারে (ভারতের ক্ষেত্রে) সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে সমাজবাদ ব্যবস্থা গ্রহণের দিকে তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল। জমি পুনর্গঠনের ব্যাপারে প্রবর্তিত ব্যবস্থার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি এবং সেই কারণেই ১৯৪৮ সালে তিনি কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন।

তিনি বলেছিলেন, সমাজবাদ শুধুমাত্র দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে নঞার্থক প্রতিবাদ নয়···ইহা এর থেকে আরো কিছু বেশী,—('Socialism is not a mere negative pretext against poverly···it is much more, the positive passion for happy relations.')।

তিনি সমস্ত মানুষকে কংগ্রেসের সঙ্গে এক হয়ে সংঘবদ্ধভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন করবার আহ্বান জানান। তিনি সমাজবাদের প্রচারকার্য সম্পাদনের দায়িত্বগ্রহণ করেন এবং শীঘ্রই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠলেন। পাশাপাশি শ্রমিক সংগঠনের জন্য তিনি সক্রিয়ভাবে কাজ করতে থাকেন এবং দক্ষ শ্রমিকদের সংগঠিত করে বিভিন্ন আন্দোলন সম্পন্ন করতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন ভারতের নারী আন্দোলনের প্রথম সারির নেতৃত্ব; অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে প্রথম নারী সংগঠন প্রবর্তক

হিসাবে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করেন এবং বক্তৃতার মাধ্যমে যুবতী মহিলাদের মধ্যে চেতনার সঞ্চার করতে থাকেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা ফলবতী হয়েছিল সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার মধ্য দিয়েই। সমাজের নারী আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে তিনি বলেন, আমাদের সমাজ এক ভ্রান্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান, তাই সমাজে আন্দোলন একান্ত প্রয়োজন ("It is essentially a social movement,…it is in nature of our society which is at faulty social institutions…")।

তিনি ছিলেন সাদা খদ্দর পোষাকের একান্ত অনুরাগী ; ভারতের মৃতপ্রায় এ শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করবার কাজে তাঁর অংশগ্রহণ উল্লেখ্য। শুধুমাত্র সামাজিক নারী আন্দোলনই নয়, জনগণের মধ্যে তাঁর পরিচিতির বিস্তার ছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে—রাজনৈতিক, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় সদস্যা। এছাড়া কার্যকরী কমিটিরও তিনি সদস্যা ছিলেন। ভারতীয় কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের অর্গানাইজিং কমিটির তিনি যথাক্রমে সেক্রেটারী, সভাপতি, এবং সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন। এছাড়া, সর্বভারতীয় ডিজাইন সেণ্টারের চেয়ারম্যান, সারাভারত হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌ট্‌ বোর্ডের চেয়ারম্যান ; ওয়ার্লড ক্রাফ্‌ট্‌ কাউন্সিলের সহ-সভাপতি প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ পদগুলির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

তিনি দশটি পুস্তক লিখেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। ১৯৬২ সালে ওয়াটুমুল পুরস্কার এবং ১৯৬৬ সালে ম্যাগসেসে পুরস্কার বিজয়ী হবার যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছিলেন একজন খ্যাতনামা সমাজনেত্রী হিসাবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মহিয়সী নারীরা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয়। তাঁদের ত্যাগের মহিমার আলোকে ভারতবাসী আলোকিত। এইসব মহিয়সী ও সংগ্রামী নারীকে কি আমরা অর্থাৎ তাঁদের উত্তরসূরী যুবক-যুবতীরা যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছি ? কমলাদেবী আজ বয়সের ভারে ক্লান্ত এবং পরিশ্রান্ত। সক্রিয়ভাবে না পারলেও আজও তিনি সমাজকে সুস্থ, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী করবার জন্য আগ্রহী, ভারতের উদীয়মান যুবক-যুবতী কি তাঁর সঙ্গে সঙ্গের সাথী হবেন না ?

কমলা দাশগুপ্তা

(১৯০৭—   )

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর মধ্যে যে সকল উজ্জ্বল নক্ষত্র বিপ্লবের পথকে আলোকিত করেছিলেন, নারীদের মধ্যে বাংলার কমলা দাশগুপ্তা ছিলেন একজন। এই মহিয়সী নারী ১৯০৭ সালে ১১-ই মার্চ অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে এক সম্মানিত বৈদ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশে বাসস্থান থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে তাঁর পিতা কলকাতায় একটি বাড়ী তৈরি করেন, যেটি পরবর্তীকালে তাঁদের স্থায়ী বাসস্থান হয়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সঙ্গে তাঁর পিতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' পত্রিকার তিনি ছিলেন সহকারী সম্পাদক এবং ব্যক্তিগত কর্মক্ষেত্রেও ছিলেন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুব সহজ, সরল জীবনযাপন করতেন। "Plain living and high thinking" অর্থাৎ সহজ জীবনযাত্রা এবং গুরুচিন্তা, এই তাঁর মত। কমলা তাঁর পিতার কাছ থেকেই এই সহজাত আদর্শ বৈশিষ্ট্যকে আদর্শ করেছিলেন। পিতামাতার পাঁচ কন্যা এবং তিন পুত্রের মধ্যে কমলা ছিলেন সর্বপ্রথম সন্তান। পিতামাতার ভালবাসায় তাই এই শিশু বেড়ে উঠতে থাকে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর নীতি হয়েছিল ভাল হওয়া ;—যেমন পরিবারের এবং সমাজের জন্য একজন ভাল মেয়ে তৈরী হওয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন ভাল ছাত্র হওয়া, বন্ধুদের মধ্যে ভালবাসার, ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হওয়া।

ছাত্র জীবনে শৈশব এবং কৈশোর কল্পনার পড়াশুনার মধ্যেই কাটে, একজন সমাজের কৃতী ছাত্রী হিসাবেই সমাজ তাঁকে জানত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রী লাভ এবং ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্রী হিসাবে প্রবেশ করা পর্যন্ত তিনি ছিলেন শুধুমাত্র একজন কৃতি-ছাত্রী; এই সময় পর্যন্ত পিতামাতার সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধও ঘটেনি। কিন্তু খুব শীঘ্রই তাঁর মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল; দেশমাতৃকার বন্ধন মুক্তির কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করবার জন্য তিনি শপথ গ্রহণ করলেন। তিনি তখন ছিলেন গান্ধীবাদের একজন বিশ্বস্ত সমর্থক। তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সফলতা আনবে। আসন্ন সংগ্রামে অংশগ্রহণের কাজে নিজেকে প্রস্তুত করবার জন্য তিনি সাবরমতী আশ্রমে যোগ দিতে মনস্থ করলেন, কিন্তু তাঁর পিতা-মাতা রাজী হলেন না।

এ প্রসঙ্গে কমলা দাশগুপ্তা তাঁর আত্ম কাহিনীতে লিখেছেন, "১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন, দেশের আনাচে-কানাচে বইয়ে দিয়েছে জাতীয়-জাগরণের একটা বিষম দোলা। চারিদিকে যেন একটা অভূতপূর্ব সাড়া প'ড়ে গেছে। সেই আবর্তন তরুণ চিত্তকে ঘিরে ফেলতে চাইছিলো। আমাকেও যেন একটা হাওয়া ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। লিখে ফেললাম গান্ধীজীকে, কাঁচা হাতে এবং ততোধিক ছেলে মানুষী ক'রে এক চিঠি। লিখলাম, গান্ধীজীর কাছে, সাবরমতী আশ্রমে আমি থাকবো এবং দেশের কাজ করবো। সঙ্গে সঙ্গে এলো জবাব। কিন্তু তিনি বড়ো নিরুৎসাহ করলেন। লিখলেন, বাপ-মায়ের অনুমতি নিয়ে এসো। তাছাড়া, তুমি এখানে এত সরল জীবনযাপন করতে পারবে তো?

সরল জীবনযাপনে আমার বিন্দুমাত্র ভয় ছিল না। ভয় ছিল মা-বাবার অনুমতি। তঁদের অনুমতির কথা ভাবতেই পারতাম না। হ'লো না তাঁর কাছে যাওয়া। রুদ্ধ আবেগে মনটা রইল খারাপ হয়ে।'

এরপর বাধ্য হয়েই তিনি তাঁর এম. এ. পড়া চালিয়ে যেতে লাগলেন। এম. এ. পড়বার সময় তিনি তাঁর কয়েকজন বন্ধুর এবং সহপাঠীর মাধ্যমে তদানীন্তন কয়েকজন খ্যাতনামা বিপ্লবীর সংস্পর্শে আসেন, যাঁরা গান্ধীজীর-আন্দোলন ফলপ্রদ হবে ব'লে বিশ্বাস করতেন না এবং তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দেশের স্বাধীনতা কখনও রক্তক্ষয়ী বিপ্লব ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়। এই সব বিপ্লবীদের মধ্যে একজন ছিলেন

দীনেশ মজুমদার; তিনি কমলাকে বোমা তৈরীর দক্ষ কারীগর এবং বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোধা রসিকলাল দাসের কাছে নিয়ে যান। এই সাক্ষাৎ কমলার মনের মধ্যে এক গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তিনি শীঘ্রই অস্ত্রধারী বিপ্লবীদের একজন গভীর ভক্ত হয়ে উঠলেন এবং 'যুগান্তর' পার্টিতে যোগ দিলেন।

বিপ্লবী মতবাদ গ্রহণ করবার পর তিনি দলের সব রকমের গোপনীয় কাজ করতে থাকেন। ১৯৩০ সালে তাঁর এই সব কাজ করবার জন্য বাড়ী থেকে প্রচণ্ড বাধা আসে এবং সেই জন্য তিনি গৃহত্যাগ করেন। আর্থিক অসুবিধার সৃষ্টি হোলো স্বভাবতই, দরিদ্র মহিলাদের জন্য তৈরী একটি হোটেলে ম্যানেজারের কাজ নেন, এর ফলে কিছুটা আর্থিক অসুবিধা দূর হোলো। এখানে থেকেও রাজনৈতিক কাজের ক্ষেত্রে এতটুকু ঘাটতি পরিলক্ষিত হোলো না। সেই হোটেলের গুদাম ঘরে তিনি গোপনে বোমা লুকিয়ে রেখে দিতেন এবং দলের নির্দেশ মত সেগুলিকে সব দিকে ছড়িয়ে দিতেন। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ডালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে পুলিস তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

এই সময় তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার চাকুরী নেন। ১৯৩২ সালে একটি মহিলা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি সেই সংগঠনের অন্যতম সদস্যা বীণা দাসকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী কাজে সহায়তা করেন; এ কাজটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন সভায় স্যার স্ট্যানলে জ্যাকসনকে (বাংলার গভর্নর) লক্ষ্য করে গুলী ছোড়া হয়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে বীণা দাস রিভলবার সমেত ধরা পড়েন; কাজে সহায়তা করবার জন্য কল্পনাকেও গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু এবারেও উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তিনি ছাড়া পেয়ে গেলেন। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল এ্যামেণ্ডম্যাণ্ড এ্যাক্টে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়; প্রথমে প্রেসীডেন্সী এবং পরে হিজলী জেলে তাঁকে রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে আটক করে রাখা হয়। ১৯৩৬ সালে তিনি ছাড়া পান। দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন জেলে কারাবাসের সময় তিনি বহু মহিলা বিপ্লবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা লাভের সুযোগ পান। তিনি নিজেও কিছু মেয়েকে তৈরী করেছিলেন যাঁদের মধ্যে সুহাসিনী গাঙ্গুলী একজন, যিনি টিটাগর ষড়যন্ত্র মামলার একজন আসামী অভিযুক্ত হয়েছিলেন।

১৯৩৮ সালে মহাত্মা গান্ধীর উদ্যোগে গঠনমূলক অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে জনগণকে একটি সাধারণ আদর্শের পতাকা-তলে সংগঠিত করবার উদ্দেশ্যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস) গঠিত হয় ; কমলার দলভুক্ত নেতৃত্ব এ সংগঠনকে মেনে নেন এবং গ্রহণ করেন। কমলাও কংগ্রেসে যোগ দেন এবং সক্রিয় কর্মী হিসাবে কাজ করতে থাকেন। ১৯৪১ সালে তিনি বি. পি. সি. সি.-র মহিলা সাব-কমিটির সেক্রেটারী নিযুক্ত হন এবং কলকাতা ও গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন মহিলা সংগঠন গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। ১৯৪২ সালে তিনি গান্ধীজীর 'ভারত ছাড় আন্দোলনে' যোগ দেন এবং যশোর, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে কাজ করতে থাকেন। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে তিনি গেপ্তার হন ; এ সময় তাঁকে প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী থাকতে হয়।

কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে কমলা বেশ কয়েক বছর যুক্ত থাকেন, এ সংগঠনে থাকা কালীন রাজনৈতিক বিভিন্ন কাজের মধ্যে থেকে সমাজ-সেবা মূলক, বিশেষতঃ ত্রাণ কার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪২-৪৩ সালে কলকাতার বার্মাবাসীদের জন্য যে ত্রাণ কার্য সংগঠিত হয়েছিল, সেখানে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল, এই সময়ের জন্য কলকাতায় এবং পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি, কুমিল্লা ও অন্যান্য দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকার দুর্গত মানুষদের জন্য যে ত্রাণ-কার্যের ব্যবস্থা হয়েছিল তাঁর দায়িত্বে তিনি ছিলেন। ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পরে গান্ধীজী যখন বিধ্বস্ত নোয়াখালি পরিদর্শনে যান তখন তিনি ছিলেন নোয়াখালি ক্যাম্পের দায়িত্বে। ত্রাণ-কার্যের পাশাপাশি তিনি তাঁর রাজনৈতিক কার্যধারা অব্যাহত রেখে-ছিলেন। বহু সামাজিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন ; এগুলির মধ্যে 'ভোকেশন্যাল ট্রেনিং কাম প্রোডাকশন সেণ্টার ফর ওম্যান' ; এটি একটি কংগ্রেসের দ্বারা পরি-চালিত মহিলা শিশু কেন্দ্র, এবং 'দক্ষিনেশ্বর নারী স্বাবলম্বী সদন', এ দু'টির নাম করা যেতে পারো। এই সংস্থা দু'টিরই উদ্দেশ্য ছিল অভাবগ্রস্ত, অসহায় মহিলাদের আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকবার জন্য আত্ম নির্ভর করে গড়ে তোলা।

সাংবাদিকতা এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কমলা তাঁর প্রতিভার পরিচয় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলা পত্রিকা, 'মন্দিরা'-র সম্পাদনার

দায়িত্বে বেশ কয়েক বছর কাজ করেন এবং সে দায়িত্ব তিনি দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছেন। তাঁর 'রক্তের অক্ষরে' এবং 'স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী' সাহিত্যের ক্ষেত্রে আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন তিনি বেশ কয়েক বছর; এ সময়কার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা তিনি তাঁর 'রক্তের অক্ষরে' পুস্তকখানিতে ব্যক্ত করেছেন। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী' পুস্তকখানিতে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বাংলার যে সমস্ত মহিলাদের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে কিছু কথা লিখেছেন। এ ছাড়া তদানীন্তন সময়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তিনি নানান বিষয়, বিশেষ-করে স্বাধীনতা আন্দোলন সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন যা সাহিত্য জগতে প্রশংসার স্থান করে নিয়েছে।

বর্তমানে তিনি দক্ষিণ কলকাতায় বাস করছেন। বার্ধক্যের ভারে ভারগ্রস্ত হলেও, মানসিক সবলতা থেকে এখনও তিনি মুক্ত নন। আজও এই আশি বছর বয়সে সাধ্যমত সামাজিক কিছু কাজ করে যাচ্ছেন। তবে এখন আর শারীরিক দুর্বলতা তাঁকে মনোবল সমানভাবে যোগাতে সক্ষম হচ্ছে না, চোখের দৃষ্টি-শক্তি অনেকটা ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে। তবে দৃঢ়তার অভাব মোটেই নেই। তাঁর সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ করতে গেলাম, তিনি একটা কথাই বললেন, আমাদের সময় আমাদের মধ্যে যে সাহস ও দৃঢ়তা ছিল এখনকার মেয়েদের মধ্যে তার সিকি ভাগও নেই। ওঁর কথাতেই সম্মতি জানিয়ে ফিরতে হোলো। সত্যিই তো, আমরা বর্তমানের বিংশ শতাব্দীর যুবতীরা কি স্বাধীনতা সংগ্রামের এই সব মহিয়সীর মত সাহস ও দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারছি। তাহলে ভারত-মাতা শৃঙ্খলমুক্ত হলেও, আজও এদেশের লক্ষ লক্ষ নর-নারী অভুক্ত থাকত না; প্রতি বছরে হাজার হাজার শিশু অপুষ্টিতে মরত না, অশিক্ষার অন্ধকারে ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ নিমজ্জিত হয়ে থাকত না। স্বাধীন ভারতে আলোর মুখ দেখতে না পেয়ে কত ফুল অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দেশ বিভাগের যন্ত্রণা কমলাকে ভাবায়। এ বিভাগকে তিনি সহজে মেনে নিতে পারেননি।

কল্পনা যোশী (দত্ত)

(১৯১৩—   )

"চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সেকেণ্ড সাপ্লিমেণ্টারী কেস"—এই মামলার চার্জ ছিল রাজদ্রোহ, ষড়যন্ত্র, বিস্ফোরক আইন ও অস্ত্রআইন লঙ্ঘন, হত্যা প্রভৃতি। এই মামলার আসামী ছিলেন—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার এবং কল্পনা দত্ত। মামলার রায়ে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসীর এবং কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। কল্পনা দত্তর বয়স ছিল তখন কুড়ি বছর। মাত্র কুড়ি বছরের যুবতীকে সেদিন আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুবান্ধবকে বিশেষ করে তাঁর অতি আদরের দেশমাতৃকাকে ত্যাগ করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের শাস্তি মাথায় তুলে নিতে হয়েছিল। কিন্তু কোনোরকম দ্বিধাদ্বন্দ্বে অবকাশ না রেখেই শুধুমাত্র দেশমাতৃকার শৃংখল-মুক্ত করবার কাজে হাসিমুখে আত্মনিয়োগ করেছিলেন সেই যুবতী।

১৯১৩ সালে ২৭-শে জুলাই চট্টগ্রাম জেলার শ্রীপুর গ্রামে কল্পনা দত্ত (যোশী) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিনোদবিহারী দত্ত ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তাঁর মায়ের নাম ছিল শোভাবালা দত্ত। তাঁর ঠাকুরদা দুর্গাদাস দত্ত ছিলেন চট্টগ্রাম শহরের একজন প্রভাবশালী ডাক্তার। শৈশবের দিনগুলিতে কল্পনা তাঁর কাকার আদর্শে গভীরভাবে প্রভাবিত হন; তাঁর কাকা তাঁকে আদর্শ দেশসেবিকারূপে গড়ে উঠবার প্রেরণা দিতেন। বারো বছর বয়সে ক্ষুদিরাম এবং কানাইলালের জীবনী

এবং শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'—বইগুলি পড়ে তাঁর স্বদেশ চিন্তা আরো দৃঢ় হোলো। তাঁর কল্পনায় আগুন জ্বলে উঠল এবং দিবারাত্রের একটি মাত্রই চিন্তা তাঁকে আশ্রয় করল তা হোলো শহীদ হবার; এর প্রস্তুতিও তিনি মনে মনে গড়ে তুলছিলেন।

১৯২৯ সালে চট্টগ্রাম থেকে ম্যাট্রিক পাস করবার পর কল্পনা আই. এস. সি. পড়বার জন্য কলকাতায় এলেন এবং বেথুন কলেজে ভর্তি হলেন। শুধুমাত্র পড়াশুনা নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকবার মেয়ে ছিলেন না কল্পনা; রাজনৈতিক, সামাজিক কার্যকলাপের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ ছিল। তিনি কল্যাণী দাসের 'ছাত্রী সংঘে' যোগদান করেন; এর কারণ, বেথুন কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী থাকাকালীনই রাজনৈতিক প্রভাব তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে ফেলেছিল। এইভাবেই বেথুন কলেজে 'ছাত্রীসংঘে' যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে প্রথম পদক্ষেপ। এরপর খুব শীঘ্রই বিপ্লবী দলের সঙ্গে তিনি পরিচিত হতে থাকেন।

পূর্ণেন্দু দাস ছিলেন সেই সময় একজন কলেজের ছাত্র, তিনি আবার বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের গুপ্ত বিপ্লবী দলের একজন সক্রিয় সদস্যও ছিলেন। কল্পনা তাঁর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁরই প্রভাব কল্পনাকে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসতে প্রথম সাহায্য করেছিল। সূর্য সেনের দলের সঙ্গে সেই সময়কার আরো কিছু বিপ্লবী দলের নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত এবং নগেন্দ্রশেখর চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯৩০ সালের ১৮-ই এপ্রিল বিপ্লবী সূর্য সেন অর্থাৎ আমাদের অতি পরিচিত মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়। এর আগে মাস্টারদার সঙ্গে কল্পনার যোগাযোগ ছিল না। ঐ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর কল্পনা অতি মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মাস্টারদার সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য; ১৯৩১ সালের মে মাসে সূর্য সেনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ইতিমধ্যে অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন এবং তাঁদের চট্টগ্রাম জেলের হাজতে রাখা হয়।

১৯৩১ সালে মে মাসে কল্পনার সঙ্গে যখন মাস্টারদার দেখা হয়, তখন মাস্টারদা তাঁকে নিজেই কাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হবার জন্য সুযোগ করে দিয়েছিলেন। মাস্টারদার নির্দেশ মত তিনি বিভিন্ন গোপন জিনিষ কলকাতা থেকে নিয়ে আসতেন। ফলে তিনি ডিনামাইট ষড়যন্ত্রে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেন। তিনি কলকাতা থেকে বোমা

তৈরীর মালমসলা সংগ্রহ করে নিয়ে যান এবং চট্টগ্রামের বাড়ীতে বসে গান্-কটন্ তৈরী করতে থাকেন। সেগুলি চলে যেতো জেলের ভিতরে। তাঁরা তখন এই চট্টগ্রাম জেলের ভিতরে ও বাইরে বহুস্থানে ডিনামাইট বসিয়ে বিভিন্ন জায়গা উড়িয়ে দিয়ে জেলের বন্দীদের মুক্ত করতে এবং চট্টগ্রামের পুলিস, ম্যাজিস্ট্রেট ও ট্রাইবুনাল প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট স্থানগুলি আক্রমণের ষড়যন্ত্র করতে থাকেন।

জেলের মধ্যে অনন্ত সিং প্রমুখের সঙ্গে মাস্টারদা যোগাযোগ রাখতেন কল্পনার মাধ্যমে। ১৯৩১ সালে ঐ ডিনামাইট ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা কার্যকরী হবার আগের দিন পুলিস তা আবিষ্কার করে ফেললো। এর সঙ্গে কল্পনা দত্ত যে পুরোপুরি জড়িত পুলিস তা বুঝতে পারলেও প্রমাণের অভাবে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারল না। কিন্তু পুলিস সন্দেহভাজনরূপে তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করবার আদেশ দেন; কল্পনা তখন বি. এস. সি.-র ছাত্রী। তাঁকে একরকম নজরবন্দী করে রাখা হয়; শুধুমাত্র চট্টগ্রামের কলেজে গিয়ে বি. এস. সি. পড়বার অনুমতি দেওয়া হয়।

এই কড়া পাহারার মধ্যেও কিন্তু কল্পনা পুলিসের চোখকে ফাঁকি দিয়ে গভীর রাত্রে প্রায় প্রতিদিনই গ্রামে চলে যেতেন সূর্য সেন, নির্মল সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করতে এবং বিপ্লবী কাজের প্রশিক্ষণ (ট্রেনিং) নিতেন। প্রশিক্ষণে তাঁরা রিভলবার ছুঁড়তে অভ্যাস করতেন; কমরেড প্রীতিলতা ওয়াদ্দারও তাঁর সঙ্গে প্রশিক্ষণ নিতেন। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাস—মাস্টারদা প্রীতিলতা ওয়াদ্দার এবং কল্পনা দত্তকে দিয়ে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু কাজের দিন স্থির হবার এক সপ্তাহ পূর্বে মাস্টারদা কল্পনাকে ডেকে পাঠালেন। যে পথ দিয়ে তাঁকে যেতে হবে সেই এলাকার কোনো মেয়ের পক্ষে একা যাওয়া নিরাপদ ছিল না। তাই কল্পনা পুরুষের বেশে মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করতে রওনা হন। কিন্তু পথে ঐ বেশেই আই. বি. অফিসারের সন্দেহ হওয়ায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। একমাস পরে পুলিস প্রমাণাভাবে তাঁকে জামিনে ছেড়ে দেয়।

প্রীতিলতার বীরোচিত আত্মহত্যার ঘটনাও এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল—এ বিষয় আলোচনা পরবর্তী সময় করব। জেল থেকে খালাস পাবার পর মাস্টারদা যখন গৈরালাতে ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়ীতে আত্মগোপন করেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন কল্পনা দত্ত

এবং আরো কয়েকজন। ১৬-ই ফেব্রুয়ারী হঠাৎ পুলিস এই গুপ্তস্থানের সন্ধান পেলে মিলিটারী এসে রাত্রে বাড়ী ঘেরাও করে ফেললো। মিলিটারী বাড়ী ঘেরাও করেছে টের পেয়েই বিপ্লবীরা পালিয়ে যাবার জন্য সন্তর্পণে এগিয়ে গেলেন। দুর্গম পথ,—একপাশে খাদ, অন্যপাশে পুকুর, মাঝখানে বাঁধের উপর বাঁশঝাড়ের সংকীর্ণ পথে তাঁরা অগ্রসর হতে থাকেন। মিলিটারী এবং বিপ্লবী উভয়পক্ষে সংগ্রামও চলে কিছুক্ষণ। মিলিটারীর লোক ইলুমিনেটিং বোমা ছুঁড়লেন, ঘন অন্ধকার রাত্র দিবা-লোকের মতো আলোকিত হয়ে গেল এবং এই আলোয় তারা বিপ্লবীদের দেখতে পেলো।

বেয়নেট চার্জ করে মিলিটারীর পুলিস বাঁশঝোপের মধ্যে অবস্থানকারী বিপ্লবী সূর্যসেন এবং ব্রজ সেনকে ধরে ফেলে। শান্তি চক্রবর্ত্তী ও সুনীল দাসগুপ্ত গুলী চালাতে চালাতে পালিয়ে যান। কল্পনা সূর্যসেনের সঙ্গে ছিলেন ; কিন্তু তিনি পড়লেন গিয়ে এক ডোবায়, মনীন্দ্র দত্তও আশ্রয় নিয়ে-ছিলেন ঐ ডোবায়। ডোবা থেকে দু'জনে উঠে একটা বাঁশঝোপে আশ্রয় নিলেন; সেখান থেকে তাঁরা গুলী চালাতে লাগলেন। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আবার তাঁরা পুকুরের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। প্রায় একঘণ্টা ডুবে থাকবার পর বহু কষ্টে মিলিটারীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে সেদিনের মতো পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। ২০-শে ফেব্রুয়ারী, বহু অত্যাচার করবার পর পুলিস মাণ্টারদা এবং ব্রজেনসেনকে চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত করে। মাণ্টারদাকে জেল থেকে বের করে আনবার জন্য তারকেশ্বর দস্তিদার, মনীন্দ্র দত্ত, শান্তি-রঞ্জন সেন, অমলেন্দু বিশ্বাস প্রমুখ বিপ্লবীরা প্রস্তুত হতে লাগলেন। প্রস্তুতির কাজ যখন প্রায় শেষ, তখন হঠাৎ একজন কর্মী গ্রেপ্তার হন। তাঁর সঙ্গে কিছু কাগজপত্র ছিল এবং একটা রিভালবারও ছিল। এর ফলে ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। মাণ্টারদার উপর আরো কড়া নজর নেমে আসে। তাঁকে মিলিটারীর প্রহরায় নির্জন কক্ষে রাখা হলো এবং বৈদ্যুতিক 'তার' দিয়ে জেল প্রাচীর ঘিরে দেওয়া হলো।

এই ঘটনার পর গ্রামে গ্রামে মিলিটারীর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেল প্রচণ্ডভাবে। চট্টগ্রামকে 'মিলিটারী এরিয়া' ঘোষণা করা হোলো। প্রতিটি গ্রামে মিলিটারী ক্যাম্প বসানো হোলো। এ-অবস্থায় আত্মগোপন করে থাকা খুবই অসম্ভব হ'য়ে পড়ল ; তাই কল্পনা দত্ত ; তারকেশ্বর দস্তিদার, মনোরঞ্জন দত্ত, মনোরঞ্জন দে প্রমুখ বিপ্লবীরা ক্রমাগত আশ্রয় স্থান পরিবর্তন করতে থাকেন। এভাবে তাঁরা সমুদ্রের কাছে গাহিয়া নামে

একটি গ্রামে আশ্রয় নেয়। কিন্তু এখানেও তাঁদের আত্মগোপনের সংবাদ পেলেন মিলিটারী।

১৯৩৩ সালের ১৯-শে মে। খুবভোরে মিলিটারী এসে অবিশ্রান্ত গুলিবৃষ্টি করতে থাকে। বিপ্লবীদের পক্ষ থেকেও গুলি চলে; যুদ্ধ করতে করতে বিপ্লবী মনোরঞ্জন দত্ত নিহত হন। তাঁদের আশ্রয়দাতা পূর্ণ তালুকদার নিহত হন এবং তাঁর ভাই নিশি তালুকদার মারাত্মকভাবে আহত হন। বিপ্লবীদের গুলি ফুরিয়ে যাবার পর সকলেই তাঁরা গ্রেপ্তার হন। মিলিটারী সুবাদার কল্পনাকে যখন প্রহার করতে উদ্যত, তখন ভারতীয় সৈনিকরা সমবেত ভাবে তীব্র প্রতিবাদ করে। সুবাদার এর প্রতিশোধ নেবার জন্য সৈনিকদের নাম লিখে নিলেন। অন্যান্য বন্দীদের মতো কল্পনাকেও হাতকড়া লাগিয়ে এবং কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই মামলার নাম ছিল 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সেকেণ্ড সাপ্লিমেণ্টারী কেস'। এই মামলার রায়ে সূর্য সেন এবং তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসীর আদেশ হয়; কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

১৯৩৪ সালে, ১২-ই জানুয়ারী রাত্রি ১২-টায় ছ'জন বিপ্লবী, সূর্য সেন এবং তাঁর যোগ্য শিষ্য তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসী হয়ে গেল।

কল্পনাকে আলাদা জেলে রাখা হয়েছিল; ১৯৩৬ সালের পর যখন স্পেনে সিভিল ওয়ার শুরু হয় তখন কল্পনার মতো অন্যান্য বিপ্লবীরা আবার নতুনভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। ১৯৩৯ সালে মে মাসে ছয় বছর জেলে থাকবার পর কল্পনা মুক্তি পান। ১৯৪০ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাশ করেন। ১৯৪০ সালে নভেম্বর মাস থেকে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত পুলিস তাঁকে স্বগৃহে অন্তরীণ রাখে। এরপর তিনি সি. পি. আই.-এর (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র) সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নেন। তিনি চট্টগ্রামে ফিরে আসেন এবং সেখানে তাঁর গ্রামের মহিলা এবং কৃষকদের সংগঠনে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। ১৯৪৩ সালে কমিউনিস্ট নেতা পি. সি. যোশীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

বর্তমানে কল্পনা যোশী নতুন দিল্লীর রাশিয়ান ভাষা প্রতিষ্ঠানে (Russian Language Institute in New Delhi) এবং ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্স্টিটিউটের সঙ্গে ভাষাবিদের কাজে যুক্ত আছেন।

কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য)

(১৯০৭—১৯৮৩)

১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে ভারতের বিভিন্ন স্হানে আন্দোলনের জোয়ার বয়ে যায়। এ আন্দোলনে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এগিয়ে এসেছিলেন বহু নর-নারী। নেতৃত্ব দিয়ে কারাবরণ করেন বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী। পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও এগিয়ে আসেন নেতৃত্ব দিতে। বোম্বাইতে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে পুরুষ নেতৃত্বের সঙ্গে মহিলা নেত্রী হিসাবে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কারাবরণ করে কল্যাণী দাস।

১৯০৭ সালের ২৮-শে মে তারিখে কটকে কল্যাণী দাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বেণীমাধব দাস এবং মাতা সরলা দাস। কল্যাণীর পিতৃভূমি ছিল চট্টগ্রাম জেলায়। কল্যাণীরা দুই ভগ্নী—কল্যাণী ও বীণা; এই দুই ভগ্নীর জীবনে শৈশব থেকেই প্রভাব পড়েছিল পিতামাতা এবং তাঁদের বড় মামা অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের। পিতার কাছ থেকে তাঁরা ছেলেবেলায় বসে বসে সমাজ-বিপ্লবীদের জীবনী শুনতেন। তাঁদের বড় মামার মহৎ চরিত কথাও তাঁরা তাঁদের পিতার কাছে শুনেছেন। একটা আদর্শের জন্য মানুষ যে কত বড় ত্যাগ করতে পারেন সে শিক্ষা তাঁর কাছেই লাভ করেন। বেণীমাধব দাস জীবিকায় শিক্ষক ছিলেন; তাঁর ছিল অজস্র নিঃস্বার্থ কর্মপ্রবাহ। অন্যায়ের কাছে মাথা নত করতে তিনি জানতেন না। কটকে র‍্যাভেনস্ কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছিল যে তিনি স্কুলে

রাজদ্রোহ প্রচার করেন ; এই অপরাধে তাঁকে কৃষ্ণনগরে বদলী হতেও হয়।

এই আদর্শ শিক্ষক বেণীমাধবের সুদৃঢ় চরিত্রের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল সহপাঠী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শে, যখন তাঁরা ছিলেন কটক স্কুলের ছাত্র। কল্যাণীর মায়ের ছিল প্রবল সাংগঠনিক শক্তি। দুস্থ নারীদের জন্য 'পুণ্যাশ্রম' সরলাদেবীর একার চেষ্টাতেই গড়ে উঠেছিল। ভাই বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের প্রতিষ্ঠিত 'নীতি' বিদ্যালয় তিনি বহুদিন পরিচালনা করেন। জাতি চরিত্র গঠনের কাজে সে যুগের নীতি বিদ্যালয়ের প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। এমন পিতামাতার সন্তান কল্যাণী দাস ও বীণা দাস যতই বড় হতে লাগলেন ততই পরাধীনতার গ্লানি তাঁদের গভীর পীড়া দিতে থাকে। তাই গতানুগতিক জীবনে তাঁরা আর সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। কল্যাণীর ছিল মায়ের মতই সাংগঠনিক ক্ষমতা।

১৯২৮ সালে বি. এ. (স্নাতক) পরীক্ষায় পাস করবার পর তিনি ইউনিভার্সিটিতে এম. এ. পড়তে যান। ঐ ১৯২৮ সালেই কল্যাণী দাস তাঁর সহপাঠী ও বন্ধু সুরমা দাস, কমলা দাসগুপ্তা প্রভৃতির সহযোগিতায় 'ছাত্রী সংঘ' সংগঠন করেন। 'ছাত্রী সংঘের' সভানেত্রী ছিলেন সুরমা দাস, সম্পাদিকা কল্যাণী দাস। কলকাতার স্কুল কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে এই 'ছাত্রী সংঘ' গঠিত হয় ; তখনকার দিনে ছাত্রীদের মধ্যে অত বড় সংঘ বোধহয় আর ছিল না। প্রীতিলতা ওয়াদ্দার, বীণা দাস. কল্পনা দত্ত, সুহাসিনী গাঙ্গুলী, ইলা সেন, সুলতা কর, কমলা দাশগুপ্তা প্রভৃতি পরবর্তী দিনের রাজনৈতিক কর্মীগণ এই ছাত্রী সংঘের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। 'যুগান্তর' দলের বিশিষ্ট বিপ্লবী কর্মী দীনেশ মজুমদার এই ছাত্রী সংঘের মেয়েদের লাঠি ও ছোরা খেলায় শিক্ষা দিতেন। পরে দীনেশ মজুমদারের বিপ্লবী কাজের জন্য ফাঁসী হয়ে যায়। ছাত্রী সংঘের পক্ষ থেকে পাঠচক্র, সাঁতার শিক্ষা. সাইকেল চড়া শিক্ষা, ফার্স্ট এইড্ শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

রাজনীতির দিক থেকে এই সংঘের প্রভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে ছাত্রীদের যোগদান করবার আহ্বান জানালেন কল্যাণী দাস ও তাঁর সহকর্মীগণ। তাঁরা যখন বেথুন কলেজ বন্ধ করবার জন্য কলেজ গেটে পিকেটিং আরম্ভ করলেন তখন দলে দলে ছাত্রীরা এসে পিকেটিংয়ে যোগ দিতে লাগলেন। পিকেটিং করবার সময় একদিন পুলিস তাঁদের একজনকে গেপ্তার করে একটা ভ্যানে তুলে শহরের বাইরে একটা ভাঙা বাড়ীতে ছেড়ে দিয়ে এলো।

ছাত্রীরা কিন্তু এতে বিচলিত হোলো না ; সেই নির্জনস্থান থেকে তাঁরা হেঁটে ফিরে এসে দাঁড়ালেন আবার সেই বেথুন কলেজের গেটের সামনে। অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁদের সামনে পেয়ে অন্যান্য ছাত্রীরা মহাউল্লাসে সমস্বরে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করে উঠলেন।

এভাবে তাঁদের পিকেটিং চলতে থাকে। একদিন তাঁরা বেথুন কলেজে পিকেটিং করছিলেন, এমন সময় ইলা সেন নামে বেথুন কলেজের একজন ছাত্রী পিকেটর এসে খবর দিলেন যে, প্রেসিডেন্সী কলেজ গেটে ছাত্র পিকেটারদের উপর গুলি চালনা করা হবে। তৎক্ষণাৎ কল্যাণী দাস ও তাঁর একদল সাথী বেথুন কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজ গেটে চলে গেলেন। ছাত্র-পিকেটারদের ঘিরে দাঁড়িয়ে তাঁরা পিকেটিং করতে লাগলেন। পুলিশ লাঠিচার্জ করে ছাত্রীদের ব্যূহ ভেঙে দেবার চেষ্টা করল ; কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হোলো, ছাত্রদের উপর গুলি চালনা করা আর সম্ভব হোলো না। ১৯৩০ সালে বড়বাজারে বিলাতী কাপড়ের দোকানের সামনে পিকেটিং করা হয়, 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতির' পক্ষ থেকে কল্যাণী দাস ও অন্যান্য কর্মীগণ সেই পিকেটিং-এ যোগ দেন।

১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কল্যাণী দাস হাজরা পার্কে একটি বে-আইনী সভা অনুষ্ঠিত করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন এবং আট মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩২ সালের শেষে তিনি মুক্তি পান। ১৯৩২ সালের ৮-ই ফেব্রুয়ারী ডালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার সেন্ট্রাল জেল থেকে বেরিয়ে এলে তিনি তাঁর সঙ্গে এবার বিপ্লবী কাজে যুক্ত হলেন। এই সময় বহু পুরুষ ও মহিলা বিপ্লবী কর্মী কারার অন্তরালে বন্দী ছিলেন। পরিচালকহীনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাঁরা বাইরে ছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে একত্রিত করে পুনর্গঠন ও কর্মপরিচালনার ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হলেন দীনেশ মজুমদার ; মেয়েদের পুনর্গঠন করবার দায়িত্ব নিলেন কল্যাণী দাস।

দীনেশ মজুমদার প্রভৃতি পলাতকদের যোগাযোগের রক্ষার ব্যবস্থা করা, পুলিসের দৃষ্টি থেকে বে-আইনী জিনিস গোপন রাখা, প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কাজে কল্যাণী দাসের সঙ্গে অন্যান্য বিপ্লবী মেয়েরাও এগিয়ে এলেন। এই কাজে মহিলা কর্মীদের মধ্যে ছিলেন সুলতা কর, আভা দে, সুহাসিনী দত্ত, শান্তি সুধা ঘোষ, প্রভাত নলিনী দেবী, লীলা কমলে, সুতপা দেবী, অমিয়া দেবী প্রভৃতি। দীনেশ মজুমদার তখন কলকাতায়, অথবা পুরুলিয়ার

দিকে নানা স্থানে, অথবা চন্দননগরে, কখনও ঝরিয়ার কয়লাখনিতে মজুর সেজে পলাতক হয়ে ফিরছিলেন। চন্দননগরে থাকাকালীন ১৯৩৩ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পশ্চাতে ধাবমান ফরাসী পুলিস কমিশনার কুইনস্‌কে গুলীতে নিহত করে ছুটে পালিয়ে যান গঙ্গার দিকে। সেখানে কৌপীন পরে গাঁজাখোর সাধুদের সঙ্গে জুটে গেলেন, তাদের সঙ্গে এপারে পেঁছে আশ্রয় নিলেন একটি ঘোড়ার আস্তাবলে।

তিন-চার দিন ঘোড়ার আস্তাবলে ঘোড়ার দানা খেয়েই কাটিয়ে দিলেন, অবশেষে কলকাতার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হন। তখন বিপ্লবী বন্ধু নারায়ণ ব্যানার্জী তাঁর নিজের স্ত্রীকে নিয়ে এসে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে একটি বাড়ী ভাড়া করে সেখানে আশ্রয় দিলেন দীনেশ মজুমদারকে। মহিলা কর্মীরাও সেখানে ছিলেন ; অর্থাভাব নগ্ন মূর্তিতে দেখা দিল। এমতাবস্থায় মহিলা কর্মীরা নিজেদের কর্মের অবসরে গৃহশিক্ষকতার কাজ করে অর্থের অনটন ঘোচাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু এখানেও বাধার সৃষ্টি হোলো, পুলিস জানতে পারলেই গৃহকর্তাকে গিয়ে ভয় দেখিয়ে আসত। ফলে গৃহশিক্ষয়িত্রীদের কাজও বন্ধ হোয়ে যেতে লাগল।

বিপ্লবী কাজের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। দীনেশ মজুমদারের বন্ধু কানাই ব্যানার্জী ছিলেন গ্রীণ্ডলে ব্যাঙ্কের কর্মচারী। কানাই ব্যানার্জীর সহায়তায় ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে জাল সই-এর সাহায্যে ব্যাঙ্ক থেকে সাতাশ হাজার টাকা তুলে আনা হোলো, টাকার প্রয়োজন আপাতত মিটল ; কিন্তু কানাই ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে এ সম্পর্কে মামলা রুজু করা হোলো। তবে যথেষ্ট পরিমাণে প্রমাণাভাবে তাকেও মামলা থেকে মুক্তি দিয়ে রাজবন্দী করে জেলে আটক রাখা হোলো। এদিকে পুলিশ সন্দেহবশতঃ বহু পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে থাকল, এই ব্যাপারে সন্দেহবশতঃ গ্রেপ্তার হবার পর শান্তিসুধা ঘোষ, প্রভাত নলিনী দেবী ও সুলতা কর অন্তরীণ রইলেন। লীলা কমলে ছিলেন মারাঠী মেয়ে। তাঁকে বাংলাদেশের বাইরে বহিষ্কার করা হয়।

দীনেশ মজুমদার ছিলেন প্রগাঢ় আদর্শনিষ্ঠ এবং দরদীপ্রাণ ; গ্রীন্ডলে ব্যাঙ্কের টাকা হাতে থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত কোনো প্রয়োজনে ঐ টাকা খরচ করতে তিনি রাজী ছিলেন না,—অসুস্থ হয়েও নয়। তিনি জানতেন এবারে গ্রেপ্তার হলে ফাঁসী তাঁর অনিবার্য। কারণ, ডালহৌসী স্কোয়ারে টেগার্টের উপর বোমা ফেলবার অপরাধে যাবজ্জীবন

দ্বীপান্তরে তিনি দণ্ডিত হয়ে বন্দী ছিলেন এবং সেই বন্দী অবস্থায় মেদিনীপুর জেল থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। তাছাড়া, কুইন্স্ হত্যা এবং গ্রীণ্ডলে ব্যাঙ্কের মামলার তিনিও একজন আসামী। সেই জন্যই পলাতক জীবনে গেপ্তার করতে এলে হয় যুদ্ধ ক'রে সেখানেই মৃত্যুকে বরণ করতে হবে, না হয় পরাজিত হলে ফাঁসীর দড়িটি হাসিমুখে গলায় তুলে নিতে হবে। বাঁচিয়ে রাখা তাঁকে কোনোমতেই সম্ভব নয়। মৃত্যুপথযাত্রী দীনেশ তাই নিজেকে কেবল নীরবে নিশ্চিহ্ন করে বিলিয়ে দিয়ে চলছিলেন।

অবশেষে সত্যিই একদিন পুলিস এই বিপ্লবীদের ঠিকানা জানতে পারল। ১৯৩৩ সালের ২২শে মে, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়ীতে পুলিসের সঙ্গে বেধে গেল তাঁদের খণ্ডযুদ্ধ। যুদ্ধ করতে করতে হাতের সমস্ত গুলী যখন ফুরিয়ে গেল তখন দীনেশ ও তাঁর সহকর্মীগণ আহত অবস্থায় গেপ্তার হলেন। পরপর অতগুলি গুরুতর মামলার অপরাধের জন্য বৃটিশের আইনে ফাঁসীই একমাত্র শাস্তি লেখা ছিল। দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম সজল নয়নে স্মরণ করে সেই অমর মৃত্যুকে; অমর শহীদ দীনেশ মজুমদারের ফাঁসী হয়ে গেল ১৯৩৪ সালে ৯ই জুন গভীর রাত্রে।

দীনেশ মজুমদার গেপ্তার হবার পরেই কল্যাণী গেপ্তার হন। ১৯৩৩ সালের শেষে তাঁকে হিজলী ও মেদিনীপুর জেলে রাজবন্দীরূপে বন্দী করে রাখা হয়। কিন্তু শারীরিক দিক দিয়ে প্রচণ্ড অসুস্থ হবার জন্য তিনি ১৯৩৮ সালের প্রথম দিকে মুক্তি পান। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে তাঁর নির্মলেন্দু ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহ হয়। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে (বাংলা ১৩৪৫ সালের ১লা বৈশাখ) তিনি মহিলা রাজনৈতিক মুখপত্র 'মন্দিরা' প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাতে তিনি নিজে সম্পাদিকার পদ গ্রহণ না করলেও, পত্রিকা প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক সমস্ত সাংগঠনিক কার্যই তিনি করেন। শুধু 'মন্দিরা' পত্রিকা নয়, ১৯৩৮ সালে তিনি 'ছাত্রীসংঘ'-কেও পুনরুজ্জীবিত করেন।

এই সময় 'ছাত্রীসংঘ' ক্লাবের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন সুহাসিনী চ্যাটার্জী। প্রায় চল্লিশ বছরের কাছাকাছি এই মহিলার সাহস, শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। গৃহকর্মের নানান অসুবিধাও তাঁকে নিরুৎসাহ করতে পারেনি; দেশসেবার আকাঙ্খা ঘরের বৌকে বাইরে নিয়ে এসেছিল। তিনি নিজে সাইকেল চড়া শিখে ছাত্রীদের শিক্ষা দিতে

থাকেন ; পাড়ার লোক ছিঃ ছিঃ ক'রে তাঁকে ঢিল ছুঁড়তে লাগল, কিন্তু নিন্দা তাঁর তেজকে স্পর্শ করতেও পারল না। তাঁরই জয় হোলো।

১৯৪০ সালে কল্যাণী ভট্টাচার্য বোম্বাই চলে যান স্বামীর কর্মস্থলে, এর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছাত্রীসংঘের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। বোম্বাই গিয়েও তিনি তাঁর কর্মধারা বজায় রাখতে সমর্থ হন। সেখানকার সিভিল লিবার্টি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। সেই সময় বোম্বাই-এর আশিটি মহিলা প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়ে এক যুক্ত সমিতি গঠিত হয় ; এই যুক্ত সমিতির মধ্যে তিনি বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪২ 'ভারত ছাড় আন্দোলনে' যোগদান ক'রে তিনি বোম্বাইতে তিন মাসের জন্য কারাবরণ করেন। কারামুক্ত হবার পর কলকাতায় চলে আসেন। বাংলায় এসে পঞ্চাশের মন্বন্তরে যে শোচনীয় দৃশ্য তিনি দেখলেন তারপর আর স্থির থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। পরদুঃখকাতর হৃদয় তাঁর উদ্বেলিত হয়ে উঠল। প্রায় এক বৎসর বাংলাদেশের জেলাগুলিতে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে বেঙ্গল রিলিফ কমিটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে রোগ প্রতিরোধ বিভাগ খুলে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত গ্রামগুলিতে বহু কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। কেন্দ্রগুলিতে ডাক্তার স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকাগণ সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকতেন। সেখানে ঔষধ, বস্ত্র ও চাউল বিতরণ করা হোতো।

এই সময় থেকেই কল্যাণী ধীরে ধীরে রাজনৈতিক কর্মধারা থেকে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের অপেক্ষা সামাজিক কাজকর্মে যোগ দিতে লাগলেন। দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়ে তিনি নিজেকে রাজনৈতিক কর্মপ্রবাহ থেকে পুরোপুরি মুক্ত করবার জন্য জনসেবা, শিক্ষাপ্রচার প্রভৃতি নানান গঠনমূলক কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। 'জীবন অধ্যয়ন' আত্মচরিত তাঁর প্রকাশিত এই পুস্তকখানিতে তিনি তাঁর দরদীহৃদয়ের মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতাগুলি বর্ণনা করেছেন। ১৯৮৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী এই স্বাধীনতা সংগ্রামী নারী ভারতবাসীর কাছ থেকে চির-বিদায় নিয়ে চলে গেলেন পরলোকে।

কস্তুরবা মোহনদাস গান্ধী

(১৮৬৯-১৯৪৪)

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, যিনি ভারতের মাটিতে জন্মেছিলেন, ঊনিশ শতকের অর্ধশতাব্দী অতিক্রম করে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম অহিংসার মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে। যাঁর আহ্বানে ভারতের প্রতিটি প্রান্ত থেকে অগণিত নর-নারী সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন, একটি মাত্র মন্ত্র নিয়ে জড়ো হয়েছিলেন একই মঞ্চে—যে মন্ত্র ছিল পরাধীন ভারতের গ্লানি মুছতে স্বাধীনতা লাভের মন্ত্র ; আর মঞ্চটি হচ্ছে সংগ্রামের মঞ্চ। একই সঙ্গে পথ চলেছিল সেদিন অগণিত নর-নারী তাঁদের নেতৃত্বকে সামনে রেখে। অসহযোগ, লবণ আইন, ভারত-ছাড় আন্দোলনের মূল নেতৃত্বে ছিলেন গান্ধীজী। গান্ধীজীর কথা আমরা অল্পবিস্তর সকলেই জানি ; কিন্তু তাঁর সহধর্মিণী কস্তুরবা যিনি সারাজীবন স্বামীর পাশে থেকে তাঁকে উৎসাহ দিয়েছেন, একই সঙ্গে সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন, তাঁর কথা বোধহয় আমরা সকলে অবগত নই।

১৮৬৯ সালে মহারাষ্ট্রের পোরবন্দরে কস্তুরবা জন্মগ্রহণ করেন ; তাঁর জন্মতারিখ সঠিক জানা যায়নি। তাঁর পিতা ছিলেন একজন নামী ব্যবসায়ী ; পিতার চারজন সন্তানের মধ্যে কস্তুরবা ছিলেন একজন। শৈশবে তিনি পিতৃগৃহে আর দশটা ছেলেমেয়ের মতোই আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটান। তেরো বছর বয়সে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের সময় স্বভাবতই লেখাপড়া না জানা, অশিক্ষিত

একজন গৃহবধূ হয়েই গান্ধীজীর স্ত্রীরূপে তিনি স্বামীগৃহে আসেন। তাঁর স্বামীই তাঁকে পড়তে এবং লিখতে শেখান। স্বভাবের দিক দিয়ে যদিও তিনি ছিলেন ধীরগতি, কিন্তু তিনি পড়তে খুব ভালবাসতেন; জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি পড়াশুনা করে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন পাঁচ সন্তানের জননী, চারটি ছেলে ও একটি মেয়ে।

কস্তুরবা ছিলেন তাঁর স্বামীর শক্তির স্তম্ভ। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ নিয়ে গান্ধীজী বিভিন্ন সময়ে কাজ করতেন। ১৯০১ সালে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ নিয়েই ব্রহ্মচর্য নিয়েছিলেন। গান্ধীজীর ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে সমস্ত কর্মসূচী গ্রহণ এবং কর্মসূচীতে রূপপ্রদানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন গান্ধীজীর সহচরী, এমনকি পারিবারিক জীবনেও তিনি ছিলেন গান্ধীজীর একান্ত প্রিয়সঙ্গিনী। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যেতে পারে, একজন সহজ, সরল কাথিওয়ারী বালিকা হয়েও, গান্ধীজী যখন ইংল্যাণ্ড থেকে ব্যারিস্টারী শিক্ষালাভের পর দেশে ফিরে এসেছিলেন, তখন স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী তিনি প্যারিসের মতো পোষাক পরতে এবং খাবার সময় কাঁটা চামচ ধরতে শেখে নিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে গান্ধীজী যখন তাঁর জীবনের পরিবর্তন করতে মনস্থ করলেন, তখনও তিনি তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেছিলেন এবং তাঁর সহধর্মিনী হিসাবে অত্যন্ত সাদাসিধা সহজ জীবন যাপন করেছেন। কোনোরকম অসুবিধা বোধ না করেই তিনি আশ্রমের জীবনকে মেনে নিয়েছিলেন। আশ্রমের একটি যৌথ পরিবারভুক্তরমতো হয়ে তিনি সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশতেন।

সারাজীবন ধরে তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে কাজ করে গিয়েছেন, এবং নিজেকে একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে চিহ্নিত করে গিয়েছেন। তবে গান্ধীজীর আদর্শ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল না হয়ে তিনি কখনই তা গ্রহণ করেননি। গান্ধীজী সবসময়ই তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, বিশেষ করে তাঁদের দাম্পত্যজীবনের প্রথম দিককার দিনগুলিতে। গান্ধীজীর এই প্রচেষ্টা এবং স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা তাঁকে সত্যাগ্রহ আবিষ্কার করতে সাহায্য করে। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড ভাবে ধার্মিক হিন্দুরমণী। প্রথম জীবনে অস্পৃশ্যতাকে তিনি ধর্মের একটা অংশ হিসাবে ভাবতেন, পরবর্তী জীবনে কিন্তু তাঁর এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের ভাব অনেক কেটে যায়, তিনি সবধর্মের এবং সবজাতির বিভেদ ভুলে গিয়ে সবাইকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এমনকি হরিজন বালিকাকে নিজের কন্যারূপে প্রতিপালনও করেছিলেন। ভাগবদগীতা পাঠ, রামায়ণ পাঠ, সুতোকাটা

এগুলি ছিল তাঁর প্রাত্যহিক কর্মের অংশ ; যতদিন পর্যন্ত না তিনি পুনার আগাখান্ প্যালেসে অসুস্থ হয়ে পড়েন, ততদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর এই প্রাত্যহিক কাজগুলোকে চালিয়ে গিয়েছেন।

তিনি ছিলেন উৎসাহপূর্ণ, সহজ সরল, স্পষ্টবাদী আদর্শময়ী নারী। নিরামিষভোজী ছিলেন, এমন কি তাঁর অসুস্থতার সময় ডাক্তারের নির্দেশও তিনি মানেন নি। ১৮৯৭ সালে তাঁর স্বামী দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন তিনি জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করেন। ১৯০৪ সালে থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত, এই সময়ের জন্য তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে কর্মধারার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন ; এই সময় তিনি ছিলেন ভারতের কোচনার, সাবরমতী এবং সেবাগ্রাম আশ্রমের সবার 'মা'। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তিনি মহিলাদের নেতৃত্ব দেন। আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে গেপ্তার হন ; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁকে কারাজীবন থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯১৫ সালে গান্ধীজী ভারতে ফিরে এলেন। বিহারের নীল চাষীদের উপর নীলকর মালিকদের অত্যাচারের প্রতিবাদস্বরূপ গান্ধীজী তাদের নিয়ে সেখানে আন্দোলন গড়ে তুললেন। এই সময়েও কস্তুরবা স্বামীর পাশে থেকেই কাজ করেছেন। গ্রামের চাষী মায়েদের এবং শিশুদের পরিচ্ছন্নতা, শৃংখলা, পড়ানো এবং লেখানো শিক্ষাদানের দায়িত্ব তুলে নিলেন তিনি। ১৯১৮ সালে কয়েরা সত্যাগ্রহ অর্থাৎ 'করমুক্তির' দাবীতে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয় সেখানেও কস্তুরবার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য ; তিনি গ্রামে ঘুরে ঘুরে গ্রামের মহিলাদের অহিংসার বাণী শিক্ষা দেন। পরবর্তী সময়ে ভারতের অহিংস আন্দোলন শুরু হবার পর গান্ধীজী গেপ্তার হোলে তিনি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। সংগ্রাম আন্দোলনের সম্মুখভাগে নেতৃত্ব দেওয়া, সভা পরিচালনা করা, অর্থসংগ্রহ করা, জনসাধারণের নৈতিক আদর্শকে সঠিকভাবে রক্ষা করা, প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করে দিলেন দিবারাত্র।

পানীয় জলের দাবী, সুতাকল পরিত্যাগ করে খদ্দরের পোষাক পরিধান, প্রভৃতি দাবীতে রাণী পরাজ কমউনিটির (Rani Paraj Community) যে দ্বিতীয় সম্মেলন হয়, সেখানে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালে পরপর দেশীয়দের যথেচ্ছ ব্যবহারের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করেন : এর ফলে তাঁকে দু'বারই

গ্রেপ্তার হতে হয়। গান্ধীজী যখন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে হরিজনদের অস্তিত্ব রক্ষার দাবীতে আমরণ অনশন করছিলেন তখন কস্তুরবা জেল থেকে ছাড়া পেলেন ; কারামুক্ত হবার পর তিনি পুনরায় অনশন আন্দোলনের কাজে যোগ দিলেন এবং অনশন চলাকালীন অনশনে অংশগ্রহণকারী অসুস্থদের সেবা ও শুশ্রূষা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৩৯ সালে রাজ কোটে রাজনৈতিক পুনর্গঠনের দাবীতে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয়, সেখানে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে কস্তুরবাকে গ্রেপ্তার হতে হয় এবং ট্রামবাতে রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে কারাবরণ করতে হয়। গান্ধীজী যখন রাজকোটের শাসনকর্তার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য বিরোধিতা করেন, সেই সময় কস্তুরবা কারামুক্ত হলেন ; কিন্তু কারামুক্ত হয়েও তিনি রাজনৈতিক বন্দীশিবির পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেন ; এর কারণ, তাঁর দুই সহযোগী মণিবেন প্যাটেল এবং মৃদুলা বেন সারাভাই-এর মুক্তির দাবী। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর এই দুই সহযোগীকে মুক্তি দেওয়া হোলো. ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি রাজনৈতিক বন্দী শিবির পরিত্যাগ করলেন না।

১৯৪২ সালে ৯-ই আগস্ট, সকালবেলা গান্ধীজী যখন বোম্বাইয়ের বিড়লা হাউসে গ্রেপ্তার হন, তখন গান্ধীজীর নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী বিকালবেলার সভাপরিচালনার যে দায়িত্ব গান্ধীজীর ছিল, তার দায়িত্বভার নিজেই নিলেন কস্তুরবা এবং যথেষ্ট সুষ্ঠুতার সঙ্গে তাঁর পরিচালনা কার্যও সম্পন্ন করলেন। বিকালবেলা সভা করবার সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হোলো এবং বোম্বাইয়ের আর্থার রোড জেলে নিয়ে যাওয়া হোলো। সেখানে দু'দিন রাখবার পর তাঁকে পুনাতে আগাখান প্যালেসে রাজনৈতিক বন্দী শিবিরে তাঁর স্বামীর কাছে নিয়ে যাওয়া হোলো, স্বামীর সঙ্গে থাকবার জন্য। এই সময় তিনি শারীরিক দিক দিয়ে প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়েন ; কিন্তু তা সত্ত্বেও মানসিক দৃঢ়তার অভাব তাঁর একেবারেই ছিল না। ১৯৪৩ সালে ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী যখন একুশ দিনের জন্য অনশন করতে যান, তখনও কস্তুরবা দিবারাত্রি তাঁর পাশে ছিলেন। সারাদিন তিনি শুধুমাত্র সামান্য আহার করে অর্থাৎ একবার দুধ ও ফল খেয়ে থাকতেন। এই ভাবে দিনে একবার মাত্র সামান্য আহার করে তিনি স্বামীর দ্বারা পরিচালিত সমস্ত অনশনগুলিতে অংশগ্রহণ করেছেন স্বামীর সঙ্গেই এবং সবসময়ই তিনি গান্ধীজীর পাশে থেকেছেন।

পরপর অনশনে যোগ দেবার ফলে তাঁর শরীরও ভেঙে যেতে লাগল,

শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি মানসিক শক্তি হারাননি কখনও। অসুস্থ শরীরেও তিনি তাঁর স্বামীর প্রতি যত্ন নেবার তদারকির কাজ করতেন ; আন্দোলনের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর শরীর প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়ে ; শ্বাস-নালীর ঝিল্লীর প্রদাহজনিত রোগ (bronchitis), হৃদরোগ প্রভৃতি নানান শারীরিক অসুস্থতা তাঁকে প্রচণ্ড কষ্ট দিতে থাকে। তাঁর জীবনের শেষের দিকে শুধুমাত্র সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনা করা এবং গঙ্গাজল পান করা ছাড়া আর সমস্ত কাজ ও খাওয়া বন্ধ করে দিলেন তিনি।

১৯৪৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী মহাশিবরাত্রির দিনে তিনি তাঁর স্বামীর কোলে মাথা রেখে চিরশান্তির নিদ্রায় শায়িত হলেন। তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশ্যে জাতির জনগণ তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন, একশত পঁচিশ লক্ষ টাকাদানের মূল্যে জনগণের সাহায্য নিয়ে গান্ধীজী গ্রামের দরিদ্র মহিলা এবং শিশুদের সেবাকার্যের জন্য সঙ্গে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলবার জন্য 'কস্তুরবা গান্ধী ন্যাশানাল মেমোরিয়াল ট্রাস্ট' নির্মাণ করলেন।

কাদম্বিনী গাঙ্গুলী

(১৮৬১—১৯২৩)

১৮৮২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষার গেজেটে যখন কাদম্বিনী বসুর নাম সাফল্যজনক ফল নিয়ে প্রকাশিত হোলো, তখন জমিদার ব্রজকিশোর বসু খুব আশা নিয়েই কন্যাকে উচ্চশিক্ষা দেবার জন্য মনস্থ করলেন। ভারতে প্রথম যে দু'জন মহিলা স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কাদম্বিনী বসু ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন, অন্যজন হলেন চন্দ্রমুখী বসু। স্নাতক উত্তীর্ণ হবার পর কলকাতার মেডিকেল কলেজে কাদম্বিনী বসু ভর্তি হলেন। পরবর্তী জীবনে এই কাদম্বিনী বসুই হয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলনের একজন পুরোধা, সমাজ-সংস্কারক, স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের কাজে অগ্রণী মহিলা কাদম্বিনী গাঙ্গুলী।

১৮৬১ সালে পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলায়, অধুনা বাংলাদেশের চাঁদসীতে ব্রজকিশোর বসুর কন্যা কাদম্বিনী জন্মগ্রহণ করেন। জমিদার ব্রজকিশোর বসু ছিলেন সংস্কারমুক্ত, তাই শৈশবে শিক্ষাগ্রহণ থেকে তিনি কাদম্বিনীকে বঞ্চিত হতে দেননি। শৈশব ও কৈশোরের শিক্ষা অন্তে, কাদম্বিনী যখন ১৮৮২ সালে, মাত্র একুশ বছর বয়সে বি. এ. (স্নাতক) পরীক্ষায় সাফল্যজনকভাবে উত্তীর্ণ হন, তখন ব্রজকিশোর কাদম্বিনীকে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলকাতার মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দিলেন। ১৮৮৭ সালে কাদম্বিনী কলকাতার মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর এম. বি. ডিগ্রী লাভ করলেন। ভারতের শিক্ষার্থীদের মধ্যে তিনিই প্রথম মহিলা যিনি এম. বি. ডিগ্রী পান। ডাক্তারী পাশ করবার পর পাঁচ বছরের জন্য ইডেন হাসপাতালে এবং

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কাজ করেন ; এর পর উচ্চশিক্ষালাভার্থে তিনি গ্লাসগো এবং এডিনবার্গের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। মেডিসিনের উপর উচ্চশিক্ষালাভার্থে বিদেশযাত্রা করবার বছর চারেক পর তিনি ১৮৯৬ সালে যথাক্রমে গ্লাসগো এবং এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল. আর. সি. পি. (L.R.C.P.), এল. আর. সি. এস. (L.R.C.S.), এল. এফ. পি. এস. (L.F.P.S.) ডিগ্রী লাভ করে স্বদেশে ফিরে এলেন।

পাঠকালীন অবস্থাতেই ১৮৮৩ সালের মে মাসে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে কাদম্বিনীর বিবাহ হয়। দ্বারকানাথ ছিলেন স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারে প্রচণ্ড আগ্রহী ; সেই কারণেই নিজের স্ত্রীকে শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে সহযোগিতাও করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে কাদম্বিনী যখন স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের কাজে হাত দেন, তখন দ্বারকানাথও স্ত্রীর সঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, বিধবা-বিবাহ, সামাজিক নানান কুসংস্কারে আবদ্ধ নারীদের মুক্ত করা প্রভৃতি কাজে সাহায্য করেছিলেন। ১৮৯৬ সালে স্বদেশে ফিরে আসবার পর পেশাগত কাজের পাশাপাশি কাদম্বিনী সামাজিক কাজের মধ্যে যুক্ত হয়ে পড়তে থাকেন। অবশ্য এর আগে থেকেই তিনি এ-কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এখন থেকে আরো বেশী সক্রিয় হতে লাগলেন। তদানীন্তন কয়েকজন খ্যাতনামা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য নিয়ে কাদম্বিনী স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের কাজে নেমে পড়লেন। নারীদের অবস্থার ব্যাপারেও তিনি প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা কাদম্বিনীকে এপথে এগিয়ে যেতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন, তাঁরা হলেন রেভরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালংকার, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রমুখ। কাদম্বিনী চাইতেন ভারতের নারীদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপ্তি ঘটুক : বালিকা বিদ্যালয়ে মেয়েদের কুটীর-শিল্পের কাজ করবার জন্য তিনি তাঁদের উৎসাহ দিতেন। এসমস্ত পরিকল্পনায় কার্যরূপ দেওয়া এবং তা ফলপ্রসূ করবার দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হয়েছিল এবং এ-ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না।

১৮৮০ সালে তিনি বেঙ্গল লেডিস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদিকা হন এবং ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে নারীদের উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্য সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জে ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যান। তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের মধ্যে ছিলেন চন্দ্রমুখী বসু, অবলা দাস, কামিনী রায়, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর রুচিবোধ ছিল

প্রশংসনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল অসীম শ্রদ্ধা। আর সেই কারণেই দেশপ্রেমের প্রতি তিনি অনুরক্ত হন। দেশপ্রেমের ব্যাপারে স্বামীর কাছ থেকেও তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন, যা তাঁর মনে দেশপ্রেম সঞ্চারে সাহায্য করেছে দৃঢ়ভাবে; এবং এর ফলেই তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৮৮৯ সালে তিনিই প্রথম মহিলা যিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে সভাপতিকে অভিনন্দন জানাবার জন্য বক্তব্য রাখেন। এই অধিবেশনে তিনি মহিলা প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ১৯০৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে কলকাতায় মহিলাদের যে সম্মেলন হয়, সেখানে মহিলা সংগঠকদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন।

১৯০৮ সালে তাঁরই সংগঠিত পরিচালনায় কলকাতায় যে সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে বক্তব্য রাখেন। এখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি গান্ধীজীর নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালে যে সকল সত্যাগ্রহী কর্মীরা কাজ করছিলেন এঁদের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা জানান। ট্রান্সভালের কর্মীদের অর্থ সাহায্য করবার জন্য তাঁরই প্রচেষ্টায় একটি অর্থ-সংগ্রহ সংস্থা গঠিত হয়; এই সংস্থা সত্যাগ্রহী কর্মীদের সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহের কাজ করে যায়। ১৯১৪ সালে গান্ধীজী যখন কলকাতা পরিদর্শনে এলেন, তখন গান্ধীজীকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য যে সভার আয়োজন করা হয়, সেখানে তিনি সভাপতিত্ব করেন। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের নৈতিকতাসম্পন্ন বুদ্ধিমতী মহিলা, মালিকের শোষণকে তিনি প্রচণ্ড রকমের অন্যায় কাজ বলে মনে করতেন; তিনি ছিলেন শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে।

এ-ব্যাপারে আইনের দিক দিয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর স্বামী যখন আসামের চা-বাগানের শ্রমিকদের নিয়োগনীতি সম্পর্কে নিন্দা এবং প্রতিবাদ করেন তখন কাদম্বিনীর সম্পূর্ণরূপে সমর্থন পেয়েছিলেন এবং এ ব্যাপারে তিনি তাঁর স্ত্রী কাদম্বিনীর সাহায্য পেয়েছিলেন অনেক। ১৯২২ সালে কাদম্বিনী কবি কামিনী রায়ের সঙ্গে বিহার, উড়িষ্যার [illegible] যান; সেখানে থাকাকালীন কয়লাখনির মহিলা শ্রমিকদের অবস্থা দেখে তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সরকারের [illegible] কমিশন গঠন করেন। কমিশনের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন, এই কমিশনের মাধ্যমে তিনি তাঁর চিন্তা-ভাবনার রূপ দেবার চেষ্টা করেন। তাঁর [illegible]

স্বর্ণকুমারী দেবীও তাঁর স্বদেশপ্রেমিক কার্যাবলীর ক্ষেত্রে কাদম্বিনীর সাহায্য পান বিভিন্ন সময়ে।

১৯২৩ সালে এই মহিয়সী ভারতের মাটি ছেড়ে চিরজীবনের মতো পরাধীন ভারতের মাটি থেকে বিদায় নিলেন এক অজানা মৃত্যুর জগতে। স্বাধীনতার জন্য যে নারী নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, তিনি স্বাধীনতার আলো দেখতে না পেলেও একদিন সে আলোয় ভারত আলোকিত হয়ে উঠবে এ-আশা নিয়েই তিনি সংগ্রামের ময়দানে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা ভারতবাসী কি তাঁর জন্য গর্ব অনুভব করব না!

ক্যাপ্টেন পেরিনবেন

(১৮৮৮—১৯৫৮)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনে যে সকল উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক তাঁদের উজ্জ্বল আলো দিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতবাসীকে পরাধীনতার অন্ধকার থেকে আলোর বিস্তৃত প্রান্তরে এনে দিতে সাহায্য করেছিলেন তাঁরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন ভারতের প্রতিটি প্রান্তরে, কোণে-কোণে। যদিও তাঁদের অবস্থান ছিল বিক্ষিপ্ত, কিন্তু একই আকাশের নীচে যখন তাঁরা একটিই মাত্র মন্ত্র নিয়ে, একত্রিত হয়েছিলেন, তখন এই দুঃসহ অন্ধকারকে দূর করতে তাঁরা যে সক্ষম হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? এদের মধ্যে এখন যাঁকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব তিনি হলেন ভারতের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, আমাদের অতি পরিচিত একটি নাম, দাদাভাই নোরোজীর নাতনী পেরিনবেন। ক্যাপ্টেন পেরিনবেন ১৮৮৮ সালে ১২ই অক্টোবর কুচরাজ্যের ম্যানডভিতে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর পিতা ছিলেন রাজ্য সামরিক হাসপাতালের ডক্টর-ইন-চার্জ। তাঁর মাতা ছিলেন ভীরাবাঈজী। ১৮৯৫ সালে তিনি তাঁর পিতাকে হারান; এসময় থেকে তিনি তাঁর মায়ের অভিভবাকত্বে এসে পড়লেন। তাঁর মাতা তাঁকে কাথেড্রাল গার্লস স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। মায়ের ছায়াতেই তিনি বড় হতে লাগলেন। ১৯০৩ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর এলফিন স্টোন কলেজে এক বছরের জন্য শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৫ সালে তিনি প্যারিসে সোরবোনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন; এখানে তিনি ফরাসী ভাষা এবং সাহিত্যের উপর পড়াশুনা করতে থাকেন। প্যারিসে থাকাকালীন তিনি বেশ কয়েকজন বিপ্লবীর সংস্পর্শে আসেন,—এঁদের মধ্যে ম্যাডাম ভিকাজী কামা, হরদয়াল, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্যামজী কৃষ্ণভার্মা

প্রমুখের নাম করা যেতে পারে যাঁরা তাঁর জীবনে পরিবর্তন আনতে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

ম্যাডাম কামার সঙ্গেই তিনি স্বাধীনতার কাজে যুক্ত হতে থাকেন ; ১৯১০ সালে এঁরা দুজনেই প্রথম মিশরীয় জাতীয় কংগ্রেসে (Egyption National Congress) মিশরীয় প্রতিনিধি হিসাবে ব্রাসেলে যোগ দেন। প্যারীসে পুলিস কলোনী স্থাপনের ব্যাপারে রাশিয়ার সম্রাটের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম হয় সেখানেও পেরিনবেনের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। তাঁর জীবনে তাঁর দাদু এবং মায়ের প্রভাবই ছিল উল্লেখ করবার মতো ; তিনি তাঁর দাদু দাদাভাই নৌরোজীর কাছ থেকে পান স্বাধীনতাকে ভাল-বাসা এবং মায়ের কাছ থেকে পান সাহস সঞ্চার করবার শিক্ষা।

১৯১১ সালে তিনি প্যারীস থেকে ভারতে ফিরে আসেন। ভারতে এসে তিনি একটা কিছু করবার জন্য ভীষণভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ব্রিটিশের ঔদ্ধত্যকে তিনি কখনোই মেনে নিতে পারেন নি। প্রসঙ্গত একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতে আসবার পর একবার তিনি বোনেদের নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছেন, কয়েকজন ইউরোপীয় মহিলা রেলের প্রথম শ্রেণীর কামরা দখল করে বসল ; এতে তিনি একটু বিরত হলেন। তৎক্ষণাৎ স্টেশন মাস্টারের কাছে গিয়ে বিষয়টি তাঁর নজরে আনেন এবং স্টেশন মাস্টারের সাহায্য নিয়ে ইউরোপীয়ান মহিলাদের সরিয়ে দিয়ে বোনেদের নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করবার ব্যবস্থা করেন। এ ঘটনাটি ভাববার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণের কথা মনে পড়ে যায় নাকি ?

১৯১৯ সালে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। গান্ধীজীর সঙ্গে পরিচিত হবার পর তিনি তাঁর আদর্শ এবং কর্মসূচী সম্বন্ধে যথেষ্ট আকর্ষণ অনুভব করেন। হিংসার নীতি বর্জন করে তিনি গান্ধীজীর অহিংসার বাণীকে গ্রহণ করলেন ; বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যেও অংশগ্রহণ করতে লাগলেন তিনি সক্রিয়ভাবেই। তিনিই প্রথম মহিলা যিনি প্রথম খাদিবস্ত্র পরিধান করেন। ১৯২১ সালে যে রাষ্ট্রীয় 'স্ত্রীসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি ছিলেন সেই সভা প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে একজন। এই প্রতিষ্ঠানটি একটি জাতীয়তাবাদী মহিলা সংগঠন। এই সংগঠনের কাজ ছিল খাদিবস্ত্রের ব্যবহার এবং এর সংবাদ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া ; সঙ্গে হরিজনদের মধ্যে কাজ করা। ১৯৩০ সালে, যখন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্বদেশী এবং ব্রিটিশ সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য

—এ দু'টি কর্মসূচীই এক সঙ্গে গ্রহণ করা হয়, তখন স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা 'দেশ সেবক সংঘ' এই কর্মসূচীর কার্যকরী রূপ দানের জন্য এগিয়ে এসেছিল। পেরিনবেনও এই সময় সেখানে কর্মসূচী রূপায়ণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলের বোম্বাই রাজ্য কংগ্রেস কমিটির সদস্যা। ১৯৩০ সালের ২রা জুলাই তিনি যখন গ্রেপ্তার হন, তখন তিনি ছিলেন এই কংগ্রেস কমিটির প্রথম সভাপতি।

১৯২৫ সালে তিনি সলিসিটর (ব্যাবহারজীবী) ধনুনজিসা এস. ক্যাপ্টেনকে বিবাহ করেন। বিবাহিত জীবনে তিনি কখনও তাঁর স্বামীর কাছ থেকে তাঁর কর্মমুখর রাজনৈতিক জীবনে কাজ করবার ক্ষেত্রে বাধা পাননি। ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে ছিল তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ; মহিলাদের মধ্যে প্রথম দল হিসাবে তিনিই প্রথম দলভুক্ত বন্দী যিনি আইন-অমান্য আন্দোলন করতে গিয়ে কারাবরণ করেন। তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আইন-অমান্যকারী হিসাবে বিজাপুর জেলে আটক থাকতে হয়। 'গান্ধী সেবা সেনা' সংগঠনটিকে ১৯৩২ সালে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। পেরিনবেন এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে তিনি কাজ করে যান।

১৯৩৫ সালে তিনি জাতীয়ভাষা দেবনাগরী এবং আরবীলিপিতে শিক্ষাদান এবং প্রচারকল্পে 'হিন্দুস্থানী প্রচার সভা' সংস্থাটির শুভ উদ্বোধন করেন। তিনিই প্রথম পদ্মশ্রী প্রাপ্তকদের মধ্যে একজন। কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করেই তিনি তাঁর সহজ-স্বভাবকে সঙ্গী করে নিয়ে কণ্টকময় রাজনৈতিক কর্মধারার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তাঁর গতিধারা বজায় রাখতে সমর্থ হন, কণ্টকময় কারাজীবনও তিনি কাটান হাসিমুখেই শুধুমাত্র দেশমাতৃকার বন্ধনের শৃঙ্খল মুক্তির জন্য। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদেরই তিনি সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার জন্য এবং স্বাধীনতাকে ও নৈতিকতাকে ভালবাসার জন্য উৎসাহিত করেছেন। ১৯৫৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী এই দেশপ্রেমিক নারী চলে গেলেন অগণিত ভারতবাসীর চিরবন্ধনের মায়া ত্যাগ করে মৃত্যুর পরপারে।

কুমারী জেথিবেন সিপাহীমালিনী

(১৯০৬—   )

কুমারী জেথিবেন সিপাহীমালিনী তাঁর সমস্ত জীবন জাতির সেবায় এবং জনগণের জন্য উৎসর্গ করেছেন। ১৯০৬ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী হায়দ্রাবাদের এক মধ্যবিত্ত হিন্দু অমিল পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অমিল একটি সম্প্রদায়। তাঁর পিতা-মাতার সঠিক নাম সংগ্রহ করা যায় নি, তবে তাঁর পিতা চাকুরিজীবী ছিলেন, এটুকু তথ্যই সংগ্রহ করা গিয়েছে। জেথিবেন শৈশব থেকেই আন্দোলনের পরিবেশের সংস্পর্শে এসেছিলেন বোঝা যায়, কারণ তিনি ছেলেবেলা থেকেই খদ্দর পরিধান করতেন। বিদ্যালয়ে ছাত্রী অবস্থাতেই তিনি খদ্দর পরিধান করতেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের সময় তাঁকে বিদ্যালয় পরিবর্তন করতে হয়। হায়দ্রাবাদের কুন্দনমল উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে কয়েক বছর শিক্ষাগ্রহণ করবার পর তিনি করাচীতে ভারতীয় বালিকা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কারণ, তাঁর পিতা এই সময় বদলী হয়ে করাচীতে আসেন, সঙ্গে পরিবার ও সন্তানদেরও নিয়ে আসেন। এখান থেকেই ১৯২৫ সালে জেথিবেন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

তদানীন্তন সিন্ধি সম্প্রদায়ের হিন্দুদের মধ্যে পণপ্রথার বাধ্যবাধকতা ছিল প্রবল। পণপ্রথা একটি সামাজিক কুপ্রথা। যদিও এ প্রথাকে সকলেই সমালোচনা করতো, তবুও এ প্রথার প্রচলন খুব ভালভাবেই চলছিল তখন। জেথিবেন প্রতিজ্ঞা করলেন, যদি তাঁকে কেউ পণ ছাড়া বিবাহ করেন তবেই তিনি তাঁকে বিবাহ করবেন। যদিও কোনো একজন পণপ্রথা বিরোধী যুবককে বেছে নিয়ে জীবনসঙ্গী করা তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল, কিন্তু তিনি তা না করে নিজেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে নিমজ্জিত করে দিলেন অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে যা তাঁকে বিবাহের রোমান্সের থেকে অনেক

দূরে নিয়ে গিয়েছিল।

ছাত্রী জীবনে অসাধারণ ছাত্রী না হয়েও নেতৃত্ব দেবার মতো ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। স্কুলে তিনি ক্লাসের প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে ক্লাসে নেতৃত্ব দিতেন। মেজর এ্যাটলী ও স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে যখন সাইমন কমিশন গঠিত হোলো তখন তিনি কলেজের ছাত্রী। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের সংগঠিত করে জেথিবেন শোভাযাত্রা করেন। তাঁদের শোভাযাত্রার শ্লোগান ছিল 'সাইমন, গো ব্যাক'।

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত জেথিবেন তাঁর ক্লান্তিহীন উৎসাহ অব্যাহত রাখেন জাতির সেবায়। ১৯৩০ সালে লবণ আইনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং গ্রেপ্তার হন। তবে গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের ফলে শীঘ্রই তিনি কারামুক্ত হন। ১৯৩০ সালের লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় তিনি গান্ধী হাসপাতালের সেক্রেটারী ছিলেন। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী আহত কংগ্রেস কর্মীদের স্বেচ্ছাসেবকরা নিয়ে আসতেন এই হাসপাতালে তাদের সুস্থ করে তোলবার জন্য। ১৯৩০ সালে জেথিবেনের রাজনৈতিক কর্মধারার ক্রমশঃ ব্যাপ্তি ঘটতে থাকে। এই বছরই তিনি করাচী মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের সদস্য নির্বাচিত হন। এর পরে তিনি মিউনিসিপ্যাল স্কুল বোর্ডের সদস্য হন, এই স্কুল বোর্ডের অধীনে একশত বছর ধরে করাচীর সিন্ধি, উর্দু, মারাঠী, গুজরাটী প্রাইমারী স্কুলগুলি ছিল।

১৯৩৫ সালে জেথিবেন আন্তর্জাতিক ছাত্র সম্মেলন উপলক্ষে হল্যাণ্ডে যান। এই সম্মেলনে ভারতীয় যুবতী প্রতিনিধিদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বভার ছিল লাহোর কলেজের প্রিন্সিপ্যালের স্ত্রী মিসেস দত্তর উপর। কংগ্রেসের সমর্থন নিয়েই যখন বোম্বাই প্রেসিডেন্সী বিভাগ থেকে সিন্ধু আলাদা হয়ে যায়, তখন ১৯৩৭ সালে প্রথম সিন্ধু বিধানসভা নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে তিনি কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ সালে অর্থাৎ পরের বছর তিনি বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তাঁকে যথাক্রমে ১৯৩০ সালে, ১৯৩৩ সালে, ১৯৪২ সালে তিনবার কারাবরণ করতে হয়।

তিনি তিনবার, যথাক্রমে ১৯৩৫ সালে, ১৯৫৯ সালে এবং ১৯৬২ সালে বিদেশে যান। ১৯৩৫ সালে হল্যাণ্ডে এবং আমেরিকায় যান আন্ত-

র্জাতিক ছাত্র সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি হয়ে। ১৯৫৯ সালে ইল্যাণ্ডে কমনওয়েলথ্-এ যান। ১৯৬২ সালে তিনি নিজেই জাপান পরিভ্রমণ করতে যান। সিন্ধির বেশীর ভাগ হিন্দুরা জেথিবেনকে পছন্দ করতো; তিনি ছেলেবেলা থেকেই শিখদের ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর উপর ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব পড়ে এবং ব্রহ্ম একম্ এই ধর্মমত দ্বারা প্রভাবিত হন। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল অর্থাৎ আঠারো বছর জেথিবেন ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। ১৯৪৭ সালের পর তিনি আর দাঁড় টানতে পারলেন না।

এরপর তিনি সামাজিক কাজের দিকে মনোনিবেশ করলেন। বোম্বাইতে সিন্ধিদের মধ্যে যে বড় সমস্যা ছিল তা হোলো বাসস্থানের সমস্যা। —জেথিবেন ৩,৯৬,০০,০০০ টাকা খরচ করে ১৮৬০টি বাড়ী তৈরী করলেন যেখানে ১২,০০০ লোকের বাসের স্থান করা যায়। নবজীবন কো-অপারেটিভ-হাউসিং সোসাইটির তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। নবজীবন হাউসিং কলোনী এশিয়ার সবচেয়ে উন্নত আবাসন, যেখানে পার্ক, জনমঞ্চ, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডাকঘর, মন্দির, ব্যাংক সবই আছে।

বর্তমানে জেথিবেন-এর বয়স আশি বছরের ঊর্ধে। এখনও তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী, সমাজসেবা করছেন। পণপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদের কণ্ঠ তুলছেন। জীবনে একটাই আদর্শ নিয়ে চলেছেন, ভালবাসাই সেবা। কারীগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্বাস ছিল কারীগরি বিদ্যায় উন্নতি না করতে পারলে আমাদের দেশের শিশুরা ভবিষ্যতে বিশ্বের দরজায় দাঁড়াতে পারবে না। ভাষাগত বিরোধ, সংকীর্ণ মনোবৃত্তি, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি কারণে বিরোধ বাধানোকে তিনি অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং অন্যায় বলে মনে করতেন।

তাঁর মতে দেশ একটাই অর্থাৎ ভারতবর্ষ এবং আমরা সবাই ভারতবাসী। যেখানেই তিনি ভারতের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িক কলহের সংবাদ পেতেন তার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন এবং সম্ভব হোলে সরাসরি প্রতিবাদ করেছেন। জেথিবেনের স্বভাব ছিল নম্র, পরিধানে সাদাসিধে পোষাক। মেলামেশায়, আচরণে, কথাবার্তা, চিন্তায় এবং কাজে তিনি ছিলেন সংগ্রামী। চার দশকের বেশী তিনি সক্রিয় কর্মজীবন কাটান। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল, তিনি স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন। ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তিনি বোম্বাইতে মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য বাসস্থান তৈরী

করে নিজের চেষ্টায় প্রায় দু'হাজার পরিবার সম্বলিত ১২,০০০ মানুষের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে যে সমস্ত নাম উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত আছে, তার মধ্যে কুমারী জেথিবেন সিপাহীমালিনী একজন, যিনি ভারতের মাটিকে ভালবেসেছেন, নিজেকে উৎসর্গ করেছেন দেশের অগণিত মানুষের জন্য। রাজনৈতিক কর্মধারার পাশাপাশি সমাজ-সংস্কার ও সমাজ সেবামূলক কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন এই মহিয়সী। ইতিহাসের পাতায় তাই তিনি বেঁচে থাকবেন স্মরণীয় একটি নাম হয়ে।

জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

(১৮৮৯—১৯৪৫)

ঊনবিংশ শতাব্দী ইতিহাসের পাতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং সুশৃঙ্খলভাবেই। এ শতাব্দীর শেষের দশকগুলিতে ভারতের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতমাতার শৃঙ্খলমুক্তির গান। এসুরে সুর মিলিয়েছিল ভারতের প্রতিপ্রান্তের অগণিত মানুষজন। এগিয়ে এসেছিল আবাল বৃদ্ধ বণিতা। একজন শিক্ষাবিদ্ হিসাবে জ্যোতির্ময়ী দেবী কিন্তু শুধুমাত্র রুটিনমাফিক কাজের মধ্যে নিজেকে বন্দী করে না রেখে দেশমাতৃকার মুখে হাসি ফোটাবার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন নিজের অমূল্যজীবন।

জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী জন্মেছিলেন ১৮৮৯ সালের ২৫শে জানুয়ারী। কলকাতার এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্ম) পরিবারে। তিনি ছিলেন উপযুক্ত পিতার সৌভাগ্যময়ী সন্তান। তাঁর পিতা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ছিলেন একজন দেশকর্মী, সাংবাদিক এবং সমাজসেবক, মাতা কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা মেডিকেল গ্রাজুয়েট (১৮৮৩)। তিনি শুধু ডাক্তারই ছিলেন না, একজন রাজনৈতিক কর্মী এবং সমাজসেবিকাও ছিলেন। জ্যোতির্ময়ী দেবীর ভ্রাতা প্রভাতচন্দ্র ছিলেন একজন সাংবাদিক এবং কংগ্রেসকর্মী। জ্যোতির্ময়ী তাঁর পিতামাতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন আদর্শশিক্ষা এবং জীবনে এগিয়ে চলার পথের প্রেরণা। তিনি সারাজীবন দেশের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন।

শৈশব এবং কিশোর বয়সে 'তিনি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়' থেকে শিক্ষালাভ করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের পর কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে বি. এ. (স্নাতক) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন বিষয়ের উপর এম. এ. পাশ করেন। ১৯০৮ সালে এম. এ. পাশ করবার পর তিনি শিক্ষকতার কাজ আরম্ভ করেন। ১৯০৯ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত যথাক্রমে, 'বেথুন স্কুল', 'কটক র‍্যাভেনস গার্লস কলেজ'

'কলম্বো গালর্স কলেজ' প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষকতার কাজে যুক্ত থাকেন। ১৯২০ সালে তিনি 'জালন্ধর কন্যা মহাবিদ্যালয়ের', ১৯২৫ সালের কলকাতা ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের, ১৯২৬ সালে 'বিদ্যাসাগর বাণী ভবন', ১৯২৯ সালে 'কলম্বো বুদ্ধিষ্ট কলেজ প্রভৃতি নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষরূপে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের কাজে নিযুক্ত রাখেন নিজেকে। পরবর্তী জীবনে শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে দিলেও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের চেতনার উন্মেষ ঘটানোর জন্যই তিনি শিক্ষকতার পেশাকে বেছে নিয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর কাজের ক্ষেত্র যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তৃত ছিল। সক্রিয়ভাবে তার রজেনৈতিক জীবন শুরু হয় ১৯২০-২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে। ১৯২০ সালে কংগ্রেসের একজন সদস্য হিসাবে তাঁকে বাংলার বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করতে হোতো। এই সময়ই তিনি নারী সেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠন করলেন; বাংলার নারীরা এই প্রথম ঘরের বাইরে প্রকাশ্যে বেরিয়ে এসেছিলেন সংঘবদ্ধভাবে।

১৯২০ সালে কলকাতার কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে তাঁর অধিনায়কত্বে মহিলারা সংঘবদ্ধভাবে যেভাবে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন তা সকলকে বিস্মিত করেছিল। এমনকি লালা লাজপত রাও তা দেখে গভীরভাবে অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর পারদর্শিতার জন্য দেশবন্ধু তাঁকে কর্পোরেশন প্রাইমারী এডুকেশন কমিটির সহায়ক সদস্যরূপে গ্রহণ করেন। এরপর জ্যোতির্ময়ীদেবী জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাবার এবং কংগ্রেসের আদর্শ প্রচার করবার জন্য বহু সভা-সমিতি, যুব সম্মেলন, জেলা সম্মেলন পরিচালনার কাজে দায়িত্ব নিয়ে দক্ষতার সঙ্গে সে কাজকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এভাবে ক্রমশঃ বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যধারার সঙ্গে যুক্ত হতে লাগলেন তিনি। জ্যোতির্ময়ী দেবী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ১৯৩০ সালের ১৩ই মে 'মহিলা সত্যাগ্রহ কমিটির' সহসভাপতি নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করেন। ১৯৩০ সালে ২৫-শে জুন তারিখে মহিলা সত্যাগ্রহীদের একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা করবার সময় তিনি গ্রেপ্তার হন. এর ফলে তাঁকে ছয়মাসের জন্য কারাবরণ করতে হয়। ১৯৩১-৩২ সালে তিনি স্বতন্ত্রভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং পুন-

রায় হন, গ্রেপ্তার এ আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল মুখ্য ; শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে সভা-সমিতিতে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিয়ে সর্বসাধারণকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, এ আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়াও পেয়েছিলেন তিনি।

কারামুক্তির পর, ১৯৩৩ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলনেও তাঁর ভূমিকা ছিল ; এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তিনি গ্রেপ্তার হন। ছাত্রদের তিনি ছিলেন বন্ধু ছাত্রদের বিভিন্ন আন্দোলনে তিনি ছিলেন তাঁদের সাথী। ১৯৪৫ সালের ২১শে নভেম্বর 'আজাদ-হিন্দ-ফৌজ-'এর মোকদ্দমার সময় কলকাতার ছাত্ররা দলবদ্ধভাবে বন্দীদের মুক্তির জন্য শোভাযাত্রা করেছিলেন। ছাত্রদের শোভাযাত্রার গন্তব্যস্থল ছিল ডালহাউসি স্কোয়ার। সেটা ছিল সংরক্ষিত এলাকা। ধর্মতলাতেই তাঁরা পুলিসের কাছ থেকে বাধা পান।

ছাত্ররা এগিয়ে যেতে দৃঢ়সংকল্প ; পুলিস গুলি ছুঁড়তে থাকে। ছাত্ররাও পুলিসের গুলির সামনে বুক পেতে দাঁড়ালেন। নিহত হলেন ছাত্র রামেশ্বর বন্দোপাধ্যায় ; আহতের সংখ্যাও অনেক, তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হোলো। রাত প্রায় বারোটা,—ব্যক্তিত্ব সম্পন্না জ্যোতির্ময়ী দেবী সশস্ত্র পুলিশের ব্যূহ ভেদ ক'রে দাঁড়ালেন ধর্মতলায় ছাত্রদের মাঝখানে। কম্পিত কণ্ঠে ছাত্রদের সম্বোধন করে বললেন—'তোমাদের মৃত এবং আহত বন্ধুদের দেখে আমি হাসপাতাল থেকে আসছি। বাংলার ছাত্র, তোমরা অসীম বীরত্ব দেখিয়েছ, পুলিসের গুলি তোমাদের ভয় দেখাতে পারেনি, পারেনি ছত্রভঙ্গ করতে, তোমরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছ, দিয়েছ ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের চ্যালেঞ্জের উত্তর। সমস্ত দেশের আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছে তোমাদের মাথায়।''

সারারাত্রি তিনি কাটালেন ছাত্রদের পাশে। দ্বিতীয় দিনে দ্বিগুণ ছাত্র এসে যোগ দিলেন ধর্মতলার ছাত্রদের সঙ্গে। তাঁদের সংকল্প দেখে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আরো [illegible] [illegible] হোলো, আরো গুলি [illegible] হলো, আরো রক্ত বয়ে গেল ছাত্রদের বুক থেকে, অনেক রক্তের বিনিময়ে সেদিন বিজয়ী বীর ছাত্ররা ডালহাউসি স্কোয়ারে যাবার দাবী আদায় করেছিলেন। ছাত্রদের বিদ্রোহের কাছে ব্রিটিশ সিংহেরও মাথা নত করতে হয়েছিল সেদিন, দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২২শে নভেম্বর জ্যোতির্ময়ী

গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে ছাত্ররা শহীদ রামেশ্বরের শবদেহ বহন করে শোভাযাত্রা করে নিয়ে চলছিলেন শশ্মানের দিকে ; পথে মিলিটারীর একটা ট্রাক পশ্চাৎ থেকে এসে জ্যোতির্ময়ী দেবীর মোটরে ধাক্কা দিল। এই দুর্ঘটনা ঘটে গেল নিমেষের মধ্যেই। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিলেন।

ছাত্র আন্দোলনের পুরোধা এই নারীকে সেদিন হারালো অগণিত ছাত্ররা। রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি একজন সাধারণ সমাজসেবী হিসাবে জ্যোতিময়ী দেবী তাঁর সমাজসেবা কাজে দক্ষতা দেখিয়েছেন। 'হিরন্ময়ী বিধবা শিল্পাশ্রম' 'পুরী বসন্তকুমারী বিধবা আশ্রম', 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' প্রভৃতি বিভিন্ন নারী সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি ছাত্রদের জন্য একটি সমাজ-সেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিণী এই নারী তদানীন্তন মুখপত্র 'মডার্ন রিভিউ' এবং 'প্রবাসী' তো শিক্ষা, রাজনৈতিক তদন্ত, সামাজিক সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রচুর প্রবন্ধ লেখেন।

ব্রিটিশ শাসকের বিরোধী হয়েও, পাশ্চাত্য শিক্ষায় এবং ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন তিনি। সেই কারণেই আমাদের দেশের চিরন্তন সামাজিক কুসংস্কার, অস্পৃশ্যতা, নারীদের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। বিধবা বিবাহের সপক্ষে তাঁর কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে। মহিলাদের মধ্যে কুটীরশিল্পের কাজের প্রসারে তিনি মহিলা সংগঠনের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। Aryasthan Ins-surance Company-র প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন।

একজন শিক্ষাবিদ্ এবং সমাজসেবী হয়েও জ্যোতির্ময়ী দেবী ছিলেন দেশপ্রেমিক, যিনি ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে গিয়েছেন মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। বাংলার, শহর থেকে শুরু করে সুদূর গ্রামের মহিলাদের কাছে তিনি শুধু একজন লেখিকা এবং সুবক্তা নন, তিনি ছিলেন তাঁদের সর্বক্ষণের দৈনন্দিন জীবনের সাথী। আজকের যুব সম্প্রদায়ের কাছে আমরা তাঁর স্মরণে একফোঁটা চোখের জল কি আশা করতে পারি না, সঙ্গে তাঁর প্রদর্শিত সাহসের কিছুটা পরিচয়কে পাথেয় করে এখনও সমাজের অভ্যন্তরে দানাবাঁধা কুসংস্কার ও বিভিন্ন দুর্নীতিকে কঠোরহস্তে মোকাবিলা করবার কিছু প্রচেষ্টাকে কার্যকরী রূপ দিতে ?

দুর্গাবাঈ দেশমুখ

(১৯০৯—   )

দুর্গাবাঈ দেশমুখ ১৯০৯ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজমুনড্রিতে ১৫ই জুলাই এক হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অল্প বয়সেই তাঁর বাবা মারা যান এবং সেই কারণে অল্প বয়স থেকেই তাঁকে পরিবারের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। তাঁদের গৃহে ছেলেবেলা থেকেই তিনি দেখেছেন জাতীয়বাদের পরিবেশ, তাঁর মা ছিলেন জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী। এই কারণেই ছেলেবেলা থেকে দুর্গাবাই-এর মনের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রবেশ করতে দেখা গিয়েছে। এর ফলে ধীরে ধীরে তিনি রাজনৈতিক কর্মধারার প্রতি অতিরিক্তভাবে আগ্রহী হয়ে পড়েন। যদিও তাঁদের পরিবারে জাতীয়তাবাদের পরিবেশ ছিল, কিন্তু মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে এ পরিবারটি ছিল অত্যন্ত গোড়া। ছেলেবেলা থেকেই দুর্গাবাঈ-এর মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা ছিল, তাই গোঁড়া পরিবারের হয়েও তিনি গৃহশিক্ষকের কাছে এবং প্রতিবেশী শিক্ষকের কাছে পড়াশুনা শিখেছেন, হিন্দিভাষা শিখেছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁর মায়ের দান ছিল অনেক।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম-দ্বিতীয় দশক থেকেই ভারতের জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের সূচনা হয়ে গিয়েছিল বেশ ভালভাবেই, ভারতের আকাশে-বাতাসে তখন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামের সোচ্চার ধ্বনি। সারা ভারত জুড়ে কংগ্রেসের নেতারা জাতীয় কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এ সময় সারা ভারতে হিন্দি ভাষার ব্যাপক ব্যবহার ছিল। দুর্গাবাঈও এ আন্দোলনের কাজে এগিয়ে এলেন, ইতিমধ্যে তিনি গৃহশিক্ষকের কাছে হিন্দিভাষা শিখে নিলেন। খুব শীঘ্রই তিনি এই ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে ১৯২৩ সালে বালিকাদের জন্য একটি হিন্দি বিদ্যালয় শুরু করেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁর এই একাগ্র প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করে তাঁকে একটা

স্বর্ণপদক উপহার দেন। এই একই সময়ে তিনি খাদি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে শুরু করলেন। এই আন্দোলনই তাঁকে স্বাধীনতা-আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার কাজের দিকে নিয়ে যায়।

এই বছরগুলিতে রাজনৈতিক কর্মধারায় তিনি কাজ করতে গিয়ে বি. শ্যমবামূর্তি, বি. সুব্রাহমানিয়ম্ প্রমুখ ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পান। লবণ সত্যাগ্রহে অন্ধ্রপ্রদেশের অংশগ্রহণকারী প্রথম মহিলা নেতৃত্ব হিসাবে তাঁর অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ এবং নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তিনি ১৯৩০ সালে গ্রেপ্তার হন। এর ফলে, তিন বছরের জন্য তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। যখন তিনি জেল থেকে বেরোলেন, তখন তাঁর মধ্যে আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো। জেলে বসে তিনি ইংরেজী শিখেছিলেন, ইংরেজী শেখবার পরই তাঁর মনে হোলো অতীত জীবনের কথা, যখন তিনি পড়াশুনা করতে পারেন নি। আর সেই কারণেই ডিগ্রীলাভের জন্য তিনি ত্রিশ বছর বয়সে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালায়ে ভর্তি হলেন। একজন মেধাবী ছাত্রীর পরিচয় দিয়ে তিনি এম. এ. পরীক্ষায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সংবিধানের ইতিহাস-এ ডিস্টিংশন পেয়ে পাঁচটি মেডেল সহযোগে এম. এ. পাশ করলেন।

১৯৪২ সালে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পরীক্ষায় পাশ করে মাদ্রাজে কিছুদিন আইন ব্যবসা প্রাক্‌টিস করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি বিধানসভায় নির্বাচিত হন এবং বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটিতে দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকে কাজ করেন। ১৯৫২ সালে সি. ডি. দেশমুখের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯৫৮ সালে তিনি ন্যাশনাল কমিটি অন্ ওম্যান্স্ এডুকেশন-এর দায়িত্বভার নেন। বর্তমানে তিনি ইণ্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল সেণ্টার, নয়া দিল্লীর দ্বারা স্থাপিত কাউন্সিল ফর ডেভেলপ্‌মেণ্টের ডাইরেক্টর পদে আছেন।

মহিলাদের কল্যাণের জন্য দুর্গাবাঈ যে পরিমাণ সেবা ও পরিশ্রম দিয়েছেন, সত্যই অতুলনীয় সম্পদ। তিনি সমাজের পতিতা এবং অনাথা নারীদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন। মাদ্রাজে অন্ধ্র ওম্যানস্ এ্যাসোশিয়েশনের তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা। মাদ্রাজের অন্ধ্র মহিলা সভা এবং হায়দ্রাবাদ সংগঠনের শাখার তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা, অন্ধ্র মহিলা নার্সিং হোম, স্কুল, নার্স এবং মহিলা শিক্ষিকাদের জন্য ট্রেনিং সেন্টার কোর্স কলেজ এবং অন্যান্য

পেশামূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবার দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর এবং এ দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছিলেন। সর্বভারতীয় নার্সিং কাউন্সিল এবং রেড ক্রশ সোসাইটির তিনি সদস্যা ছিলেন। প্রকাশনা বিভাগের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি পদে তিনি কিছুদিন কাজ করেন। এ প্রকাশনায় থাকাকালীন তাঁরই উদ্যোগে ভারতের সমাজ কল্যাণ (Social Welfare of India) এবং 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব সোস্যাল ওয়াৰ্ক ইন ইণ্ডিয়া' প্ল্যানিং কমিশনের দ্বারা প্রকাশিত হয়। সাদাসিধা, সহজ খদ্দরের পোষাক পরিধানে ব্যক্তিত্বপূর্ণ দুর্গাবাঈ ছিলেন তেলেগু এবং ইংরেজী ভাষায় একজন সুবক্তা। তাঁর কর্মধারা তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে চিরদিন।

ননীবালা দেবী

(১৮৮৭—১৯৬৭)

ভারতমাতার শৃঙ্খলমুক্তির কাজে স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সকল মহিলা আত্মোৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনকে মনে করা বোধহয় আমাদের একান্ত প্রয়োজন। তিনি হলেন বাংলাদেশের একমাত্র মহিলা রাজ্য রাজনৈতিক বন্দী (State Prisoner) ননীবালা দেবী। ১৮৮৮ সালে হাওড়া জেলার বালীতে এক নিম্নমধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে ননীবালা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সূর্যকান্ত ব্যানার্জী এবং মাতা গিরিবালা দেবী। শৈশবে তাঁকে গৃহে শিক্ষালাভ করতে হয়; প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত তিনি শিক্ষালাভ করেন। তখনকার সামাজিক রীতি অনুযায়ী মাত্র এগারো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের পাঁচ বছর পরেই মাত্র ষোলো বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। বিধবা হবার পর তিনি পিত্রালয়ে ফিরে আসেন এবং আবার পড়াশুনা শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যে একজন বিদেশী প্রতিবেশী তাঁকে গঙ্গার ধারে আড়িয়াদহে খৃস্টান মিশনের সন্ধান দিলে, তিনি সেখানে ইংরেজী শিক্ষালাভ করতে থাকেন। কিন্তু সেখান থেকেও বিশেষ কোনো কারণে তাঁকে ঐস্থান পরিত্যাগ করতে হোলো।

এরপর তিনি তাঁর এক দূরসম্পর্কের ভ্রাতুষ্পুত্র অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আশ্রয় পান। অমরেন্দ্রনাথ ছিলেন তদানীন্তন বিপ্লবী 'যুগান্তর' দলের একজন সক্রিয় কর্মী। এই অমরেন্দ্রনাথের কাছেই ননীবালা বিপ্লবের দীক্ষা পান। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, ভারতের এই 'যুগান্তর' দলের বিপ্লবীরা ভারতের শৃঙ্খল মোচনের জন্য তৎপর হয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে তাঁরা জার্মানীর কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভারতব্যাপী একটা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে, স্বাধীনতা আনবার জন্য একটি রাস্তা করেছিলেন। ইংরেজ, ভারত-জার্মান

ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারল। তারা ভারতবাসীর উপর আঘাত হানবার চেষ্টাও করল। বালেশ্বর খণ্ডযুদ্ধ তার নিদর্শন।

এই যুদ্ধে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর আত্মদান ভারতবাসীকে দেশের জন্য আত্মবলিদানের পথ প্রশস্ত করে দেবার রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে গেল। ইংরেজের রক্তচক্ষু তখন জ্বলছিল; ভারতবাসী কিন্তু এতে দমল না। বিপ্লবীরা যদুগোপাল মুখার্জীর নেতৃত্বে পূর্ব ভারতের পথ ধরে চীন, শ্যাম ও আসামের ভিতর দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র আনিয়ে ভারতে বিদ্রোহ ঘটাবার প্রচেষ্টা করে যেতে লাগলেন, ইংরেজের রক্তচক্ষু গ্রাহ্য না করেই। ইংরেজও তার অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে লাগল। ভারতের প্রতিটি প্রান্তে, বিশেষ করে বাংলায় তখন চলছে ব্রিটিশ শক্তির প্রচণ্ড আক্রমণ ও নির্মম অত্যাচার। এই অত্যাচারের রূপ ছিল,—ফাঁসী, দ্বীপান্তর, পুলিশের নির্যাতনে পাগল হয়ে যাওয়া, দালান্দা হাউসে গিয়ে চার্লস টেগার্টের তদারকীতে বীভৎস নিপীড়ন। মলদ্বারে রুল ঢোকানো, কমোড থেকে মলমূত্র এনে মাথায় ঢেলে দেওয়া, কয়েক দিন উপবাসে রেখে তারপর পিছনে হাতকড়া দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে লাথি ও রুলের প্রহার—এই ছিল টেগার্টের অত্যাচারের রীতি। এ সমস্ত অত্যাচার বিপ্লবীরা সইতেন।

বিপ্লবীদের দ্বারা পরিচালিত ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ননীবালা দেবীও যুক্ত হয়ে পড়লেন। রিষড়াতে তিনি তাঁর কাছে বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতে লাগলেন এবং আরও বিভিন্ন ধরনের কাজে তাঁদের সাহায্য করতে লাগলেন। ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের খবর পুলিশকে খুব চঞ্চল করে তুলল; তারা বিভিন্ন স্থানে তল্লাসী করতে লাগল। ১৯২৫ সালের আগষ্ট মাসে পুলিশ কলকাতার 'শ্রমজীবী সমবায়' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের গুপ্ত খবর পেয়ে তল্লাসী চালাতে লাগল। এই সময় অমর চ্যাটার্জী পলাতক হয়ে যান, কিন্তু রামচন্দ্র মজুমদারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে; তাঁকে তিন নম্বর রেগুলেশনে রাজ্য রাজনৈতিক বন্দী (State Prisoner) হিসাবে রাখা হোলো। গ্রেপ্তারের সময় রামচন্দ্র মজুমদার একটা 'মসার' (Mauser) পিস্তল কোথায় রেখে গিয়েছিলেন তা দলের কাউকে জানিয়ে যেতে পারলেন না। সেইজন্য বিধবা ননীবালা দেবী তাঁর স্ত্রী সেজে, তাঁর সঙ্গে জেলে গিয়ে ইন্‌টারভিউ নিয়ে জেনে এলেন পিস্তলের গুপ্ত খবর।

রামচন্দ্র মজুমদার তখন ছিলেন প্রেসিডেন্সি জেলে। সে যুগে

নারীদের যেখানে পর্দানশীন থাকতে হোতো, সেখানে একজন বিধবাকে অপরের স্ত্রী সেজে প্রেসিডেন্সী জেলের মতো সশস্ত্র পাহারার এই জেলের পুলিশের শ্যেনদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কাজ হাসিল করবার চিন্তা বোধহয় কোনো মহিলা তো দূরে থাক্, কোনো পুরুষের কাছেও ছিল কল্পনার অতীত। এমনকি পুলিসও সেদিন এব্যাপারে এতটুকু ধরতে পারেনি। কিছুদিন পরে অবশ্য পুলিস জেনেছিল ননীবালা দেবী রামবাবুর স্ত্রী নন। ১৯১৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ননীবালা দেবী এলেন চন্দননগরে, কারণ চন্দননগরে যে বাড়ীতে গৃহকর্ত্রী হয়ে ননীবালা দেবী ভাড়া থাকতেন সেখানে বিপ্লবী নেতারা পলাতক হয়েছিলেন; এঁদের মধ্যে ছিলেন, যদুগোপাল মুখার্জী, অমর চ্যাটার্জী, অতুল ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এদের সকলেরই মাথার দাম ছিল বেশ কয়েক হাজার টাকা। সারাদিন এঁরা দরজা বন্ধ করে থাকতেন; রাত্রে সুবিধামত বেড়োতেন। পুলিস কিন্তু এঁদের পিছনে সব সময়ই লেগে থাকতো। তাই পুলিসের সাড়া পেলে তাঁরাও অদৃশ্য হয়ে যেতেন।

এইভাবে বিপ্লবীদের পিছনে ছুটে ছুটে হয়রান হয়ে যেতে লাগল পুলিস; চন্দননগরের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বাড়ীতে পুলিসের তল্লাসী চলতে লাগল। ননীবালা দেবী যে বিপ্লবীদের আশ্রয়দাত্রী এবং এঁদের সঙ্গে যুক্ত এখবর পেতে পুলিসের খুব একটা সময় লাগল না। তাই তাদের দৃষ্টি পড়ল ননীবালা দেবীর উপরও। পুলিস তৎপর হয়ে উঠল তাঁকে গ্রেপ্তার করবার জন্য। এ অবস্থায় ননীবালা দেবীর চন্দননগরে থাকা নিরাপদ হোলো না, সেই কারণে তিনিও পলাতক হলেন। এই সময় তাঁর এক বাল্যবন্ধুর দাদা প্রবোধ মিত্র, কর্মোপলক্ষে পেশোয়ার যাচ্ছিলেন। তাঁকে রাজী করিয়ে ননীবালা দেবী তাঁর সঙ্গে গেলেন। প্রায় যোলো-সতেরো দিন পরে পুলিস সেখানকারও সন্ধান পেলো, তারা পেশোয়ার ছুটল।

পুলিস যখন ননীবালা দেবীকে গ্রেপ্তার করবার জন্য পোশেয়ার গিয়ে তাঁর বাসস্থানে পৌঁছালো, তখন তিনি কলেরার রুগী, বিছানায়। এই অবস্থাতেই পুলিস তাঁকে স্ট্রেচারে করে পুলিস হাজতে নিয়ে এলো। হাজতে কয়েক দিন রাখবার পর তাঁকে কাশীর জেলে চালান দেওয়া হোলো। এর মধ্যে তিনি প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন; কাশীতে আনবার পর তাঁর উপর চলল জেরা, সঙ্গে অত্যাচার, প্রতিদিন তাঁকে কাশীর সেই সময়কার পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট জিতেন ব্যানার্জীর কাছে আনা

হোতো জেল-গেটের অফিসে। সেখানে চলত জেরার পর জেরা, সঙ্গে অশালীন গালাগাল ; কোনো রকমেই যখন পুলিস ননীবালা দেবীর মুখ খুলতে পারল না, তখন তাঁকে আদেশ দেওয়া হোলো চরম অত্যাচারের। জেলের জমাদারনীকে দিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হোলো আলাদা সেলে, সেখানে তাঁকে জোর করে উলঙ্গ ক'রে লংকাবাটা শরীরের অভ্যন্তরে দিয়ে দেওয়া হোলো। এত নিষ্ঠুরতার পরও যখন তাঁর কাছ থেকে বিপ্লবীদের কোনো গুপ্ত খবর বের করা গেলো না তখন তাঁকে নিয়ে যাওয়া হোলো পানিশমেণ্ট সেলে অর্থাৎ 'শাস্তি কুঠরিতে' ;

এ কুঠুরির ব্যবস্থা এরকম ছিল যে তাতে একটিমাত্র দরজা ছিল, আলো-বাতাস প্রবেশ করবার জন্য অন্য কোনো জানালা বা ছিদ্র ছিল না। ননীবালা দেবীকে ঐ আলো-বাতাসহীন অন্ধকার সেলে তিন দিন প্রায় আধ ঘণ্টা সময় ধরে আটকে রাখা হোলো। তৃতীয় দিনে বন্ধ ক'রে রাখা হোলো প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ; স্নায়ুর শক্তিকে চূর্ণ করে দেবার এই ছিল চূড়ান্ত প্রচেষ্টা। সেদিন যখন পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে সেই ঘরের দরজা খুলে দেওয়া হোলো, তখন দেখা গেলো তিনি জ্ঞানশূন্য অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন। এই চরম অত্যাচারের পরও যখন তাঁর মুখ থেকে কথা বার করা গেলো না। তখন তাঁকে কাশী থেকে নিয়ে আসা হোলো কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে। এখানে এসে ননীবালা দেবী খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। জেল কর্তৃপক্ষ, এমনকি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও তাঁকে অনুরোধ করে খাওয়াতে পারলেন না। আই. বিঃ পুলিসের স্পেশাল সুপারিনটেনডেণ্ট গোল্ডি তাঁকে প্রতিদিন জেরা করতেন। গোল্ডি জানতে চাইলেন কি করলে তিনি খাবেন ; উত্তরে ননীবালা দেবী জানালেন, যদি তাঁকে বাগবাজারে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্ত্রীর কাছে রেখে দেয়, তাহলে খাবেন। এ ব্যাপারে তাঁকে দরখাস্ত লিখে দিতে বলায় তিনি দরখাস্ত লিখে দিলেন। গোল্ডি সে দরখাস্ত ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে ছেঁড়া কাগজের টুকরীতে ফেলে দিলেন। এ'তে ননীবালা দেবী বারুদের মতো জ্বলে উঠলেন, বাঘের মতো এক চড় বসিয়ে দিলেন গোল্ডির মুখে। বললেন,—ছিঁড়ে ফেলবে তো, আমায় দরখাস্ত লিখতে বলেছিলে কেন, আমাদের দেশের মানুষের কি কোনো মান-সম্মান নেই।

এ ঘটনার পর তাঁকে ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনে স্টেট প্রিজনার ক'রে রেখে দেওয়া হলো প্রেসিডেন্সী জেলেতেই। জেলের মধ্যে এভাবে অনশনের মধ্য দিয়ে চলছে তাঁর। একদিন সিউড়ির

দু'কড়িবালা দেবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হোলো। দু'কড়িবালা দেবীর সিউড়ির বাড়ীতে সাতটা মসার (Mauser) পিস্তল পাবার অপরাধে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে। এই অপরাধে তাঁকে দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত ক'রে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী ক'রে রাখা হয়, কারায় প্রচণ্ড পরিশ্রম করানো হোতো তাঁকে। ননীবালা দেবীর ঊনিশ-কুড়ি দিন চলছে ; ম্যাজিস্ট্রেট এলেন অনুরোধ করতে। এবার ননীবালা দেবী প্রস্তাব দিলেন ব্রাহ্মণকন্যা দু'কড়িবালা দেবী যদি তাঁকে রেঁধে দেয় তবে তিনি খাবেন ; সঙ্গে দু'জন ঝি চাই,

ম্যাজিস্ট্রেট বাধ্য হয়েই মেনে নিলেন এ প্রস্তাব। একুশ দিনের দিন এই দৃঢ়চেতা বন্দিনী ভাত খেলেন ; দুই বছর বন্দীজীবন কাটাবার পর ১৯১৯ সালে তাঁর মুক্তির আদেশ হোলো। জেল থেকে মুক্তি পেলেন তিনি, কিন্তু মাথা গোঁজবার ঠাঁই পেলেন না এই বীর নারী। পুলিসের ভয়ে কেউ তাঁকে আশ্রয় দিতে রাজী হোলো না। তাঁর বাবা কলকাতায় একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া করে দিলেন ; এখানে তিনি কাটিয়েছেন দীর্ঘ কয়েক বছর দারিদ্র্যতার লড়াই করে। শরীর ভেঙে পড়ে, টিউবারকিউলিসিস্ রোগে আক্রান্ত হন তিনি। ফলে মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবার মানসিক ইচ্ছা থাকলেও সামর্থ্য ছিল না তাঁর। দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁকে ঘিরে ধরে, টেনে নিয়ে চলে মৃত্যুর দিকে। অবশ্য পরে এক সাধুর সাহায্যে তিনি রোগমুক্ত হন।

১৯৫০ সালে সরকার কর্তৃক যখন রাজনৈতিক বন্দীদের অবসরভাতা (Political Pension) দেবার ব্যবস্থা করা হয়, তখন তাঁকেও সরকার পক্ষ থেকে অবসর ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ১৯৬৭ সালের মে মাসে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভারতবাসীর জন্য যে নারী তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন, যৌবনকে করেছিলেন জরাজীর্ণ, আজ কি ভারতবাসীর তাঁর জন্য এক ফোঁটা চোখের জলও তোলা নেই ?

নেলী সেনগুপ্তা

(১৮৮৬—১৯৭৩)

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতের আকাশে বাতাসে একটিই ধ্বনি ধ্বনিত হয়েছিল, 'স্বাধীনতা চাই'। ভারতের মাটিতে জন্ম নিয়েছিলেন বহু স্বদেশপ্রেমিক; তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টা এনে দিয়েছিল শৃঙ্খলিত ভারতের মুক্তি, স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন, তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন একজন বিদেশী মহিলা যিনি ভারতের মাটিকে ভালবেসেছিলেন, জন্মসূত্রে নয়, বিবাহসূত্রে, এই মহিয়সী নারী হলেন, শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সহধর্মিনী।

কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটি শহরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবার, মিষ্টার এবং মিসেস গ্রের একমাত্র সন্তান মিস এডিস এলেন গ্রে—ডাক নাম নেলী। জন্মেছিলেন ১২-ই জানুয়ারী ১৮৮৬ সালে। ছেলেবেলায় নেলী বাবার সান্নিধ্য পেয়েছিলেন একান্তভাবে, মাকে পেয়েছিলেন বন্ধুভাবে। তাঁর পাঠ্যজীবনের পরিধি খুব বেশী ছিল না, সিনিয়র কেম্ব্রিজ পর্যন্ত। ছেলেবেলায় একবার তাঁর সাংঘাতিক অসুখ হয়। সুস্থ হবার পর ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর বাবা তাঁকে আর পড়াশুনায় চাপ দিলেন না এবং সেইকারণেই সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করবার পর তাঁকে বাড়ীতেই পড়াতেন। বেছে বেছে হালকা বিষয়বস্তুর বই পড়তে দিতেন যেন পড়াশুনার চাপ না পড়ে।

যতীন্দ্রমোহন যখন স্বদেশ ছেড়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান তখন গ্রে পরিবারের সঙ্গে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন এবং নেলীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯০৯ সালে তাঁরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন এবং কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে যতীন্দ্র মোহন পেশাগত আইনজীবীর কাজ করতে থাকেন এবং একই সঙ্গে

দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে বৃটিশ মন্ত্রীসভা তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে দ্বৈতশাসন পদ্ধতির কথা ঘোষণা করলে ভারতবর্ষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মডারেট নেতাগণ দেশের প্রতি কৃতঘ্ন ব্যবহার করে জাতির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। ভারতের লোকমাণ্য নেতা তিলক মৃত। সমগ্র দেশ তখন চঞ্চল, এমনি সময়েই মহাত্মা গান্ধীর অভ্যুদয় ঘটল ভারতের মাটিতে।

অহিংস অসহযোগের পতাকা নিয়ে দেশবন্ধুর নির্দেশে দেশের কাজে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনও তাঁর প্রিয় জন্মভূমি চট্টল নগরীতে উপস্থিত হলেন. সঙ্গে সহধর্মিনী নেলী। কর্মকুশলা শ্রীমতী নেলীও স্বামীর কাজে সহায়ক হিসাবে সানন্দে দেশপ্রিয়র চট্টগ্রামের সংসার পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব তুলে নিলেন নিজের কাঁধে। বৃহৎ একান্নভুক্ত পরিবার। ননদ, দেবর, জা, নিকট আত্মীয় স্বজন এবং ভৃত্য মিলে সংখ্যায় প্রায় চল্লিশ। তাছাড়া কংগ্রেস কর্মীদের ভীড় তো লেগেই আছে বাড়ীতে। বিভিন্ন স্থান থেকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাগম রয়েছে সর্বদাই। বিভিন্ন সময়ে তাঁরা এসেছেন, অসহযোগ আন্দোলন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভাসমিতিতে অংশগ্রহণ করবার জন্য। সকলেই অতিথি যতীন্দ্রমোহনের গৃহে। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘট, ভারতের প্রথম 'রাজনৈতিক ধর্মঘট'—বলা বাহুল্য এই ধর্মঘট ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থন লাভ করেছিল। দেশপ্রিয়র সেদিনকার আইনভঙ্গ ও কারাবরণ, যা ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পরিকল্পিত সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স মুভমেন্ট কর্মসূচীর সর্বপ্রথম সফল রূপদান। যতীন্দ্রমোহনের এই কারাবরণ অসহযোগ আন্দোলন এবং রেলধর্মঘটকে অধিকতর শক্তিশালী করেছিল। ফলস্বরূপ, আইন অমান্য আন্দোলনকে জোরদার করবার জন্য জনসাধারণ বদ্ধপরিকর হোলো।

এমতাবস্থায় শ্রীমতী নেলী চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁর কি কর্তব্য ?—কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে কিন্তু বিলম্ব হোলো না। তিনি ঘোষণা করলেন—আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করবেন। ঘর ছেড়ে বাইরে আসবেন। হাটে বাজারে খদ্দর বিক্রয় করবেন। স্বদেশী প্রচারে ব্রতী হবেন। বিলিতী পণ্যের দোকানে পিকেটিং করবেন, মিছিল পরিচালিত করে শহরের প্রতিটি অঞ্চলে যাবেন। ছেলেমেয়েদের আহবান করবেন, দলে দলে কংগ্রেস সেবাদলে যোগদান করতে। গ্রাম

গ্রামান্তরে সংগ্রামী কংগ্রেসের অভয়বাণী ছড়িয়ে দিতে শ্রীমতী নেলী যে আহ্বান রেখেছিলেন, তাঁর সেই আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল অগণিত নর-নারী, তারা এসে তাঁর পাশে দাঁড়াল।

বিরাট মিছিল সংগঠিত করা হোলো—পুরোভাগে শ্রীমতী নেলী। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংরেজ দুহিতা শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তার আত্মপ্রকাশ পুরবাসীর বুকে নতুন উৎসাহ ও আশা জাগ্রত করল। শহরের শ্রেষ্ঠতম বাণিজ্যকেন্দ্র 'বক্সিহাট' অঞ্চলের দোকানীরা শ্রীমতী নেলীকে সাদরে অভিনন্দন জানালো, শপথ নিলো তারা বিলাতী পণ্য বিক্রয় করবে না। 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কম্পিত করে মিছিল এগিয়ে চলল, রাস্তার দু'ধারে ঘরবাড়ী থেকে রাশিরাশি বস্ত্র কংগ্রেস সেবক সেবিকাদের হাতে উঠিয়ে দিচ্ছেন মেয়েরা। স্থানে স্থানে ঐ বিলাতী বস্ত্রে অগ্নিসংযোগের উৎসব অনুষ্ঠিত হতে লাগল।

শ্রীমতী নেলীর উপর ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা জারী হোলো। সরকারী এই আচরণের তীব্র নিন্দা করে এবং প্রতিবাদ জানিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট এফ ডাবলু স্ট্রং (F. W. Strong) কে পত্র লিখলেন নেলী। ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশে এবং তাঁর সাক্ষাৎ পরিচালনায় বে-আইনী কাজ সংগঠিত হয়েছে, এ অভিযোগ জানালেন শ্রীমতী নেলী। এমন কি স্ট্রং-কে ইংরেজ জাতির কলঙ্ক বলে অভিহিত করলেন। ১৪৪ ধারা সম্বন্ধেও তিনি অভিযোগ করে লিখলেন—

"......I do not know that what your section 144 means. If this section prohibits home industry, and requesting people to purchase home made cloth, in preference to foreign cloth, which as I know, all the civilised world, and which the British people at home often support, the people who drafted the law must have been very bad......"

এসব কথা লিখবার পর মিঃ স্ট্রং নেলীকে গ্রেপ্তার করবার সাহস পেলেন না। উপলব্ধি করলেন শ্রীমতী নেলীকে গ্রেপ্তার করবার অর্থ, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া। আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করা।

শ্রীমতী নেলীর এই তেজদৃপ্ত উক্তি এবং আচরণ সমগ্র দেশের অকুণ্ঠ জনসমর্থন ও অভিনন্দন লাভ করল। এতদিন শ্রীমতী নেলী

ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের মর্মসঙ্গিনী, এইসময় থেকে তিনি তাঁর কর্মসঙ্গিনী এবং সংগ্রামের সঙ্গীরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন।

ইতিমধ্যে বহু কংগ্রেস কর্মী ও বিপ্লবী নেতা কারাবরণ করেছেন অনির্দিষ্টকালের জন্য। বিনাশর্তে এই সব কারারুদ্ধদের মুক্তির দাবি করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য দলের পক্ষ থেকে প্রস্তাব রাখলেন, আইনসভায় আলোচিত ও গৃহীত হবার জন্য। রাজ্যের বিভিন্ন শহরে সভা করে এ প্রস্তাবের সপক্ষে দেশবাসীর সমর্থন নিয়ে জনমত গঠন করলেন দেশবন্ধু। স্থির হোলো স্বরাজ্য দলের ডেপুটি লিডার হিসাবে যতীন্দ্রমোহন উক্ত প্রস্তাব আইনসভার অধিবেশনে উপস্থাপিত করবেন। আইনসভার অধিবেশনের প্রতি তখন সারাদেশের দৃষ্টি নিবদ্ধ। যতীন্দ্রমোহনেরও আনুসঙ্গিক বিবিধ তথ্যসংগ্রহ করে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দেবার জন্য প্রস্তুতি শেষ। একসপ্তাহ পরেই আইনসভার অধিবেশন বসবে। হঠাৎ বোম্বে থেকে সংবাদ এলো, সামনের সপ্তাহে বাওলা হত্যা মামলার শুনানী আরম্ভ হবে বোম্বে হাইকোর্টের সেশান কোর্টে। যতীন্দ্রমোহনের সহকারী ব্যারিস্টার অনুরোধ জানিয়ে 'তার' করেছেন, যতীন্দ্রমোহন যেন অবিলম্বে বোম্বে যাত্রা করেন।

বিমানপথে যাতায়াত তখনও প্রবর্তিত হয়নি। রেলপথে কলকাতা বোম্বে যাতায়াত সময় লাগবে তিনদিন। যতীন্দ্রমোহন দ্বিধাগ্রস্থ—বোম্বে যাবেন, কি কলকাতায় আইন সভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন? শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলেন বোম্বে যাবেন না। শ্রীমতী নেলীর মতামত জানবার আগ্রহ হোলো তাঁর। জিজ্ঞেস করলেন সহধর্মিণীকে। শ্রীমতী নেলী উপলব্ধি করলেন—স্বল্পভোটের আধিক্যের উপর স্বরাজ্যদলের জয় নির্ভর করে আইনসভায়। দলে যতীন্দ্রমোহন, দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্ত। যদি যতীন্দ্রমোহনের অনুপস্থিতিতে দলের পরাজয় ঘটে, যতীন্দ্রমোহনের রাজনৈতিক জীবনে কলঙ্ক আসবে। দেশবাসী বলবে, অর্থের লোভ সংবরণ করতে পারেননি যতীন্দ্রমোহন। তাই যতীন্দ্রমোহনের বোম্বে যাবার বিপক্ষে এবং ব্রিফ পাঠিয়ে দেবার সপক্ষে মত প্রকাশ করলেন শ্রীমতী নেলী। ফিজ বাবদ যে অগ্রিম পঁচিশ হাজার টাকা পেয়েছেন তাও ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে বললেন।

ঘটনাটি সেদিন দেশবন্ধুর গোচরে আনলেন দেশপ্রিয়র অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীমতী বাসন্তীদেবীর অগ্রজ ব্যারিস্টার সুরেন্দ্রনাথ হালদার এবং ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ব্যারিস্টার সুবোধ চন্দ্র রায়। প্রিয়শিষ্য

যতীন্দ্রমোহন আসাম বেঙ্গল রেল কর্মচারীদের ধর্মঘট সংক্রান্ত ব্যয়ভার বহণ করতে গিয়ে ঋণে জর্জরিত। উক্ত ঋণ পরিশোধ করবার সুবর্ণ সুযোগ এসেছে বাওলা মামলার প্রাপ্ত অর্থ থেকে। তাই দেশবন্ধু বাসন্তীদেবীকে সঙ্গে নিয়ে এলেন যতীন্দ্রমোহনের ৪/১ ময়রা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে। স্নেহভরে যতীন্দ্রকে বললেন, "যতীন তোমার ঋণ রয়েছে। বাওলা মামলার ফিজের টাকায় তা শোধ হয়ে যাবে। তুমি নিশ্চিন্ত মনে নিরুদ্বেগে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবে। নেলীর আর্থিক অভাব-অনটনের চিন্তাভাবনার অবসান ঘটবে। আইন সভার জয়-পরাজয়ের কথা ভেবো না, আমি সামলে নেবো ; তুমি বোম্বে যাও।"

শ্রীমতী বাসন্তীদেবীও একই উপদেশ দিলেন।

যতীন্দ্রমোহন সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানালেন দেশবন্ধু ও বাসন্তীদেবীকে, তাঁদের আন্তরিক সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার জন্য। কিন্তু সংকল্প অটুট রইলেন, স্বীয় মত পরিবর্তন করলেন না। বন্ধুরা বললেন, 'একবার চেষ্টা করে দেখ, পক্ষকালের জন্য মামলা মুলতুবি রাখবার ব্যবস্থা করা যায় কিনা, বোম্বে হাইকোর্টে স্বীকৃত হয় কিনা।' মামলা মুলতুবি রাখবার অনুরোধ জানিয়ে 'তার' করা হোলো বোম্বে হাইকোর্টের রেজিষ্টারের কাছে। অনুরোধ অগ্রাহ্য হোলো। নির্দিষ্ট দিনে আইন সভার অধিবেশন বসল। রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে ভাষণ দিলেন যতীন্দ্রমোহন। সরকার পক্ষের পরাজয় ঘটল।

যতীন্দ্রমোহনকে অভিনন্দন জানালেন দেশবন্ধু। সভাশেষে নেলীকে নিয়ে বাড়ীতে ফিরেছেন যতীন্দ্রমোহন, এমন সময় ভৃত্য একখানি টেলিগ্রাম শ্রীমতী নেলীর হাতে দিল। টেলিগ্রামে প্রেরিত সংবাদ নেলী যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। যতীন্দ্রমোহনকে টেলিগ্রামখানি দিলেন। বোম্বে হাইকোর্টের রেজিষ্টার জানিয়েছেন,—"বিচারক অসুস্থ, তাই বাওলা হত্যা মামলার শুনানী শুরু হবে পক্ষকাল পরে অর্থাৎ পনেরো দিন পরে"। সঙ্গে সঙ্গে মক্কেলেরও টেলিগ্রাম এসে হাজির ; যতীন্দ্র মোহনকে স্বনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন ব্রিফ পুনরায় গ্রহণ করতে। শ্রীমতী নেলীকে সঙ্গে করে যতীন্দ্রমোহন, তখনি দেশবন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। সংবাদ শুনে দেশবন্ধু উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন "যতীন, তুমি আদর্শ দেশসেবক, সত্যিকারের ত্যাগী ; তাই তোমার উপর ঈশ্বরের অসীম করুণা।" শ্রীমতী নেলীকে বললেন দেশবন্ধু—"নেলী, তুমি আদর্শ পত্নী।"

মেয়র হবার পর দেশের এবং বিদেশের বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি মহানগরী কলকাতায় এসেছেন বিভিন্ন সময়ে। তাঁদের অভ্যর্থনা করবার দায়িত্ব বহন করতে হোতো কলকাতার মেয়র যতীন্দ্রমোহনকে। সামাজিক অনুষ্ঠান কিম্বা ঘরোয়া মিলন ক্ষেত্রে তাঁদের পরিচর্যা করবার ভার থাকত মেয়র-পত্নী শ্রীমতী নেলীর উপর। নেলী তাঁর এই নতুন দায়িত্ব সব সময়ই পালন করেছেন হাসিমুখে।

যতীন্দ্রমোহনের বাড়ীতে এসেছেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু থেকে শুরু করে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের, বিভিন্ন মতের, বিভিন্ন রুচির খ্যাতনামা ব্যক্তিবৃন্দ। তাঁরা শ্রীমতী নেলীর আতিথেয়তায় সন্তোষ প্রকাশ করতেন। ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত শ্রীমতী নেলীর জীবন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িয়েছিল অঙ্গাঙ্গিভাবে। ১৯২৮ সালে কংগ্রেস অধিবেশন হয় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে। ১৯৩০ সাল, যতীন্দ্রমোহান তখন জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অস্থায়ী সভাপতি। স্বাধীনতালাভের দুর্জয় সংকল্প গ্রহণে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়াসে যতীন্দ্রমোহন দেশের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করে জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন ; সঙ্গে রয়েছেন শ্রীমতী নেলী।

১৯৩০ সালের ২৫শে অক্টোবর। সহস্র শহিদের রক্তে রঞ্জিত জালিয়ানওয়ালাবাগের মহতী জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন দেশপ্রিয়। অকস্মাৎ সভাস্থলে পুলিসের আবির্ভাব। অধিনায়কের হাতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। যতীন্দ্রমোহনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিল্লীর জনসভায় তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাজদ্রোহ প্রচার করেছেন। গ্রেপ্তার করে পুলিস পাহারায় যতীন্দ্রমোহনকে নিয়ে আসা হোলো অমৃতসর থেকে দিল্লীতে। দিল্লীর ম্যাজিস্ট্রেট টি. বি. পোল (T. B. Poll) তাঁর বিচার করে ছ' বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। দিল্লীর সেন্ট্রাল জেলে তাঁকে আবদ্ধ করা হোলো।

এই সময় মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, শ্রীমতী কমলা নেহেরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও কারাগারে। দেশের সর্বত্র সহস্র সহস্র কর্মীদের বন্দী করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে কংগ্রেসের প্রায় সমস্ত কর্মী এবং নেতৃবৃন্দকে সেই সময় কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। শ্রীমতী নেলী তখন দিল্লীতে। বিশেষ বিচলিত তিনি। নির্ভীক বিক্রমের সঙ্গে শ্রীমতী নেলী ঘোষণা করলেন, "দেশের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োজিত করব ভারতে ব্রিটিশ

শাসনের অবসান ঘটাবার প্রচেষ্টায়"। আইন অমান্য করবার, রাজদ্রোহ প্রচারে ব্রতী হবার সংকল্প নিলেন শ্রীমতী নেলী।

৩০শে অক্টোবর, ১৯৩০ সাল। দিল্লীতে তখন ১৪৪ ধারা রয়েছে; সরকারী হুকুম অবজ্ঞা ক'রে শ্রীমতী অরুণা আসফ আলির সভানেতৃত্বে এক জনসভার আয়োজন করা হয়েছে কুইনস্ পার্কে। বক্তৃতামঞ্চে শ্রীমতী নেলী দণ্ডায়মানা! সমবেত বিরাট জনতার জয়ধ্বনিতে, শ্লোগানে শ্লোগানে মুখর পরিবেশ। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন শ্রীমতী নেলী। ভাষণে বললেন,—"আমার বুক আনন্দে ভরে গেছে। এই পবিত্র পতাকা হাতে নিয়ে আমি গর্ব অনুভব করছি। এই পতাকা জাতির মহাসম্পদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের পতাকা সংগ্রামের প্রতীক। উদ্ধত ব্রিটিশ সরকার চায়, এই পতাকার অবমাননা করতে। প্রতিজ্ঞা করুন, সংকল্প নিন,—সকল আক্রমণের বিরুদ্ধে আমরা শির উচ্চ রেখে লড়ব। আর এই পতাকা সগর্বে উড্ডীন রাখব। অচিরে ব্রিটিশ সরকারের পতন ঘটাব।"

ব্রিটিশ বিতাড়ণ যজ্ঞে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবার জন্য, বিশেষ করে ভারতীয় নারী সমাজকে, তিনি আহবান জানালেন,—"কেবলমাত্র পুরুষ দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হবে না। ভারতের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। পুরুষের পাশ্বে দাঁড়িয়ে নারী-সমাজের বিরাট শক্তি ভারতীয় জাতীয়তার বেদীমূলে উৎসর্গ করতে হবে, নর-নারী নির্বিশেষে ভারতের স্বাধীন জীবনের লক্ষ্যের দিকে"।

শ্রীমতী নেলীর সেই উদাত্ত আহ্বান এবং আকুল আবেদন সভায় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, অগণিত শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করেছিল। ফলে দিল্লীতে আইন-অমান্য আন্দোলন অধিকতর শক্তিশালী হোলো। বলা বাহুল্য, দিল্লীর সরকারী মহলও এতে ক্ষিপ্ত হোলো। শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী এবং শ্রীমতী নেলীকে গ্রেপ্তার করা হোলো আইন-অমান্যের অভিযোগে। দু'জনকেই দিল্লীর ম্যাজিস্ট্রেট চার মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। দিল্লী সেণ্ট্রাল জেলে তাঁদের বন্দীজীবন যাপনের স্থান নির্দিষ্ট হোলো। দিল্লীর সেণ্ট্রাল জেল সম্বন্ধে শ্রীমতী নেলী বলেছেন,—"এমন অপরিচ্ছন্ন জেল আমি কোথাও দেখিনি। অন্যান্য ব্যবস্থাও শোচনীয়। যার যা খুশি এখানে করা চলে. সারারাত জেলরক্ষীদের হৈ-হুল্লোড়, 'হিন্দু পানি,—মুসলমান পানি' বলে অবিরাম চিৎকার—রাত্রে ঘুমান প্রায় অসম্ভব। বিরক্তিকর অব্যবস্থাও বিশ্রী পরিবেশের

প্রতি জেলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও সুফল হয়নি। আমরা রাজনৈতিক বন্দীরা নিজেরাই থাকবার ঘর ও সংলগ্ন স্থান পরিষ্কার করে নেব বলেছিলাম। আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।"

গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট সাক্ষরিত হোলো। বিভিন্ন জেল থেকে নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া হোলো।

১৯৩৩ সাল; নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের ৪৭তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে কলকাতায়। ভারত সরকার এই অধিবেশন অনুষ্ঠানকে বাণ্চাল করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অভ্যর্থনা সমিতিকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে জাতিও প্রস্তুত, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা হোলো। কংগ্রেস কর্মীদের প্রতিজ্ঞা, নিখিল ভারত কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন অতি অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে। অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন দেশবরেণ্য প্রবীন নেতা মদনমোহন মালব্য। কলকাতায় আসবার পথে আসানসোল রেলস্টেশনে পণ্ডিত মালব্যকে পুলিস আটক করে। পরে, ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রীমাধবহরি এদের নাম সভাপতিরূপে ঘোষিত হোলো। শ্রীএনেকেও পুলিস গ্রেপ্তার করল ব্যারাকপুর রেলস্টেশনে। অধিবেশনে যোগদান করবার জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সহধর্মিনী শ্রীমতী সরুপরাণী নেহেরু বহু বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা প্রতিনিধি সঙ্গে করে কলকাতায় আসছিলেন। বিভিন্ন প্রদেশের বহু যুব কংগ্রেস কর্মীও তাঁর সঙ্গে ছিল। পুলিস শ্রীমতী সরুপরাণীকে বর্ধমান রেলস্টেশন পার হ'য়ে আর অগ্রসর হোতে দিলো না। প্রতিনিধি এবং যুবকদের গতিরোধ করা হোলো। ভিন্নপথে অন্য যেসব কংগ্রেস প্রতিনিধি আসছিলেন, পুলিসের কাছ থেকে তাঁরাও বাধা পেলেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন যথাক্রমে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং পঞ্চানন বসু। তাঁদেরও গ্রেপ্তার করা হোলো। পরে সভাপতি নির্বাচিত হবার জন্য মনোনীত হলেন ডক্টর নলিনাক্ষ সান্যাল। তিনিও গ্রেপ্তার হলেন। তিনি গ্রেপ্তার হবার পর যিনি মনোনীত হলেন তিনিও গ্রেপ্তার হলেন, তিনি হলেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার। কংগ্রেস সমর্থক বাংলার খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা কয়েকজন, তখনও কারাগারের বাইরে আত্মগোপন করে রয়েছেন। শত চেষ্টা করেও পুলিস তাঁদের সন্ধান পায়নি। প্রবীণ বিপ্লবী শ্রদ্ধেয় জ্যোতিষ ঘোষ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হোলো। মূল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবার যাবতীয় ব্যবস্থা

সম্পূর্ণ। সভা বসল পুলিসের চোখকে ফাঁকি দিয়ে অতি গোপন স্থানে —চৌরঙ্গী অঞ্চলের এক সৌখীন বিভাগীয় বিপনীর (Departmental Store) দোতলার চা-কক্ষে।

গোপন সভায় স্থির হোলো,—শ্রীমতী নেলীকে অধিবেশনের সভাপতিত্ব করবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হবে। বীরভূমের তরুণ কংগ্রেস নেতা গোপিকাবিলাস সেন এই প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলেন শ্রীমতী নেলীর কাছে। কোন্ স্থানে, কোন্ সময়ে অধিবেশন বসবে, তখনও ঠিক হয়নি। স্থান নির্দিষ্ট হবে যথাসময়ে ; শেষ অবধি পুলিস হয়তো স্থানটির সন্ধান পাবে এবং সেস্থানে পেঁছে মারধোর করে অধিবেশন ভেঙে দেবার চেষ্টা করবে—এরূপ বিপদসংকুল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে তাঁকে, গোপিকাবিলাস স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বললেন শ্রীমতী নেলীকে। নেলী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সৌর্যের সঙ্গে বললেন, সর্বপ্রকার বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াতে তিনি প্রস্তুত। তাঁর স্বীকৃতি কেবলমাত্র তাঁর স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষ। যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি তাঁর অভিমত জানালেন। যতীন্দ্রমোহন তখন হাসপাতালে। অপরাহ্নে নেলী যখন হাসপাতালে স্বামীকে তাঁর অভিমত জানালেন, তখন যতীন্দ্রমোহন সানন্দে শ্রীমতী নেলীকে অনুমতি দিলেন। জাতির এই সংকটকালে, দুর্যোগময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে তিনি নেলীকে উৎসাহিত করলেন।

শ্রীমতী নেলী নিশ্চিন্ত। যথাসময়ে তাঁর স্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন অভ্যর্থনা সমিতির গোপিকাবিলাস সেনের কাছে। উদ্যোক্তারা খুশি হলেন। স্থির হোলো,—মূল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবার নির্দ্ধারিত দিনে, অপরাহ্ন দু'টোয় একখানি ট্যাক্সি যাবে নেলীর বাড়ীতে। সঙ্গে থাকবে একজন যুবক। তার কাছ থেকে ছোট একটি চিঠি পাবেন নেলী। চিঠি পাওয়া মাত্র তিনি ট্যাক্সিতে উঠবেন। যুবকের নির্দেশে বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে ট্যাক্সি চলবে। অবশেষে ট্যাক্সি যেখানে থামবে, তার নিকটস্থ কোনস্থানে বিউগল-ধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে। এ ধ্বনি অনুসরণ করে শ্রীমতী নেলী গন্তব্যস্থলে পেঁছিবেন। পেঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে গোপিকাবিলাস তাঁকে স্বাগত জানাবেন এবং শ্রীমতী নেলী তাঁর ভাষণ দেবেন।

১লা এপ্রিল, ১৯৩০ সাল। কংগ্রেস অধিবেশন ব্যর্থ করবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ভারত সরকারের। কলকাতার যত পার্ক, উন্মুক্ত স্থান, তার সবই পুলিসের অধিকারে রাখা হয়েছে ভোর থেকেই। শহরের

বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিসের গাড়ী টহল দিচ্ছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে জনতার ভিড়। ময়দানে মনুমেণ্টের নীচে ঘোড় সওয়ার পুলিস বাহিনী দাঁড়িয়ে। জনসাধারণের মনে মহা কৌতুহল। প্রশ্ন, কংগ্রেস অধিবেশন আদৌ অনুষ্ঠিত হবে কি? যদি হয়, কোন্ স্থানে হবে। অপরাহ্ন দু'টো। নেলীর বাড়ীর গাড়ি-বারান্দায় একটি ট্যাক্সি প্রবেশ করল। শিখ ড্রাইভার; পাশে একজন বাঙালী যুবক। যুবকটি গোপিকাবিলাস স্বাক্ষরিত একটি ছোট কাগজ দিল নেলীর হাতে। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে তিনি ট্যাক্সিতে উঠে পড়লেন। ট্যাক্সি চলতে শুরু করল। পার্ক স্ট্রীট হয়ে ময়দানের রাস্তা, মেয়ো রোড অতিক্রম করে রাজভবন পশ্চাতে রেখে এসপ্ল্যানেড ইস্টের দিকে। বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট আর চৌরঙ্গী রোডের সঙ্গমস্থলে এসে ট্যাক্সি থামল কে. সি. দাসের খাবারের দোকানের সামনে। সর্দারজী হাসিমুখে তার শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন শ্রীমতী নেলীকে। ইঙ্গিতে জানালেন, এইখানেই যাত্রার শেষ।

হঠাৎ শোনা গেল, তুর্যনিনাদ, এসপ্ল্যানেড ট্রামগুমটির দিক থেকে। শ্রীমতী নেলী ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লেন রাস্তায়। কোনোদিকে না তাকিয়ে ত্বরিতগতিতে ছুটলেন গুমটির অভিমুখে। অগণিত ট্রামযাত্রী প্রত্যোহের মতোই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গুমটির চারিদিকে। শ্রীমতী নেলী দাঁড়ালেন তাদের মধ্যে। দৃঢ়সংকল্প কংগ্রেস প্রতিনিধি ও কর্মী, অনেকে সুকৌশলে মিশে গিয়েছিলেন ট্রামযাত্রীদের ভীড়ে। নেলীকে দেখামাত্র তাঁরা উল্লাস প্রকাশ করলেন; অভিনন্দিত করলেন তাঁকে। জামাকাপড়ের মধ্যে তাঁরা লুকিয়ে রেখেছিলেন ছোট ছোট ত্রিবর্ণ কংগ্রেস পতাকা। এবার সোৎসাহে সগর্বে তুলে ধরলেন ঊর্দ্ধে অগণিত পতাকা। আবার জয়োল্লাস। আবার 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি গোপিকাবিলাস সেন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"কংগ্রেস অধিবেশনের সভানেত্রী নেলী সেনগুপ্তা এখন তাঁর অভিভাষণ পাঠ করবেন।" নেলী কংগ্রেসের ক্রীড পাঠ করলেন। অভিভাষণে ভাবগম্ভীর কণ্ঠে জাতিকে আহ্বান জানালেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে; বিদেশ শাসনের অবসান ঘটাবার প্রতিজ্ঞা নিতে আহ্বান জানালেন জাতিকে। চতুর্দিক থেকে বিপুল হর্ষধ্বনি হতে লাগল। ইতিমধ্যে মনুমেণ্টের দিক থেকে ঘোড়সওয়ার পুলিসবাহিনী তীব্রবেগে ছুটে আসতে লাগল। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি তাঁদের কানে পৌঁছেছে। ট্রাম গুমটির

সন্নিকটে এসে শুরু হোলো আক্রমণ। কংগ্রেস পতাকা যাদের হাতে দেখল, ছোট-বড়, নর-নারী নির্বিশেষে, লাঠির আঘাতের পর আঘাতে তাদের দেহ জর্জরিত করল।

শ্রীমতী নেলী গর্জে উঠলেন—"You brutes , why are you beating the innocent boys and girls ? stop, you brutes stop"—ছেলেমেয়েদের মধ্যে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তদানীন্তন এ্যাসিসটেণ্ট পুলিশ কমিশনার রবার্টসন শ্রীমতী নেলীকে জোর করে ভীড়ের মধ্যে টেনে হিঁচড়ে বের করলেন। পুলিস ভ্যানের মধ্যে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তাঁকে। বাইরে থেকে ভ্যানের দরজা বন্ধ করে নিজেই ভ্যান চালিয়ে ছুটলেন। জনতার ভিড় এড়াবার কৌশলে, প্রথমে গেলেন তাঁর নিজের বাড়ীতে; তারপর লালবাজার থানায়। আলিপুর জেলে শ্রীমতী নেলীকে আটক করা হোলো।

অনিলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত উত্তরকলকাতার চন্দ্রনাথ প্রেসে নেলীর সাহসের প্রশংসা করে এবং পুলিসের জুলুমের তীব্র নিন্দা করে এক পুস্তিকা প্রকাশ করে প্রচার করা হোলো। এর জন্য পুলিস প্রেসে হানা দিয়ে অনিলকৃষ্ণ এবং তাঁর সহকর্মীদের গেপ্তার করল। ১৯৪৬ সালে জেনারেল কন্সটিটিউয়েন্সি থেকে একমাত্র মহিলা প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হন নেলী। ১৯৫২ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন তিনি, এ অত্যাচারের কারণ ছিল ভাষা-আন্দোলন। ১৯৫৪-৫৫ সালে পূর্ব-পাকিস্থানের বিধানসভায় জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে তিনি নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালে অসুস্থতার জন্য তিনি কলকাতায় আসেন। এইখানেই ২৩শে অক্টোবর, ১৯৭৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। চিরদিনের মতো তিনি ইহলোকের স্বাধীনতা-প্রেমিক মানুষজনের মায়া ছেড়ে পরলোকে যান।

দেশ মাতৃকার বন্ধন মুক্তির জন্য যাঁরা নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন, শ্রীমতী নেলী তাঁদের মধ্যে একজন। অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশমাতৃকার বন্ধন মুক্ত হয়। কিন্তু একই সঙ্গে দেশবিভাগের বেদনা তাঁদের করেছে আহত। এ বেদনা আহত করেছে নেলী সেনগুপ্তাকেও। তাই তো এপার বাঙলা, ওপার বাঙলার বিচ্ছেদকে তিনি মন দিয়ে মেনে নিতে পারেননি। স্বাধীনতার পরবর্তী বছরগুলির বেশ কিছু সময়ই তিনি কাটিয়েছেন চট্টগ্রামের শ্বশুরালয়ে আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে, বাকী সময় কাটিয়েছেন কলকাতায়, কিছু সময়ের জন্য ছিলেন ঢাকাতে।

দেশপ্রিয় তাঁর এক ভাষণে বলেছেন—"হয়তো আমাদের আজিকার অধিকাংশ কর্মীকে রণক্ষেত্রেই শয়ন করতে হবে। স্বাধীনতার বিজয়োৎসবে যোগদান করবার সৌভাগ্য, হয়তো জীবনে আসবে না। কিন্তু তথাপি আমরা সেই আশাতেই বাঁচব এবং মৃত্যুকালেও এই বিশ্বাস নিয়ে মরব যে, দু'খানি বাহু যখন নিস্তব্ধ হবে, সহস্রবাহু সেই অসমাপ্ত কার্যে পরদিনই প্রসারিত হবে"—মহান স্বামীর এই উক্তিই যেন শ্রীমতী নেলীকে অমিতনিষ্ঠা, অবিচলিত ধৈর্য্য নিয়ে প্রশান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে আমরণ ভারতের সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

পণ্ডিতাণী রমাবাঈ

(১৮৫৮—১৯২২)

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম অভিযানের যুগে ভারতবর্ষে নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে যেসব মহাপ্রাণ পুরুষ-মহিলা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, পণ্ডিতাণী রমাবাঈ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসেও আমাদেরকে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং এইসব সমস্যার সমাধান করেই আমাদেরকে অগ্রসর হতে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে কিন্তু সেই সময়কার সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার দিকে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এই মহিলা, তিনি একাই সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারকার্য চালিয়ে গিয়েছিলেন।

১৮৫৮ সালে ২৩শে এপ্রিল বোম্বাই-এর নিকটবর্তী পশ্চিম ঘাটের অনতিদূরে গঙ্গামল জঙ্গলে এক দরিদ্র পরিবারে রমাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অনন্ত পদ্মনাভ ডনগ্রে একজন বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন। অনন্ত পদ্মনাভ তাঁর গ্রাম মাল হেরানজী ম্যাঙ্গালোর ছেড়ে গঙ্গামল পাহাড়ে আশ্রম স্থাপন করেন। এই আশ্রমেই রমাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে রমাবাঈ তেমন কোনো শিক্ষালাভ করতে পারেন নি। মায়ের কাছেই মুখে মুখে শ্রীমদ্ভাগবত গীতার বিভিন্ন শ্লোক পড়তেন। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর মা যখন তাঁকে সেইসব শ্লোক আবৃত্তি করতে বলতেন তিনি নির্ভুলভাবে তা আবৃত্তি করে মাকে শোনাতেন। এভাবে বালিকা অবস্থাতেই রমাবাঈ শ্রীমদ্ভাগবত কণ্ঠস্থ করেছিলেন।

তদানীন্তন সময়ে হিন্দু প্রথা অনুযায়ী রমাবাঈ-এর বড় বোনকে তাঁর বাবা খুব অল্প বয়সেই বিবাহ দেন। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়ে অনন্ত পদ্মনাভর যে সামান্য সম্পত্তি ছিল, তা সমস্তই বিক্রি করে দিতে হয়েছিল। একেবারে নিঃস্ব হয়ে তিনি তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা রমাবাঈ

এবং পুত্র শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে নিয়ে তীর্থ পরিভ্রমণে বের হলেন। দারিদ্র্য এ পরিবারকে এমনভাবে ঘিরে ধরেছিল যে রমাবাঈ, তাঁর পিতার দারিদ্র্যের কারণ যে দিদির বিয়ে তা বেশ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এ ঘটনা বাল্যকালেই তাঁর মনে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং এর জন্যই তিনি পরিণত বয়সে বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা প্রভৃতি সামাজিক ব্যবস্থার কঠোরতাকে দূর করবার জন্য প্রতিবাদের কণ্ঠ ধ্বনিত করেছিলেন। এই সব সামাজিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

তীর্থ ভ্রমণের সময় তীর্থের পথে পথেই রমাবাঈ তাঁর মায়ের কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি ১৮,০০০ শ্লোক আবৃত্তি করতে পারতেন। ১৮৭৪ সালে তীর্থের পথেই তাঁর পিতা ও মাতা কয়েক মাসের ব্যবধানে মারা যান, তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোলো বছর। পিতৃমাতৃহীন হয়ে তাঁরা ভাই-বোন ৪,০০০ মাইলের উপর তীর্থভ্রমণ করবার পর ১৮৭৮ সালে কলকাতায় আসেন। তীর্থের পথে-পথেই খাদ্যের কিছু সংস্থান করবার জন্য রমাবাঈ এবং শ্রীনিবাস পুরাণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করে কিছু অর্থ উপার্জন করেন, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল সামান্যই। তাই তাদের খাদ্যের অভাবও ছিল খুব।

কলকাতায় এসে রমাবাঈ সংস্কৃত কলেজ, মেট্রোপলিটন কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত ভাষার উপর বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে থাকেন। ভারতের স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে অনীহা এবং অনুন্নতি দূর করবার কঠোর ব্রত তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই গ্রহণ করেছিলেন, তাই ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নারীশিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তদানীন্তন বহু গণ্যমান্য পণ্ডিতগণের সঙ্গে রমাবাঈ বহু শাস্ত্রীয় আলোচনা করতেন। তাঁর এই অসামান্য প্রতিভার জন্য তাঁকে 'পণ্ডিত' এবং 'সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

রমাবাঈ-এর সমস্ত প্রচারের মূল কথা ছিল যে, প্রত্যেক হিন্দুনারীকে বিবাহের পূর্বে সংস্কৃত এবং জাতীয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত করা একান্ত প্রয়োজন। তাঁর খ্যাতি সারা ভারতে খুব অল্প দিনের মধ্যেই বিস্তারলাভ করে। ১৮৮০ সালে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মারা যান ; ভ্রাতৃবিয়োগে রমাবাঈ সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়েন। আশ্রয়হীনা রমাবাঈ তখন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিছাত্র এবং বিশিষ্ট আইনজীবী বিপিনবিহারী দাসকে বিবাহ করেন। কিন্তু ১৮৮২ সালে বিপিনবিহারীর মৃত্যু হয়। সাংসারিক

জীবনের সর্বসুখ থেকে বঞ্চিতা রমাবাঈ একমাত্র শিশুকন্যা মনোরমাকে নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, অবশেষে তিনি পুণায় আসেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। পুণার প্রগতিশীল ব্যক্তিগণের সাহায্য নিয়ে তিনি প্রথমে পুণায় এবং পরে বোম্বাই-এর সোলার থানার অন্তর্গত আহমেদনগরে 'আর্য মহিলা সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। 'আর্য মহিলা সমাজে'র প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাল্যবিবাহ, সামাজিক চিরাচরিত কুপ্রথা রহিত এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি।

১৮৮৩ সালে উত্তরপ্রদেশের আন্দোলনের সমর্থনে ভারতীয় মহিলাদের চিকিৎসাদানের সুযোগ-সুবিধাদানের ব্যাপারে রমাবাঈ হাণ্টার কমিশনের কাছে প্রমাণপত্র প্রদান করেন। এই প্রমাণপত্রটি তিনি মারাঠীতে দেন। মিঃ হাণ্টার তাঁর এই প্রচেষ্টা দেখে অভিভূত হয়েছিলেন এবং সমস্ত ইংল্যাণ্ডে এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচারকার্য চালান। এই একই বছরে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে তিনি কন্যা মনোরমাকে নিয়ে ইংল্যাণ্ডে যান। সেখানে তিনি সেণ্ট্ মেরির বোনেদের সঙ্গে থাকতেন। ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন তাঁরই প্রচেষ্টায় সেখানকার নারীদের উচ্চশিক্ষার জন্য তুমুল আন্দোলন সংগঠিত হবার পর নানাস্থানে নারীশিক্ষার জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়।

খৃষ্টানদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা করতে গিয়ে তাঁদের উৎসাহ এবং উদারতা দেখে তিনি খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। এরপর ১৮৮৩ সালে ২৯শে সেপ্টেম্বর তিনি খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৮৬ সালে তিনি আমেরিকায় যান। সেখানে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে অধ্যয়ন করেন, এছাড়া Froebel's system of Kindergarden অর্থাৎ শিশুশিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাপারে শিক্ষালাভ করেন এবং অবসর সময়ে মারাঠীতে একদল শিশু ছাত্র তৈরী করতে থাকেন। হিন্দুনারীর উপরে লেখা তাঁর পুস্তক 'হিন্দু নারীর উচ্চ সংস্কার' (The High Caste Hindu Women) আমেরিকায় খুবই সমাদৃত হয়।

১৮৮৭ সালে ১৩ই ডিসেম্বর আমেরিকার সাহায্যে তিনি বোস্টনে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বাল্যবিধবাদের শিক্ষাদান। এ ব্যাপারে তিনি আমেরিকার সাহায্য পেতেন, দশ বছর তিনি এ ধরনের সাহায্য পান। ১৮৮৯ সালে বোম্বাইতে ফিরে আসেন এবং ঐ বছরই ১লা মার্চ তিনি 'সারদা সদন' স্থাপন করেন। বিধবা ছাড়াও অন্যান্য কিশোরী মেয়েদের সেই বিদ্যালয়ে পাঠ

নেবার অধিকার ছিল। 'সারদা' প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হবার বছর খানেক পরে তা বোম্বাই থেকে পুণায় নিয়ে আসা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে রমাবাঈকে অনেক বিরূপ মন্তব্য শুনতে হয়েছিল, তা হোলো, এই প্রতিষ্ঠান ধর্মান্তরের প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ হিন্দুদের খৃষ্টান ধর্মে রূপান্তরিত করবার প্রতিষ্ঠান।

১৮৯৭ সালে রমাবাঈ পুণা থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে খেদগোন নামক স্থানে একটি খামার তৈরীর কাজে একদল মহিলাকে পাঠান, সেখানে থেকে কাজ করবার জন্য। এই খামারই হয়েছিল 'রমাবাঈ মুক্তি মিশন'। যখন পুণার 'সারদা সদনের' দায়িত্বভার সুন্দরাবাঈ-এর অধীনে চলে আসে তখন রমাবাঈ তাঁর সমস্ত সময় মুক্তি মিশনের কাজে ব্যয় করতেন। ১৯০০ সালের দুর্ভিক্ষে বিভিন্ন স্থানের মহিলাদের আশ্রয় দিয়েছিল তাঁর এই 'মুক্তি মিশন'। কৃপাসদন নামে একটি উদ্ধার গৃহের দ্বার সব সময়ই উম্মুক্ত থাকত বিপদগ্রস্ত মহিলাদের জন্য। তাঁর এই 'মুক্তি মিশনে' বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, যথা কৃষি, পশুপালন (খামার), বোনা, মুদ্রণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। 'মুক্তি মিশনে'র মেয়েরা প্রিণ্টিং প্রেসে মারাঠী, ইংরাজী, গ্রীক, হীব্রু প্রভৃতি ভাষায় অক্ষরের কাজ করতেন। উদ্ধার গৃহ 'কৃপাসদনে'র সঙ্গে ছিল একটি হাসপাতাল। প্রীতিসদন, সারদাসদন এবং শান্তিসদনে বিভিন্ন বয়সের লোকেরা থাকতেন। মুক্তিসদনের মেয়েদের সঙ্গে সদনের পার্শ্ববর্তী কলোনী 'বেথেল'-এর ছেলেদের বিবাহ করবার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন এবং তাঁদের এই জীবনযাত্রায় তিনি যথেষ্ট সাহায্য করতেন। রমাবাঈ যদিও যীশুখৃষ্টের একজন বড় ভক্ত ছিলেন তথাপি নিজস্ব গীর্জা নির্মাণের চেষ্টা তিনি কখনও করেননি।

রমাবাঈ তাঁর মেয়েদেরকে তাদের নিজস্ব সঞ্চয় থেকে অন্যান্য মিশনারীদের সাহায্য করবার জন্য শিক্ষা দিতেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই সাহায্য যেতো, একবার চীনেও এই ধরনের সাহায্য পাঠানো হয়। বিদেশ থেকেও মিশনারী বন্ধুরা শুধুমাত্র অর্থ নয়, সারা জীবনের জন্য এ মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করবার জন্য আসতেন। তদানীন্তন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের সাহায্যের হাত নিয়ে। দু'শত তিরিশ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এই মিশন। মিশনের অভ্যন্তরে ছিল শাক-সব্জি, ফলের বাগান, কিছু পরিবার এবং তাদের এক শতটি গবাদি পশু ও ভেড়া ছিল।

পিতার মতই রমাবাঈ প্রগতিশীল ছিলেন। ১৮৮৯ সালে তদানীন্তন খ্যাতনামা নেতাদের মধ্যে অনেকেই, এমন কি রাজনৈতিক নেতা রাণাডেও মহিলাদের রাজনীতিতে আসবার পক্ষে ছিলেন না। অথচ রমাবাঈ আটজন মহিলা প্রতিনিধিসমেত পঞ্চতম জাতীয় কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, তাঁর রচিত বেশ কিছু পুস্তকে তিনি তাঁর মতামত প্রগতিশীলতার পক্ষেই প্রকাশ করেছেন। তাঁর 'ইউনাইটেড স্টেটস্ চিলোকস্থিতি' পুস্তকে তিনি হিন্দি ভাষাকে জাতীয়ভাষা করবার পক্ষে প্রস্তাব রাখেন। ১৮৯৭ সালে প্লেগ ক্যাম্পে মহিলাদের অব্যবস্থার প্রতিবাদে তিনি তাঁর কণ্ঠকে সোচ্চার করেছিলেন, এ ব্যাপারে বোম্বাই-এর রাজ্যপাল কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় তিনি তাঁর পদত্যাগ দাবী করেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে রমাবাঈ-এর দান স্মরণীয় হবার দাবী রাখে, মারাঠী পুস্তক 'স্ত্রীধর্মনীতি' (১৮৮৩), 'রমাবাঈ চা ইংল্যান্ড চা প্রভাস' (Ramabai Cha England Cha Pravas), 'দি হাই কাস্ট হিন্দু ওমেন' (The High Caste Hindu Women), ইউনাইটেড স্টেট্স্ চি লোকস্থিতি ভারসাস্ প্রভাস বৃত্তি (United States Chi Lokasthiti Vs. Pravas Vritti) 'বাল্যদান'—ইহা মারাঠী রচিত শিশুমনের বিকাশসাধন বিষয়ের উপর ধারাবাহিক রচনা ঃ 'রমাবাঈস্ বাইবেল'—ইহা মূল হিব্রুভাষা থেকে বাইবেলের ভাষান্তর ; 'ইব্রি ভাকর্ণা' (Ibri Vyakarna— Hebrew Grammer in Marathi) ; 'এ টেস্টিমনি' (এটি—the story of her conversion to Christianity) ; 'মুক্তি প্রেয়ারবেল' (Journal of the Mukti)।

ব্যক্তিগত জীবনে রমাবাঈ মোটেই সুখী ছিলেন না। কিন্তু তবুও তিনি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সব ক্ষেত্রেই এগিয়ে গিয়েছেন। ১৯২২ সালে ৫ই এপ্রিল এই মহিয়সী নারী যীশুর পদতলে ঘুমিয়ে পড়েন। সরোজিনী নাইডু তাঁকে সম্বর্ধনা দিতে গিয়ে বলেন—"the first christian to be enrolled in the calender of saints."

প্রতিভা গাঙ্গুলী

(১৯১৭—১৯৪৯)

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হোলো, সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি ব্যথা ভারতবাসীর অন্তরে জমা হোলো অতি সংগোপনে, তা হোলো দেশভাগের ব্যথা। দেশভাগের পর প্রধানমন্ত্রী হলেন জওহরলাল নেহেরু, স্বাধীন ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটী নর-নারী সেদিন স্বাধীন মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে দেশবিভাগের, প্রিয়জন বিচ্ছেদের বেদনাও অনুভব করেছিল। অথচ এই ভারতমাতাকে স্বাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করতে এগিয়ে এসেছিলেন সমগ্র ভারতবাসীর সঙ্গে বাংলার তথা পূর্ব পাকিস্তানের সকল মানুষ। ভারতবাসীর বহুপ্রতীক্ষিত স্বাধীনতা লাভের পিছনে যোগ দিয়েছিলেন ভারতের বহু যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী। জয়ের নিশান উড়িয়ে তারা শ্রদ্ধা জানিয়েছিল শৃঙ্খলমুক্ত ভারতমাতাকে।

বহু আকাঙ্খিত স্বাধীনতা যদিও আমরা পেয়েছিলাম, তবুও ব্রিটিশ শাসনের ছোঁয়াচ মুক্ত হতে পারলো না আমাদের ভারত। তাই এ-শাসনের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ ঘোষণা করেছিলেন বিগত চার-দশক আগে বেশ কিছু নর-নারী। এদের মধ্যে প্রতিভা গাঙ্গুলীকে একজন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখতে পারি আমরা। ছোট নাগপুরের সিংভূম জেলার চাঁইবাসায় ১৯১৭ সালে প্রতিভাদেবী জন্মগ্রহণ করেন; তিনি ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে; তাই শৈশব থেকেই আর্থিক সংকট, সামাজিক ও সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশ তাঁর মনে বিক্ষোভের দানা বাঁধতে সাহায্য করেছিল। তাঁর পিতা ছিলেন প্রগতিশীল। তাঁর মায়ের মানসিকতাও ছিল অত্যন্ত প্রশস্ত। নারী জাতির অবমাননার বিরুদ্ধে তাঁর মাকে তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রতিবাদ করতে দেখেছেন। এ ধরনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁর সংগ্রামী মনকে সক্রিয় করে তুলতে সাহায্য করেছিল।

তাঁর কাকা ছিলেন তৎকালীন সশস্ত্র বিপ্লবের একজন সক্রিয় কর্মী। ১৯৩০ সালের ২৬-শে জানুয়ারী—স্বাধীনতা সংকল্পে ভারত জুড়ে উত্তাল গণ আন্দোলনের বাতাস বইছে। কিশোরী প্রতিভার গায়েও লাগল সে বাতাস, টেনে নিয়ে এলো তাঁকে সংগ্রামের ময়দানে। তাঁর কাকারা ছিলেন বিপ্লবী পরিতোষ ও প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়; বিপ্লবী দল 'যুগান্তরের' তাঁরা ছিলেন সক্রিয় কর্মী। প্রতিভাও যুক্ত হলেন এই দলে—অস্ত্রশস্ত্র রাখা ও গোপনে বহন করা প্রভৃতি কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন। ক্রমশঃ তাঁর বিপ্লবী সত্তার বিকাশ ঘটতে থাকে; স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক হবার মানসিক প্রস্তুতিও সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় হতে থাকে।

কিন্তু এভাবে বেশীদিন চলে না; সামাজিক পারিবারিক নিয়মের কাছে নতি স্বীকার করতে হয় তাঁকে, তাই সতেরো বছর বয়সে তাঁকে বিবাহ করতে হয়। বিবাহের পর গণ্ডগ্রামে ধর্মভীরু স্বামীর সংসারে তাঁকে চলে যেতে হোলো; সামন্ততান্ত্রিক নির্যাতন ও নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হতে হোলো তাঁকে। কিন্তু তিনি, যন্ত্রনাদায়ক অবস্থাকে সহ্য করেও সীমিত যেটুকু সুযোগ পেলেন সেটুকুকেই কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করবার অসাধারণ যোগ্যতাই তাঁকে পরবর্তী জীবনে আন্দোলনের ক্ষেত্রে যোগ্যস্থান করে নিতে সাহায্য করেছিল। শ্বশুরবাড়ীর বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি পড়াশুনা করতে থাকেন এবং ১৯৩৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে সাফল্য লাভ করেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করবার পর ঐ বছরই হুগলীতে ভারতী বিদ্যাভবনে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হন। এর ফলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সুযোগ ঘটল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আন্দোলনের কাজে যুক্ত হন। ১৯৪০ সালে তিনি বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৪২ সালের শেষের দিকে স্কুলের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে একমাত্র পুত্র অরুণকে নিয়ে হুগলী জেলার পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হলেন। মার্কসবাদে শিক্ষিত বিপ্লবী কর্মী প্রতিভার সর্বক্ষেত্রে ত্যাগ ও সাহস যেমন লক্ষণীয় তেমনি লক্ষণীয় ছিল মানুষের মধ্যে সমাজ-চেতনা বিকাশে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। তাঁর প্রচেষ্টায় হুগলী জেলায় একটি শক্তিশালী মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির জেলা কমিটি গঠিত হয়।

সেইসময় হিন্দু নারী বিবাহ-বিল ও সম্পত্তির অধিকার-বিলের উপর আন্দোলন করবার জন্য যে জনমত সংগ্রহের প্রচেষ্টা হয় সেই কাজে

প্রতিভাও নেমে পড়েন। হুগলী জেলার কৃষক আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত হন। গ্রামে গ্রামে গিয়ে ক্ষেত-মজুর মহিলাদের মধ্যে সমিতির প্রচার চালিয়ে যান। ভেড়ি অঞ্চলে কৃষকদের দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে মিটিং মিছিল করেন। এইভাবে ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত একটানা গোপনে কাজ করে চলেন। পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করবার জন্য হন্যে হয়ে যায়। পুলিসের চোখকে ফাঁকি দিয়েও নিজেকে নিরাপদ রাখতে পারলেন না। ফরিদপুরে মায়ের কাছে যাবার সময় পুলিস তাঁকে অনুসরণ করে সেখানে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে নির্দিষ্ট কোনো চার্জ দিতে না পারায় তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

১৯৪৩ সালের শেষের দিকে প্রতিভা পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হলেন; চব্বিশ পরগনা জেলায় পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে প্রকাশ্যেই তিনি কাজ করতে শুরু করলেন। মজুর-বস্তিতে গিয়ে, শ্রমিক সংগঠনের কাজ, গ্রামাঞ্চলে কৃষক সমিতির কাজ, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজ, প্রভৃতি কাজে গোবরডাঙা, ভাটপাড়া, নৈহাটি, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে সংগঠন গড়তে কঠোর পরিশ্রম করে চলেন। শ্রমিক অঞ্চলেও মহিলা সংগঠন গড়ে তোলবার কাজে প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন এবং সংগঠন গড়ে তোলেন। এভাবে অতিরিক্ত পরিশ্রম করবার জন্য প্রতিভার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে, ক্ষয়রোগ দেখা দেয় তাঁর মেরুদণ্ডে।

১৯৪৩ সালে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল ভারতের আকাশে বাতাসে। দলমত নির্বিশেষে সকলেই তখন একটি মন্ত্রে দীক্ষিত, ভারতের স্বাধীনতা। যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে এলো বাংলার মাটিতে। দুর্গত মানুষজনের সেবায় কাজে নেমে পড়তে হলো সবাইকে, মহিলারাও পিছিয়ে ছিলেন না। মহিলাদের সহযোগিতায় গড়ে উঠল মহিলাদের এক শক্তিশালী সংগঠন, 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। ধারাবাহিক কর্মসূচীও চলল তাঁদের। এভাবে এগিয়ে এসেছিল ১৯৪৭ সাল। দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল।

১৯৪৮-৪৯ সাল, পশ্চিমবঙ্গে তেভাগা আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট হচ্ছে, মহিলা আন্দোলনও তীব্রতর হচ্ছে। স্বাধীন সরকার এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সমবেদনা জানায়নি। ১৯৪৯ সালের ৯-ই মার্চ রেল ধর্মঘট। মহিলা সমিতির নির্দেশে মহিলা কর্মীদের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে

প্রতিভা বক্তৃতা দিতে থাকেন। এইসব পথসভার উপর পুলিসের গুলি বর্ষিত হতে থাকে; কৃষক রমণীদের উপরও গুলি চলে। জেলখানা ভর্তি হয়ে যায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের ভীড়ে, দলে দলে কর্মীরা গ্রেপ্তার হতে থাকে। এই সব কর্মীদের গ্রেপ্তার করবার পর কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দেওয়া হোলো না, তাই অনশন শুরু করলেন জেলখানার রাজনৈতিক বন্দীরা।

ইতিমধ্যে প্রতিভাকে কলকাতা জেলা পার্টির সাথে যুক্ত করবার নির্দেশ এলে তিনি সেইমত কাজে যুক্ত হলেন। পার্টির কাজের সঙ্গে সংগে তিনি পড়াশুনা চালিয়ে যেতে লাগলেন; বাংলায় অনার্স নিয়ে কলকাতা সিটি কলেজে পড়া এবং দুপুরে তালতলা বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করা, দু'টো কাজই চালিয়ে যেতে লাগলেন। ১৯৪৯ সালের ২৭-শে এপ্রিল, 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির' উদ্যোগে বৌবাজার ষ্ট্রীটের ভারতসভা হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করা হয়। সভাশেষে এক শোভাযাত্রা বের হয়, যার অগ্রভাগে ছিলেন লতিকা সেন, প্রতিভা গাংগুলী, অমিয়া দত্ত ও গীতা সরকার। অতর্কিতে বিনা কারণে সরকারী পুলিসের গুলি চলতে থাকল। গুলিতে নিহত হলেন লতিকা, প্রতিভা, গীতা ও ছাত্র বিমান ব্যানার্জী। এ সময় প্রতিভার বয়স মাত্র বত্রিশ বছর।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মঞ্চে নেমেছিলেন যে সব কিশোরী স্বাধীনতালাভের পরেও ভারতের মাটিতে শান্তির বীজবপন করবার জন্য তাঁদেরকে অমূল্য জীবন দিতে হয়েছিল। আজ স্বাধীনতার উনচল্লিশ বছর পরে কি আমরা তাঁদের কথা স্মরণ করে বাংলার তথা ভারতের শান্তি কামনা করতে পারি না।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দার

(১৯১১—১৯৩২)

মৃত্যুর আগের দিনে এক যুবতীর লেখা তাঁর মায়ের কাছে চিঠিটির শেষের সামান্য কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

"……স্বাধীনতার জন্য তোমার কন্যার এই আত্মত্যাগের জন্য তুমি গর্ববোধ কোরো, আমি যাচ্ছি।"

চিঠিটি লেখা হয়েছিল ১৯৩২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর; ঠিক তারপরের দিনই অর্থাৎ ২৪শে সেপ্টেম্বর চিঠির লেখিকাকে চলে যেতে হয়েছিল মৃত্যুর পরপারে। এই যুবতী তাঁর একুশ বছরের জীবনে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেলেন শুধুমাত্র দেশমাতৃকার জন্য। এই যুবতী হলেন, প্রীতিলতা। বাংলার মানুষজনের বোধহয় সকলেরই মুখে একটি নাম গত চার-পাঁচ দশক আগে ঘুরত, প্রীতিলতা ওয়াদ্দার। স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ারে নিজেকে উৎসর্গ করে ধন্য হয়েছেন এ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে বেশ কিছু নর-নারী। মহিলারা শুধুমাত্র অংশগ্রহণ করেই ক্ষান্ত হন নি; তাঁরা নেতৃত্বও দিয়েছেন, আন্দোলনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীতে। প্রীতিলতা ওয়াদ্দার তাঁদের মধ্যে একটি অন্যতম নাম।

১৯১১ সালের ১৩ই মে, পূর্ববাংলার চিটাগাং শহরে, অধুনা বাংলাদেশ, এক মধ্যবিত্ত কায়স্থ পরিবারে প্রীতিলতা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জগৎবন্ধু জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে উচ্চবর্গীয় করণীকের কাজ করতেন। তাঁর মাতা প্রতিভাময়ী দেবীর সাধারণ বাংলা শিক্ষা পর্যন্ত জ্ঞান ছিল। পিতা-মাতার কাছে সততা ও কর্তব্যপরায়ণতার শিক্ষায় শিক্ষিত হন প্রীতিলতা ছেলেবেলা থেকেই। শৈশবে বিদ্যালয়ে পাঠকালীন সময় থেকেই তিনি ছিলেন কর্তব্যপরায়ণা ছাত্রী। এই সময় চিটাগাং শহরে যে স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দেশ্যে অস্থির অবস্থার

সৃষ্টি হয়েছিল, সেই অস্থির আবহাওয়ার দ্বারা প্রীতিলতাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। রাত্রে পাঠের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী সাহিত্যের পুস্তক গোপনে পড়তে লাগলেন, সঙ্গে ইংরেজীতে ডায়েরী লিখতে থাকেন। তাঁর হস্তাক্ষর ছিল খুব সুন্দর।

চিটাগাং থেকেই তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন ; এর পর ঢাকা বোর্ড থেকে ১৯৩০ সালে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রথম হয়ে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবারে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং বেথুন কলেজে বি. এ. পড়বার জন্য ভর্তি হন। এখানেই তাঁর লীলা নাগের সঙ্গে পরিচয় হয়। লীলা নাগ ছিলেন দিপালী সংঘর প্রতিষ্ঠাতা। প্রীতিলতা. লীলা নাগ এবং কল্যাণী দাসের সংঘে যোগ দিলেন। এটি ছিল একটি সমাজসেবা কেন্দ্র ; ঢাকা এবং কলকাতায় এর বিস্তৃত প্রচার ছিল। সংঘের সমাজসেবা ছাড়াও আরও একটি কার্য ছিল তা হোলো রাজনৈতিক শিক্ষাগ্রহণ। তাই এই সংঘ প্রীতিলতাকে রাজনৈতিক মতবাদে প্রভাবিত করে ফেলে খুব শীঘ্রই।

কিছুদিন পর্যায়ক্রমে চিটাগাং-এ এলে, তাঁর সঙ্গে নির্মল সেনের যোগাযোগ হয় ; নির্মল সেন ছিলেন 'যুগান্তর' দলের একজন গোপন কর্মী, 'যুগান্তর' দলটি ছিল বিপ্লবীদের তৈরী। এই নির্মল সেনের কাছেই প্রীতিলতা বক্সিং, রাইফেল এবং রিভলবার ছোঁড়া শিক্ষাগ্রহণ করেন। এইখানেই তিনি দলের নেতা সূর্য সেন অর্থাৎ মাষ্টারদার সঙ্গে পরিচিত হন। এই সময় তিনি পড়াশুনা করবার জন্য কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হতে লাগলেন ধীরে ধীরে ; এর ফলে তাঁর পড়াশুনায় প্রচণ্ড ক্ষতি হোলো, ইংরাজী বিষয়ে আর অনার্স রক্ষা করা সম্ভব হোলো না। তবে তিনি ডিস্টিংসন নিয়ে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করলেন।

ছাত্রীজীবনেই বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে প্রীতিলতা দলের নির্দেশেই জেলে কারাবন্দীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন ; জেলে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর বোন পরিচয়ে সাক্ষাৎ করতেন। এর ফলে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা তাঁর পক্ষে খুবই সুবিধাজনক হয় এবং ধীরে ধীরে তিনি তাঁর আদর্শের প্রতি এমনভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যার ফলে এ বিপ্লবী কাজকর্ম তাঁকে চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে এসে ক্ষান্ত হয়নি, তিনি একাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিলেন। এই সময় থেকেই চিটাগাং বিপ্লবী দলে যোগ দেবার পরিকল্পনা নেন।

স্নাতক ডিগ্রীলাভের পর তিনি নন্দনকানন স্কুলে প্রধান শিক্ষিকার পদে চাকুরী নেন। ১৯৩২ সালে বিপ্লবীদের গোপন আস্তানার খবর মিলিটারী বাহিনীর সন্ধানে ধরা পড়লে, মিলিটারী পুলিস দলঘাটে বিপ্লবীদের গোপন আশ্রয়স্থল আক্রমণ করল। বিপ্লবীরাও প্রস্তুত ছিলেন, সংঘর্ষ চলল। সংঘর্ষে বিপ্লবী নির্মল সেন ক্যাপ্টেন ক্যামেরণকে হত্যা করলেন। কিন্তু সংঘর্ষে নির্মল ও অপূর্ব সেন মারা গেলেন। চারিদিকে বিপ্লবীদের ধরবার জন্য ব্রিটিশ শক্তির প্রতিনিধিরা অভিযান চালাতে লাগলো। মাষ্টারদার কাছ থেকে নির্দেশ এলো, প্রীতিকে সাবধানে থাকতে হবে। আত্মগোপন করে থাকতেও হবে প্রয়োজনে। প্রীতি তখন কিছু দায়িত্বপূর্ণ কাজ করবার জন্য আগ্রহী, কিন্তু অনবরত পুলিসের হয়রানী এবং গ্রেপ্তার হবার আশঙ্কায় মাষ্টারদার নির্দেশে শেষ পর্যন্ত তাঁকে আত্মগোপন করতে হোলো।

তিন মাস পরে মাষ্টারদা তাঁকে ডেকে পাঠালেন দলের নতুন কর্মভার গ্রহণের জন্য। ইউরোপিয়ান ক্লাবে অপ্রত্যাশিত আক্রমণ করবার জন্য আটজনের একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দেবার ডাক পড়েছে প্রীতির। সময়টা ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাস, ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের তারিখ ঠিক হোলো ২৪শে সেপ্টেম্বর। মাষ্টারদার কাছ থেকে পরিকল্পনা মাফিক কাজকর্ম বুঝে আটজনের দলকে নিয়ে প্রীতি নেমে পড়লেন কর্তব্যকর্মে। একদল মদ্যপায়ী রাত্রে ক্লাব হলে নাচ করছিলেন। বিপ্লবীদল তিনদিক থেকে রিভলবার ও বোমা নিয়ে আক্রমণ করলেন। দুর্ঘটনাটা ছিল বিরাট, আক্রমণটাও বেশ জোড়দার হয়েছিল। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশিত হতাহতের সংখ্যা,—একজন আহত এবং একজন মহিলা নিহত। নিহত মহিলা ছিলেন প্রীতিলতা। সরকারী সংখ্যার তুলনায় বস্তুতপক্ষে হতাহতের সংখ্যা ছিল কিন্তু বেশী, দু'পক্ষেরই প্রায় এক ডজন নিহত এবং বেশ কিছু ব্যক্তি আহত হন। প্রীতি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, হঠাৎ একটা গুলি এসে তাঁর হাতে লাগল। তিনি মাটিতে এলিয়ে পড়েন, বিরোধীদল পুরুষের পোষাক-পড়া প্রীতিকে চিনতে পারল।

প্রীতি সেখানে স্থির হয়েই গিয়েছিলেন শহিদ হবার জন্য, তাঁর কর্তব্য শেষ, তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁর কাছে বিষাক্ত বিষ ছিল, তিনি দ্বিধা না করে বিষ পান করলেন। প্রাণহীন দেহটা জানালা দিয়ে ক্লাব চত্বরের কাছে এলিয়ে পড়ল। স্বাধীনতা সংগ্রামে এই নারীই

প্রথম শহিদ হলেন, তাঁর সঙ্গীরা তাঁদের এই শহিদ বন্ধুর পাশ দিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু কঠিন দলীয় কর্তব্যের দায়ে তাঁরা আবদ্ধ। তাই প্রচণ্ড কষ্টের সঙ্গে বুক বেঁধে তাঁরা তাঁদের সঙ্গীর প্রাণহীন দেহটাকে পুলিসের হেপাজতে দিতে বাধ্য হলেন। প্রীতির দেহটার প্রতি শেষ অত্যাচারের জন্য ব্রিটিশ সরকারের পুলিস তাদের জিপে তুলে নিল।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম মহিলা শহিদ হলেন এই একুশ বছরের যুবতী। দেশের জন্য তাঁর এই আত্মত্যাগ আমরা ভারতবাসী আজ কি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব না।

বীণা দাস (ভৌমিক)

(১৯১১—১৯৮৬)

স্বাধীনতা লাভের পর উনচল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো ; আজ আমরা স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক মানুষ। পরাধীন ভারতের শৃংখল মুক্ত করবার জন্য যে অগণিত নর-নারী তাঁদের কঠোর সংযম এবং নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন ভারতবাসীর কাছে আজও তাঁরা নমস্য। দেশ মাতৃকার কাজে তাঁদের আত্মত্যাগের মহিমা অবর্ণনীয়। বিংশ শতাব্দীর এই আত্মত্যাগমূলক কর্মে যে সকল বীর সেনানী তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, ভারতের মাটিতে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছিল মূলত উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের দশকগুলিতেই। তবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলিতেও তাঁদের অনেকেই জন্মেছিলেন এই ভারতের মাটিতে। ভারতের সর্বত্র বিশেষ করে বাংলার চতুর্দিকে সাজ সাজ রব উঠে গিয়েছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে। বাংলার নারীরাও ঘরে বসে ছিলেন না। কয়েকজন নেত্রী ও কর্মীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাংলার নারীরা বেরিয়ে এসেছিলেন সংগ্রামের ময়দানে। যে স্বল্প সংখ্যক মহিলাকর্মী ও নেত্রীর প্রাণপণ প্রচেষ্টায় বাংলার নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জেগে উঠেছিল, যাঁরা তাদের সংগ্রামের ময়দানে নিয়ে আসতে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজনকে আজ আমরা স্মরণ করব ; তিনি হলেন বীণা দাস (ভৌমিক)।

১৯১১ সালের ২৪-শে আগস্ট কৃষ্ণনগরে (নদীয়া জেলা) বীণা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বেণীমাধব দাস স্থানীয় স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ করতেন। বেণীমাধব দাস ছিলেন একজন বিখ্যাত শিক্ষা-বিদ ; বাংলার এবং উড়িষ্যার বহু ছাত্রদের তিনি দেশপ্রেমিকতার কাজে অনুপ্রাণিত করেছিলেন ; এদের মধ্যে একজনের নাম করা যায়

যিনি স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলনে ছিলেন একজন অগ্রণী সৈনিক, তিনি হলেন নেতাজীসুভাষ চন্দ্র বসু। বীণার মাতা সরলা দাস ছিলেন একজন সক্রিয় সমাজসেবী; তিনি অনাথা মহিলাদের জন্য 'পুণ্যাশ্রম' নামে একটি আশ্রয়স্থল প্রতিষ্ঠা করেন। বীণার মামারা—সরলা-দেবীর দুই ভাই ছিলেন, বিনয়েন্দ্র নাথ ও মোহিতসেন; বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বাণী ছিলেন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত পরিবারের সন্তান, এই পরিবার বহু সংস্কার মূলক কাজের ভূমিকায় অগ্রণী ছিল। বীণা তাঁর দেশপ্রেমিকতা, আদর্শ এবং সম্পূর্ণ দৃঢ়সংকল্পপূর্ণ চিন্তাভাবনা করবার শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁর পিতার মাতার কাছ থেকেই। তাঁর বড় বোন কল্যাণী ভট্টাচার্য ছিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনের একজন সামনের সারির কর্মী। বিপ্লবী নির্মল দাস ছিলেন তাঁর ভায়েদের মধ্যে একজন। বীণার শিক্ষা-লাভ হয় বেথুন স্কুলে এবং ডায়সেশন কলেজে। ১৯৩১ সালে তিনি স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্র জীবনে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা, শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' এবং 'দেশের কথা' 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ' প্রভৃতি পুস্তক পড়েন। এছাড়া ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী পড়বার পর তাঁর মনের পরিবর্তন হতে থাকে; এ সমস্ত চরিত্র গুলির প্রভাব তাঁকে ক্রমশঃ স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মধারার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে।

১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে যখন বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছিল, বেথুন কলেজের ছাত্রী তখন বীণা। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি এসময় এই বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন। পরে তিনি কলকাতা কংগ্রেসের সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেন। এভাবে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক কর্মধারায় অগ্রসর হতে হতে তিনি ব্যাপক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের দিকে এগিয়ে গেলেন। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এইসময় তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; কিন্তু তার স্থায়ীত্ব দীর্ঘ দিন হোলো না, তিনি কমলাদাশগুপ্তার সঙ্গে 'যুগান্তর-এ' যোগ দিলেন, এদলের সঙ্গেও ধীরে ধীরে যুক্ত হয়ে পড়লেন তিনি, সাংগঠনিক দায়িত্বও এসে পড়তে লাগল তাঁর উপর।

যুগান্তর' দলে যোগ দেবার পর দলের সক্রিয় সদস্য সতীশ চন্দ্র ভৌমিকের সঙ্গে বীণার বিবাহ হয়। তিনি বীণার সহকর্মী ছিলেন, বারো বছর তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়, পরবর্তী জীবনে সতীশচন্দ্র

অধ্যাপনার কাজ করেন। বীণা ও কমলা দাসগুপ্তার উপর দায়িত্ব এলো ইউনিভার্সিটি কনভেন্‌শনের সভায় বাংলার গভর্নরকে গুলী করতে হবে। এজন্য একটা রিভলবার চাই। কমলা এবং বীণাকে সুদক্ষ শিক্ষক দিনেশ মজুমদারের কাছে শরীর শিক্ষা প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা হোলো। ১৯৩২ সালে ৬-ই ফেব্রুয়ারী যখন রাজ্যপাল স্যার স্টেনলে জ্যাকস্‌ন কনভেনশনে বক্তব্য রাখছিলেন, বীণা উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে লক্ষ করে গুলি ছুড়লেন, । অল্পের জন্য তাঁর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হোলো। বীণা পুলিসের হাতে ধরা পড়লেন। তিনি যখন বিচারাধীন ছিলেন, তখন সারা জেলে একটা দারুণ উত্তেজনার বাতাস বয়ে গিয়েছিল, বিচারে তাঁর নয় বছর কারাদণ্ডের আদেশ হোলো। ১৯৩৯ সালে তিনি কারামুক্ত হন।

এরপর তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেলেন এবং ট্রেড ইউনিয়ন কার্য-ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন। দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির তিনি ছিলেন সম্পাদিকা। ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় তাঁকে তিন-বছর রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে আটক থাকতে হয়। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বিধানসভার সদস্যা নির্বাচিত হন। গান্ধীজীর অনুসরণকারী বীণা নোয়াখালির দাঙ্গায় দুর্গতদের জন্য পুনর্বাসনের কাজে যুক্ত হন। রাজনৈতিক কর্মধারার পাশাপাশি সমাজের সেবা তিনি করে গিয়েছেন সবসময়ই। চল্লিশের দশকে তিনি 'মন্দিরা' মাসিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন, এই পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন কমলাদাশগুপ্তা। পরবর্তী জীবনে বীণা আত্মজীবনী 'শৃঙ্খল ঝংকার'-এ প্রকাশ করেন। তিনি ছিলেন গণতন্ত্র ও সমাজবাদের ধারক। জাতপাতের গোঁড়ামি এবং অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ ছিল সর্বদাই সোচ্চার। ১৯৮৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর এই মহীয়সী নারী ভারতের মাটি থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেলেন মৃত্যুর পরপারে।

বাসন্তী দেবী

(১৮৮০—১৯৭৪)

১৯২০ সাল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তখন রাজনৈতিক আন্দোলনের একজন পুরোধা। নাগপুর কংগ্রেসে তিনি তাঁর বক্তব্যে ঘোষণা ক'রে এলেন যে, তিনি তাঁর ব্যারিস্টারী ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করবেন। একথা শুনে সকলেই স্তম্ভিত। বাংলাদেশের তাঁর সমস্ত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তাঁকে বাধা দিলেন, মাসিক কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকার আয় ছেড়ে দিয়ে একেবারে রিক্ত হয়ে যাওয়া তাঁর উচিত নয়। বড় সংসারের দায়িত্ব তাঁর উপর। তাছাড়া, কত দুঃখী, দরিদ্র, অনাথ-আতুরের সেবা ও উপকার করছেন তিনি সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে। এতগুলো নির্ভরশীল লোকেরই বা কী গতি হবে?

সকলে মিলে যখন দেশবন্ধুকে এইভাবে বাধা দিতে লাগলেন তখন তিনি কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর এই মানসিক দ্বন্দ্বের সময় তাঁর সহধর্মিণী বাসন্তীদেবী সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে দিলেন। বাসন্তীদেবী তাঁকে বললেন, "অর্থকে পৃথিবীর বড় সম্পদ ব'লে আমি মনে করি না। তোমার এই সংকল্পে আমিও তোমার পাশেই রয়েছি"। ভোগ-ঐশ্বর্যপূর্ণ সংসার একদিনের একটি সংকল্পেই যেন ফকিরের সংসারে পরিণত হোলো। সেদিন যদি দেশবন্ধুর পাশে তাঁর সহধর্মিণী বাসন্তীদেবী না থাকতেন এবং সকলের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজে একা স্বামীকে এভাবে প্রেরণা দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে উৎসাহ না দিতেন তবে তিনি আজ 'দেশবন্ধু' হতে পারতেন কিনা কে জানে।

দেশবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। স্ত্রীকেও টেনে নিলেন এ আন্দোলনের একজন অংশীদার হিসাবে। আজও ভারতবাসীর কাছে তাঁরা আপনার হয়ে আছে।

১৮৮০ সালের ২৩শে মার্চ বাসন্তীদেবী কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।

আসামের বিজনী এবং অভয়াপুরী স্টেটের দেওয়ান বরদানাথ হালদারের তিনি ছিলেন দ্বিতীয় সন্তান। ছেলেবেলার প্রথম দশ বছর তাঁর বিজনী এবং অভয়াপুরীতেই কাটে। এর পর বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য কলকাতায় আসেন এবং লরাটো হাউসে ভর্তি হন। ১৮৯৭ সালে ৩রা ডিসেম্বর ২২ বছরের যুবক চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। চিত্তরঞ্জন তখন সবেমাত্র ব্যারিস্টারী পেশার কাজ শুরু করেছেন। বাসন্তীদেবীর শ্বশুরবাড়ী ছিল বিরাট পরিবার। শ্বশুরবাড়ীর এই বিরাট পরিবারের দায়িত্ব তিনি হাসিমুখেই পালন করতে শুরু করলেন। ১৮৯৮ সালে তাঁদের প্রথম সন্তান হয়। দ্বিতীয় পুত্র সন্তান ১৮৯৯ সালে এবং ১৯০১ সালে সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সন্তান হয়।

১৯১৭ সালে চিত্তরঞ্জন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যেই বাসন্তীদেবী তাঁর স্বামীর শিক্ষায় শিক্ষিতা হয়েছিলেন। তাই রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে স্বামীকে তিনি সর্বদাই উৎসাহ এবং প্রেরণা যোগাতেন। ১৯২১ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে যখন অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হয়, তখনো বাংলার মেয়েরা ঐ আন্দোলনে যোগ দেয়নি। চরকার প্রচলন খুব কম। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি চিত্তরঞ্জন স্ত্রীকে বললেন, তাকে চরকা প্রচলনের কাজ করতে হবে এবং মেয়েদের এ কাজে নামাতে হবে। তখনকার দিনে মেয়েরা বাড়ীর বাইরে বেরুতেন না বললেই হয়, সুতরাং রাজনৈতিক কাজ করবার কথা মেয়েদের পক্ষে ভাবাই একটা আশ্চর্য ব্যাপার। মেয়েদের বাইরে নিয়ে আসবার এই কঠিন দায়িত্বের ভার পড়ল বাসন্তীদেবীর উপর। ১৯২১ সালের ১৮ই নভেম্বর গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবিকাবাহিনীকে বেআইনী এবং সভাসমিতিকে রাজদ্রোহমূলক বলে ঘোষণা করেন। এই অন্যায় আইন ভাঙবার জন্য দেশবন্ধু পরদিনই গান্ধীজীর কাছে গিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির অনুমতি নিয়ে এলেন। গান্ধীজী তখন বোম্বাইতে ছিলেন।

৬ই ডিসেম্বর একদল স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গে নিয়ে হরতাল ঘোষণা করতে বৌবাজার এবং কলেজ স্কোয়ারে গেলেন। কলেজ স্কোয়ারে একুশজন যুবকসহ চিত্তরঞ্জনকে পুলিস গেপ্তার করে। তাঁর ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। দেশবন্ধু কারাগারে।

বাসন্তীদেবী অসহযোগ আন্দোলনে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে এগিয়ে এলেন। দেশবন্ধুর গ্রেপ্তারের পর দিনই অর্থাৎ ৭ই ডিসেম্বর

বাসন্তীদেবী বেরিয়ে পড়লেন আইন অমান্য ও হরতাল ঘোষণা করতে। সঙ্গে ছিলেন দেশবন্ধুর সহোদরা ঊর্মিলা দেবী এবং নারী কর্মমন্দিরের সুনীতি দেবী। তাঁরা খাদি বস্ত্র ঘাড়ে নিয়ে বড়বাজার চললেন। হরতাল ঘোষণা করবার পরই পুলিশ তাঁদের তিনজনকে গেপ্তার করে। বাসন্তীদেবীরা গ্রেপ্তার হবার সঙ্গে সঙ্গে থানার সামনে জনতার ভীড় জমে গেল। বড়বাজারের বিরাট জনতাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কিছু প্রখ্যাত আইন-জীবীও বাসন্তীদেবীর গেপ্তারের জন্য তীব্র প্রতিবাদ করলেন। এর ফলে বাসন্তীদেবীকে মুক্তি দিতে হোলো। প্রায় রাত ১১টায় গভর্ণমেণ্ট বাসন্তীদেবীকে মুক্তি দিল। মুক্তি পাবার পর বাসন্তীদেবী তাঁর কাজের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মীর আসন লাভ করলেন খুব শীঘ্রই।

কিন্তু তাঁর মুক্তি পাবার দিন তিনেকের মধ্যে দেশবন্ধুকে গেপ্তার করা হোলো। ১০ই ডিসেম্বর দেশবন্ধু গেপ্তার হলেন। বাসন্তীবেীর দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। দেশবন্ধু "বাংলার কথা" নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। এখন এই পত্রিকার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়ল বাসন্তীদেবীর উপর। এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদে থেকেও জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে তিনি কখনই দূরে থাকেন নি। ঠাকুর পরিবার এইং অন্যান্য সুধীজনের সঙ্গে এ ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও তিনি রাখতেন। তিনি ছিলেন তাঁর স্বামীর অনুসরণ-কারী। স্বামীর শিক্ষাতেই শিক্ষিতা হয়েছিলেন তিনি, বহু কাজের মধ্যেও সামাজিক বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। স্বামীর বাণী বহনকারী হিসাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তিনি বক্তৃতা করেন— সে বাণী ছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনের বাণী। ১৯২২ সালে যখন, মৌলানা আজাদ, সুভাষচন্দ্র, দেশবন্ধু প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ গেপ্তার হয়ে জেলে বন্দী ছিলেন, সেই সময় এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে তিনি সভানেত্রী হন এবং দেশ-বন্ধুর নতুন কর্মপন্হার ইঙ্গিত দেন। দেশবন্ধু জীবিত থাকাকালীন তিনি তাঁর সঙ্গে প্রতিটি রাজনৈতিক কাজে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং ১৯২৫ পর্যন্ত তিনি দেশবন্ধুর পাশেই ছিলেন।

দার্জিলিং-এ ১৯২৫ সালে ১৬ই জুন তারিখে দেশবন্ধুর অকালমৃত্যু হয়। তখনও তিনি তাঁর পাশেই ছিলেন। এর পরের বছর ১৯২৬ সালে ২৬শে জুন তাঁর একমাত্র পুত্র চিররঞ্জনের অকালমৃত্যু হয়। জীবনে

এত বিপর্যয় তাঁকে কাতর করে দিয়েছিল। তাই তিনি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন সকলের অন্তরালে। রাজনৈতিক জীবন থেকে তিনি সরে দাঁড়ালেন। স্বামীর পাশে থেকে জাতীয় আন্দোলনে যিনি সক্রিয়ভাবে কাজ করে গিয়েছিলেন এতদিন, সে জীবন থেকে তাঁকে অবসর নিতে হোলো। রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর নিলেও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে চিরদিনই। জাতি বৈষম্য, হিন্দুদের প্রচলিত অন্যায় রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন সব সময়ই। তিনি তাঁর কন্যা অপর্ণাকে বিবাহ দেবার ব্যাপারে হিন্দুধর্মের চিরাচরিত প্রথাকে লঙ্ঘন করেই ভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাহ দেন। এমন কি দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত সামাজিক কার্যের প্রতিষ্ঠানকে তিনি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন স্বামীর মৃত্যুর পরেও। ১৯৭৪ সালের ৭ই মে তারিখে এই মহিয়সী নারীর জীবনাবসান হয় তাঁর কলকাতার বাড়ীতেই।

বিদ্যাগৌরী নীলকান্ত

(১৮৭৬—১৯৫৮)

বিদ্যাগৌরী নীলকান্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন কিনা, এ বিষয়ে কিছু মতবিরোধ থাকতে পারে। মূলতঃ তাঁকে সমাজসেবামূলক কাজের ক্ষেত্রেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা গিয়েছে। তাই অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তিনি কি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মঞ্চে পদক্ষেপ করেছিলেন। এসব প্রশ্নের উত্তরে একটা কথাই বলা যায় যে, বিদ্যাগৌরী যে সময়ে সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন সে সময়টি ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের। এই সময়ে একজন সমাজসেবী হিসাবে নিশ্চয়ই রাজনৈতিক সচেতনতা নিয়েই কাজ করতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর সম্বন্ধে আমরা যদি একটু এগিয়ে যাই, তবে দেখতে পাবো যে, তিনি একাধারে সমাজকল্যাণমূলক কাজের পাশা-পাশি মহিলাদের সংঘবদ্ধ করা এবং শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করবার কাজ করে গিয়েছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনে দেশের সমগ্র অধিবাসীকে আত্মসচেতন করে নিজেদের অধিকারকে বুঝে নিতে সাহয্য করার অর্থ কি এই নয় যে এই সচেতন অংশের মানুষরাই নিজেদের উপলব্ধির ভিত্তিতেই স্বাধীনতা সংগ্রামের ময়দানে আত্মদান করবেন। আর সেই কারণেই আজ আমরা বিদ্যাগৌরীকে নিশ্চয়ই স্মরণ করব। ১৮৭৬ সালে ১লা জুন, বিদ্যাগৌরী নীলকান্ত আমেদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গোপীলাল মনিলাল ধ্রুব সরকারী কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর মাতা বালবহেন ছিলেন ভোলানাথ সারাভাই-এর কন্যা, ভোলানাথ সারাভাই ছিলেন তদানীন্তন গুজরাটের একজন খ্যাতনামা সামাজিক এবং ধর্মীয় সংস্কারক। ১৮৮৯ সালে তেরো বছর বয়সে রমণভাই নীলকান্তর সঙ্গে বিদ্যাগৌরীর বিবাহ হয়। রমণভাই-এর পিতা মহীপাত্রম নীলকান্তও ছিলেন একজন খ্যাতনামা সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারক এবং ইনিই প্রথম গুজরাটী

যিনি বিদেশে গিয়েছিলেন। বিবাহের পরও বিদ্যাগৌরী পড়াশুনা চালিয়ে যেতে লাগলেন, ১৯০১ সালে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তিনিই প্রথম গুজরাটী মহিলা গ্রাজুয়েট। তিনি দর্শন বিষয়ে অনার্স নিয়ে পাশ করেন।

১৯০২ সালে তিনি ক্লাব স্থাপন করেন ; এই সময় থেকেই তিন সমাজ-সেবামূলক কাজের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। বিদ্যাগৌরী তাঁর জীবনের পঞ্চাশ বছরেরও বেশী সময় সমাজসেবা করে গিয়েছেন এবং আমেদাবাদে বলতে গেলে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৪ সালে তিনি 'মহিলা মণ্ডল' স্থাপন করেন। সর্বভারতীয় মহিলা সংসদের (All India Women's Council) তিনি ছিলেন সভাপতি, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৩২-৩৩ সালে তিনি সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলনের (All India Women's Conference) সভাপতি হন। ১৯৩৩ সালে বোম্বাইতে মহিলা শ্রমিকদের যে সম্মেলন হয়, (Women Labour Conference) সেখানে বিদ্যাগৌরী সভাপতিত্ব করেন। আমেদাবাদে হরিজন সেবক সংঘের তিনি সভাপতি ছিলেন, এছাড়া 'সংসার সুধা সমাজ' এবং 'প্রার্থনা সমাজ' সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের তিনি সভাপতি ছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যাগৌরী ছিলেন প্রচণ্ড আগ্রহী। আমেদাবাদের 'লালশঙ্কর উমাশঙ্কর কলেজ ফর ওম্যান' মহাবিদ্যালয়টি মহিলাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, বিদ্যাগৌরী এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যাদের মধ্যে একজন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি বেশ কিছুদিনের জন্য অধ্যাপনার কাজও করেন। এস, এন, ডি, টি, ওম্যান ইউনিভার-সিটির তিনি ছিলেন সিনেটের একজন সদস্যা। এছাড়া বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আট বছর সময়ের জন্য তিনি আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি স্কুল বোর্ডের সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। ভিক্টোরিয়া জুবিলী হাসপাতাল এবং মহিপত্রম রূপরাম অনাথ আশ্রমের তিনি ছিলেন অনারারী সেক্রেটারী। এছাড়া, বিভিন্ন সমাজকল্যাণ কেন্দ্রের সঙ্গেও বিদ্যাগৌরী যুক্ত ছিলেন। গুজরাটের ভারনাকুলার সোসাইটি, বর্তমানে যা গুজরাট বিদ্যাসভা নামে পরিচিত, এ সংস্থার সঙ্গেও তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল, সময়ের জন্য তিনি গুজরাট সাহিত্য সভার আমেদাবাদ

শাখার সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৪ সালে গুজরাট সাহিত্য পরিষদের সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন।

১৯১৯ সালে তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক এম, বি, ই, এবং ১৯২৫ সালে 'কৈশর-ই-হিন্দ' স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পান। ১৯৫৭ সালে তিনি এস, এন, ডি, টি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনারারী ডি. লিট্ পান। সমাজ-সংস্কার এবং নারী সমস্যার উপর বিদ্যাগৌরী বহু প্রবন্ধ লেখেন; এগুলির মধ্যে কিছু সংগ্রহ করে তিনটি পুস্তকে প্রকাশিত হয়—নারীকুঞ্জ (১৯৫৬ সালে), ফোরাম (১৯৫৫ সালে) এবং জনসুধা (১৯৫৭ সালে)। তিনি ছিলেন একজন অত্যুৎসাহী সমাজ সংস্কারক। সমাজের মানুষজনের পাশে থেকে তিনি সবসময় কাজ করে গিয়েছেন, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে, বিধবাবিবহা ও অসবর্ণ বিবাহের পক্ষে তাঁর কণ্ঠকে তিনি সোচ্চার করেছেন সবসময়ই। প্রার্থনা সমাজের একজন সদস্য হয়েও তিনি দেবদেবী পুজো অথবা পুরাণো সামাজিক প্রথা এবং কুসংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন না। স্বামীর মতো তিনিও রাজনৈতিক মতাদর্শের ব্যাপারে মাত্রাবদ্ধ বা মধ্যপন্থী ছিলেন অর্থাৎ গোঁড়া ছিলেন না; কিন্তু ১৯১৯ সালে আমেদাবাদে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ মিছিল হয় সেখানে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি তাঁর কৈশর-ই-'হিন্দ' সম্মান প্রত্যাখ্যান করেন এবং মিউনিসিপ্যালিটির মনোনীত পদ থেকে পদত্যাগ করেন, উদ্দেশ্য ছিল সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসাবে তিনি মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হন। স্বভাবের দিক দিয়ে বিদ্যাগৌরী নীলকান্ত ছিলেন শান্ত, ব্যক্তিত্বপূর্ণ এবং স্বীয় অন্তর মুখী। পোষাকে, বাহ্যদৃশ্যতায় এবং স্বভাবে তিনি ছিলেন সাদাসিধা, আড়ম্বরহীন। তাঁর দয়ালুতা এবং মহত্বের জন্য তিনি ছিলেন সুপরিচিত এবং এমন কেউ ছিল না যে তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে এসে শূন্য হাতে ফিরেছেন। তাঁর নম্রতা এবং সরলতার দ্বারা গুজরাটের বহু মেয়েকে উচ্চশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছেন তিনি। অর্ধশতক ধরে তিনি আমেদাবাদে সমাজসেবা করে গিয়েছেন। তাঁর ষাট বছরের জন্মদিনে গান্ধীজী তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, "নারীদের মধ্যে একটি রত্ন'। ১৯৫৮ সলে তিনি পরোলোক গমন করেন, মৃত্যু এ জগৎ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলো এক আমরণ সমাজসেবীকে; তিনি শুধু বেঁচে রইলেন তাঁর কর্মমুখর অতীত স্মৃতির মধ্য দিয়ে।

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

(১৯০০—   )

ঊনবিংশ শতাব্দী ভারতের মাটিতে বহন করে নিয়ে এসেছিল সাহিত্য সংস্কৃতি, সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠ, দেশপ্রেম প্রভৃতি সমৃদ্ধির জোয়ার। এর প্রতিফলন কিন্তু অক্ষুণ্ণ রয়েছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও ; বিশেষ করে ভারতমাতা তাঁর পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হবার পরও কিছুকাল। ভারতমাতাও তাঁকে শৃঙ্খলমুক্ত করবার জন্য তাঁরই বক্ষে স্থান দিয়েছিলেন বহু মনীষী, দেশপ্রেমীদের যাঁরা আজও আমাদের ভারতবাসীর কাছে শ্রদ্ধেয়। মহিলারাও পিছিয়ে ছিলেন না ; সংখ্যায় কম হলেও তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন দেশমাতৃকার কাজে, তাঁদের পূর্ণ উদ্যম নিয়ে নেতৃত্ব দিতে। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ছিলেন এদের মধ্যে একজন।

এলাহাবাদের আনন্দভবনে ১৯০০ সালের ১৮ই-আগষ্ট বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী রুপোর চামচ মুখে নিয়ে। তিনি ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর ছোট বোন। ছেলে বেলায় সরূপ এই নামে পরিচিতি নিয়ে, মায়ের কাছ থেকে পাওয়া অফুরন্ত বাহ্যিক সৌন্দর্য্য নিয়ে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত পৃথিবীতে এসেছিলেন মতিলাল নেহেরুর কন্যা হয়ে। খ্যাতি এবং সমৃদ্ধির শিখরে অবস্থানকারী মতিলাল নেহেরু তখন পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে সমান তালে তাল রেখে চলছেন। সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও তাঁর প্রতিবাদের কণ্ঠ সোচ্চার হয়েছে। তাঁরা ছিলেন তিন ভাই বোন—জওহরলাল, বিজয় লক্ষ্মী এবং কৃষ্ণা। এঁদের তিন ভাই বোনকে মিস হুপার নামে একজন গভর্নেসের তত্ত্বাবধানে থাকতে হোতো।

বিজয়লক্ষ্মী তাঁর গভর্নেসের কাছে খুব যত্ন নিয়েই শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তাঁকে কোনোদিনও সময় বেঁধে কাজ করতে দেখা যেতো না।

সরূপ কখনো স্কুলে যেতেন না, বাড়ীর সব পড়াও করতেন না সব সময়। ১৯২১ সালে এলাহাবাদের রঞ্জিত সীতারাম পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিজয়লক্ষ্মীর সাহিত্য প্রতিভা বিবাহের পূর্বেই ছড়িয়ে পড়েছিল ; এমনকি তাঁর মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত 'এট দা ফিট অব দা গুরু' (At the feet of the Guru) প্রবন্ধটি পাঠ করে রঞ্জিত সীতারাম পণ্ডিত তাঁর সাহিত্যের প্রতি বিবাহের পূর্বেই আকৃষ্ট হন এবং পরবর্তী সময়ে গান্ধীজীর সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই-এর সহযোগিতায় তাঁরা দু'জন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন।

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি সামাজিক কুসংস্কারের গোঁড়ামির প্রতিও ভ্রূকুটি করতেন এবং এর বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদের কণ্ঠকে সোচ্চার করতেন। তিনি যখন যুবতী, তখন থেকেই তাঁর বাবা এবং বড়ভায়ের মতো ধর্মীয় কুসংস্কারের গোঁড়ামিকে তিনি অপছন্দ করতেন। মতিলাল এবং জওহরলাল, এঁরা দুজনেই ছিলেন উদারপন্থী তবে তাঁরা কেউই ধর্মের বিরুদ্ধে ছিলেন না। এর ফলে বিজয়লক্ষ্মীর মনেও এ ব্যাপারে একটা ধারণা জন্মে যায়। পুরুষ-নারী সমানাধিকারের পক্ষে, নারী শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁকে বিভিন্ন সময় তাই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা গিয়েছে। পরবর্তী জীবনে এই ব্যক্তিত্বপূর্ণ মহিলাকে আমরা দেখতে পাই প্রথম মহিলা আন্তর্জাতিক সংযোগকারী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে ; জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকেই তিনি কাজে লাগিয়েছেন, ছড়িয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজে। পরিপক্ক বয়সে তাঁকে আমরা তাই দেখেছি সাংবাদিকের টেবিলে, ব্রিটিশ শাসনের সময় ভারতের একজন মন্ত্রী হিসেবে এবং ইউ এন ও-র চেয়ার ম্যান হিসাবে।

বিজয়লক্ষ্মী জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে সবসময়ই ঘনিষ্ঠ ছিলেন ; তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "Out of many good things fate gave me at my birth one of the best was surely my elder brother. To have known him and loved him and been so near to him would have been ample jusification for having been born."

বিজয়লক্ষ্মীর কার্যকলাপের শুরুতে যে ব্যক্তিত্ব তাঁকে প্রভাবিত করেছিল, তিনি হলেন সরোজিনী নাইডু, যিনি ১৯৪৭ সালের আগে নারীদের মধ্যে একজন বিশেষ স্থানের অধিকারিণী। এছাড়া, ঝাঁসীর

রাণী লক্ষ্মীবাঈ এর ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণের কথাও তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। নেহেরু পরিবার হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান সবধর্মীয় উৎসবকেই অভিনন্দন জানাতো। বিজয়লক্ষ্মী নিজেও মিস হপারের সঙ্গে গীর্জাতে গিয়েছিলেন। এর ফলে সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা জন্মেছিল তাঁর ; গীতা, রামায়ণ গ্রন্থ দু'খানিও তাঁর মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে ; প্রতিমাসের ২৭-তারিখ নির্দিষ্ট দিনটিতে তিনি তাঁর গৃহে প্রার্থনা করতেন, অবশ্য জওহরলালের মৃত্যুর পর তা তিনি বন্ধ করে দেন।

তিনি জাতিগত প্রথায় বিশ্বাসী ছিলেন না। সমাজের বন্ধনে যা ছিল প্রগতিশীল মতামতের পরিপন্থী সেই সবকে উপেক্ষা করে জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে তাঁকেও কুসংস্কার-মুক্ত আধুনিকতার পথের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে। বিজয়লক্ষ্মী তার তিন কন্যাকেই (চন্দ্রলেখা, নয়নতারা, রীতা) ১৯৪৩ সালে বিদেশে শিক্ষাগ্রহণের জন্য পাঠান।

বিভিন্ন বিষয়ে বিজলক্ষ্মীর মতামতের কিছু বক্তব্য সংক্ষেপে দেওয়া হোলো—

'আমাদের নিজের দেশের স্বার্থেই আমাদের একত্রিত হবার প্রয়োজন আছে দেশের ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হবার জন্য, আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের কেহই সাহায্য করবে না, কারণ ·····ভারতবর্ষ পরাধীন বা মৃত হলে কে বাঁচবে, যদি ভারতবর্ষ বেঁচে থাকে তবে কে মরবে ?'

'বর্তমানে পৃথিবী দুই জাতিতে বিভক্ত হয়ে আছে, যারা নিপীড়িত হচ্ছেন এবং যারা নিপীড়ন করছেন। এটা খুব দুঃখের বিষয় যে, সভ্যতার এইক্ষণে মানুষ তাদের একে অপরের দুঃখ সম্বন্ধে সচেতন নয়।'

সাংবাদিকতার কাজ করতে গিয়ে বিজয়লক্ষ্মীকে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি ছিলেন 'ইনডিপেণ্ডডেণ্ট' পত্রিকার সাংবাদিকতার একটি ডেস্কের অধিকারী। এইজন্য তাঁকে প্রেসের কাছ থেকে হয়রানি হতে হয়েছিল এবং তাঁকে বিভিন্ন মন্তব্যও শুনতে হয়েছিল। প্রেস তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিল, 'ইহা আমার মতামত যে, বর্তমান যুগে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মারাত্মক বস্তু হোলো টেলিফোন এবং সাংবাদিকরা,—যদিও টেলিফোন মাঝে মাঝে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারে—কিন্তু সাংবাদিক কখনই তা করে না।'

তার প্রকাশনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'দি ইভ্যালুয়েশন অব ইণ্ডিয়া'

(১৯৫৮) ; 'সো আই বিকেম এ মিনিস্টার' (১৯৩৯) ; 'প্রিসনার ডেস্ক্' (১৯৪৬) ; 'রোল অব ওম্যান ইন দি মর্ডাণ ওয়ার্ল্ড' (১৯৫৭)।

১৯১৫ সালে তিনি তাঁর বাবা মতিলাল নেহেরুর সঙ্গে বোম্বাইতে কংগ্রেস সম্মেলনে যান এবং এইপ্রথম সেখান থেকে আন্দোলনের একটি সুন্দর সুদৃঢ় ধারণা নিয়ে ফিরে আসেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন এ সম্মেলনে ; তাঁদের প্রত্যেকের পরনে ছিল একই ধরনের পোষাক যা অনুষ্ঠানের শ্রী বৃদ্ধি করেছিল। ১৯১৯ সালে গান্ধীজী এলেন এলাহাবাদে, এখানে তিনি আনন্দ ভবনে ছিলেন। এখানে থাকাকালীন তাঁর মনমুগ্ধকর আলোচনা বিজয়লক্ষ্মীকে রাজনীতির দিকে সম্পূর্ণভাবে আকর্ষণ করল। তিনি গান্ধীজীর পাশে এসে দাঁড়ালেন অসহযোগ আন্দোলনের একজন অহিংস সৈনিক হিসাবে। এই বছরই পিতা মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অমৃতসর কংগ্রেস অধিবেশনে পিতার সঙ্গে তিনি যোগ দেন। ১৯২৯ সালে জওহরলাল নেহেরু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন ; এই দিনটিও তাঁর কাছে একটি বিশেষ অনুপ্রেরণার দিন হিসাবে কাজ করেছিল। ভাইয়ের পদমর্যাদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনিও আরো সক্রিয় অংশগ্রহণের কাজে এগিয়ে এলেন।

উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দেওয়া, ধর্মঘট সংঘটিত করা, মিছিল পরিচালনা করা, ইত্যাদি কাজের মধ্যে তাঁকে দেখা যেতে লাগল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। ১৯৩২ সালের ২৭-শে জানুয়ারী এজন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হোলো, বিচারে জরিমানা সমেত তাঁর একবছরের জেল হোলো। ১৯৩৬ সালে কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নির্বাচনে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে, এবং সফলতাও লাভ করে। উত্তরপ্রদেশেও তাদের জয় হয় ; বিজয়লক্ষ্মী কানপুরের বিলহোর গ্রামের নির্বাচন কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন। ১৯৩৭ সালের ২৯-শে জুলাই তিনি বিধান সভায় মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন।

১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন বৃটেন এ-যুদ্ধে ভারতের অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে কংগ্রেস মন্ত্রীরা সকলেই পদত্যাগ করেন। মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে বিজয়লক্ষ্মীকে কারাবরণ করতে হয়। ১৯৪০ সালের ৯-ই ডিসেম্বর তিনি গ্রেপ্তার হন। বিচার অনুযায়ী চারমাসের জন্য তাঁকে কারাবরণ

করতে হয়। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে ভারত-ছাড় আন্দোলন শুরু হয়। এই মাসেই ১২ তারিখে আন্দোলনের প্রথম সারির কর্মীদের মধ্যে বিজয়লক্ষ্মীকেও গেপ্তার করা হয়; নয় মাস পরে অসুস্থতার কারণে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। জেল থেকে বেরিয়েও তাঁর শরীরের অসুস্থতার তেমন কোনো পরিবর্তন হোলো না; তা সত্ত্বেও তিনি ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের ত্রাণ কাজে নেমে পড়লেন। এ কাজের পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁকে গ্রহণ করতে হোলো, এবং তিনি তা সানন্দেই মেনে নিলেন। শারীরিক দুর্বলতার পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে যেতে লাগল; এ ছাড়া, মানসিক দিক দিয়েও তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এই সময় তাঁর জীবনে পারিবারিক ক্ষেত্রে আর একটি বিপর্যয় নেমে এলো, তাঁর স্বামী আর এস পণ্ডিত মারা গেলেন। ১৯৪৪ সালের ১৪-ই জানুয়ারী তাঁর জীবনে বৈধব্য নেমে এলো, এ অবস্থায় শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে একেবারে শেষ অবস্থায় এসে দাঁড়ালেন তিনি।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস পার্টিকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হোলো এবং সংগঠনের কাজকর্ম প্রকাশ্যে বন্ধ করা হোলো। বিজয়লক্ষ্মী কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্ব হিসাবে বিধানসভায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালের পর, তিনি ১৯৪৬ সালে পুনরায় উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় নির্বাচিত হন। সরকারের জনস্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে তিনি তাঁর প্রচেষ্টাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হন; পঞ্চায়েত রাজ বিলটি অনুমোদনের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দক্ষতার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করে কাজের সফলতা আনতে সক্ষম হন। বিধানসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও তিনি আরো বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত তিনি সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলনের (All India Women's Conference) সভাপতি ছিলেন। শান্তি ও স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে গঠিত আন্তর্জাতিক মহিলা লীগের Woman International League) তিনি ছিলেন সহ-সভাপতি। ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে ভার্জিনিয়ার (U.S.A.) হর্টস্প্রিং-এ বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে সম্মেলন হয়, সেখানে তিনি যোগদান করেন। এ ছাড়া ভারতের সঙ্গে বিশ্ব সম্পর্কের উদ্দেশ্যে গঠিত সংস্থা ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব্ ওয়ার্ল্ড এ্যাফেয়ার্সের সম্মেলনে তিনি

তিনি ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেত্রী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

সানফ্রানসিসকোতে সম্মেলিত জাতিপুঞ্জের প্রথম সম্মেলনে যোগ দিয়ে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির মনোজ্ঞ বক্তৃতায় সঙ্গে সমতা রেখে, তিনি ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বক্তব্য রাখেন, যা তাঁকে একজন সঠিক ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের পরিচয় অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ করেছিল। ভারতে ফিরে এলে ভারতের মানুষ তাঁকে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সম্মানে ভূষিত করেন। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পরও তিনি এ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৬ সাল, ১৯৪৭ সাল এবং ১৯৬৩ সাল, এ বছর গুলির জন্য তিনি সম্মিলিত জাতি পুঞ্জে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত তিনি U. S. S. R -এ, ১৯৪৯ সালে থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত U. S. A এবং ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত মেক্সিকোতে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬১ সাল, সময়ের জন্য তিনি ইংল্যাণ্ডে একই সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রদূত এবং ভারতের হাইকমিশনার পদে কাজ করেন।

পরপর ১৯৫২ সালে এবং ১৯৬৪ সালে তিনি লোকসভার সদস্যা নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল, তিনি মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত ছিলেন। বহির্ভারতে বহু সম্মানিত পদে সম্মান এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্য পুরস্কৃত হওয়া ছাড়াও তিনি ষোলটি ডক্টরেটের সম্মানে সম্মানিত হন; এতগুলি ডক্টরেটের সম্মান তিনি ভারতের এবং বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে লাভ করেন। ইংরেজী এবং হিন্দিভাষায় বক্তব্য রাখবার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। একজন সংসদ সদস্যা হিসাবে এবং প্রশাসক হিসাবেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। উত্তরপ্রদেশের বিধানসভায় অস্পৃশ্যতা বিষয়ক আলোচনায় কংগ্রেসের কি করণীয় আছে, প্রশ্ন উঠলে, তিনি তাঁর উত্তরে বলেন, "Congress has removed the Achhut word from the vocabulary."

স্বাধীনতালাভের জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ভারত মাতা তাঁর শৃংখল মুক্ত হলেন, কিন্তু স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের রাজনীতি সম্বন্ধে বিজয়লক্ষ্মীর মতামত ক্রমশঃ প্রতিকূল পথে চলতে লাগল, কংগ্রেস সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ক্রমশঃ খারাপ হোতে লাগল। এরজন্য স্বাধীন সরকারের সুনজরেও তিনি পড়লেন না। মোরারজী দেশাই, জগজীবন

রাম, কৃষ্ণমেনন প্রমুখ নেতৃবর্গ তাঁর খুব কাছের লোক ছিল।

বিদেশে ভ্রমণের ক্ষেত্রে তিনি বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন; যুবতী অবস্থা থেকেই তিনি বিদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। ১৯০৫ সালে জওহরলাল নেহেরু যখন হ্যারোতে ভর্তি হন, তখন বিজয়-লক্ষ্মী বাবা-মার সঙ্গে ইংল্যাণ্ড এবং জার্মানীতে যান। ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে বিজয়লক্ষ্মী রঞ্জিত সীতারাম পণ্ডিতের সঙ্গে ইউরোপে যান। ১৯৩৮ সালে উত্তরপ্রদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি ইংল্যাণ্ডে যান। ১৯৬৫ সালে প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে তিনি ফ্রান্স, হল্যাণ্ড এবং জার্মানীতে যান। এর কিছুদিন পর তিনি লোকসভা থেকে অবসর নিয়ে U. S. A.-তে ভ্রাম্যমান বক্তা হিসাবে যান।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন সমাজ-কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন, এগুলি হোলো, গ্রামে গ্রামে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা, শিশুদের জন্য দুধের ব্যবস্থা করা, গ্রামের ছেলেরা যাতে খেলাধুলার ব্যাপারে আগ্রহী এবং সুযোগ পায় সেজন্য খেলার মাঠ এবং দৌড়ের মাঠ তৈরী করা প্রভৃতি। তিনি এগুলির পরিকল্পনা নেন এবং কার্যকরীরূপও দেন। উত্তরপ্রদেশের প্রথম মহিলা স্বাস্থ্য মন্ত্রী পদে আসীন হবার পর তিনি গ্রামে গ্রামে মেলা, বাজার, প্রদর্শনী প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণের পরিকল্পনা করেন এবং তার কার্যকরী রূপও দেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তাঁর কথায় এবং কাজে ভারতের একজন আদর্শ এবং দৃঢ়চেতা নারী যিনি একাধারে দেশপ্রেমিক এবং সমাজসেবী হিসাবে পরিচিত হবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারিণী।

বি আম্মা বেগম

স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ারে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভারতের নারীরা দেশের মুক্তি সংগ্রামে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। গর্বোদ্ভাসিত আননে কারাবরণ করে ভারতের গৃহলক্ষ্মীরা তাঁদের কল্যাণ স্পর্শে কারাগারকে মন্দিরে পরিণত করেছিলেন। শুধু হিন্দু নারীরা নয়, একান্ত পর্দানশীন মুসলমান নারীও তাঁর পর্দা উন্মোচন করে জয়যাত্রায় পুরুষের পথের সাথী, কারাগারের সাথী হয়েছিলেন। ভারতের এই নারী জাগরণের সফলতার প্রথম প্রেরণাদানের সাহায্যকারীদের মধ্যে যাঁর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে তিনি একজন মুসলমান নারী; অগণিত হিন্দু-মুসলমান রমণীকে ঘর থেকে বাইরে বার করবার জন্য অন্যতম প্রেরণাদানকারী এই মুসলমান নারী; নাম বি আম্মা বেগম।

বি আম্মা বেগম ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের চোখে জননীর মতো। এই মহিয়সী নারী সমস্ত ভারতবাসীকে নিজের সন্তানদ্বয় শওকৎ আলী ও মোহম্মদ আলীর মত দেখতেন বলেই ভারতবাসীর কাছে তিনি জননী; বি আম্মা বেগম তাঁর নাম নয়, উপাধি। ভারতবাসীর কাছে তিনি এই নামেই পরিচিত। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে এই নারীর প্রেরণা ছিল যথেষ্ট; গান্ধীজী স্বয়ং এই মহিয়সী নারীর স্নেহপুষ্ট। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধিতা যখন তুঙ্গে, তখন এই তেজস্বী মুসলমান রমণী যুগ যুগ সঞ্চিত লোকাচার, সমাজের সমস্ত প্রতিবাদ ও প্রতিবন্ধক দূরে ঠেলে ফেলে, পর্দা বিমুক্ত হয়ে নিজের দুই সিংহতুল্য সন্তানকে স্বহস্তে স্বাধীনতার সংগ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের এক জীবন্ত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন।

বি আম্মা বেগম এক অতি সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ নবাব শ্যামসুদ্দীন মোগল দরবারের

সর্বশেষ উজীরদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় বি আম্মা বেগমের বয়স পাঁচ কি ছয় ছিল। তাঁর শৈশবকে ঘিরে সিপাহী বিদ্রোহের সমস্ত ঘটনা ঘটে; বিদ্রোহে তাঁর পরিবার বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। বিদ্রোহের পর রামপুরের নবাবের কাছ থেকে তাঁরা বৃহৎ জায়গীর উপহার পান। তাঁদের সম্পত্তির সঙ্গে এই বৃহৎ জায়গীর যুক্ত হবার ফলে তাঁরা প্রভূত সম্পত্তির মালিক হন এবং তদানীন্তন সময়ের একজন বিশেষ ধনী পরিবার বলে গণ্য হতেন। পরবর্তীকালে, আলী ভ্রাতৃদ্বয় অর্থাৎ বি আম্মা বেগমের পুত্রদ্বয় যখন খিলাফৎ আন্দোলন প্রবর্তন করেন এবং মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন, রামপুরের নবাব তখন তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন।

১৮৮০ সালে বি আম্মার স্বামী বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন; বি আম্মার বয়স তখন মাত্র আটাশ বছর। নাবালক পুত্রদ্বয়কে নিয়ে তিনি অসুবিধার মধ্যে পড়েও সংসার দেখতে লাগলেন এবং নানান গণ্ডগোলের সম্মুখীন হয়ে নানাদিক থেকে বিপর্যস্ত হতে লাগলেন। কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের কাজ করতে থাকেন। এই সময় ইংরেজী শিক্ষা, সমাজে বিশেষ করে মুসলমানদের কাছে পরিত্যাজ্য ছিল। ইংরেজী শিক্ষালাভ করাকে তাঁরা পাপ বলে মনে করতেন এবং কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে যদি ইংরেজী শিখবার চেষ্টা করত, তবে সমাজের চোখে সেই বংশ অত্যন্ত হেয় বলে প্রতিপণ্য হোতো। এই অবস্থার মধ্যে বি আম্মা বেগম তাঁর দুই পুত্রকে ইংরেজী শিক্ষা দেবার জন্য মনস্থ করলেন এবং সকলের তাচ্ছিল্য মাথায় পেতে নিয়ে দুই পুত্রকে প্রথমে বেরিলী এবং পরে আলীগড় কলেজে শিক্ষাগ্রহণের জন্য ভর্তি করেন।

ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে রামপুরে সেই সময় লোকেরা কি ধারণা পোষণ করত, সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মৌলানা মহম্মদ আলী এক জায়গায় বলেছেন, "আমাদের ছেলেবেলায় রামপুরে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। এক মুসলমান ভদ্রলোকের কাছে একখানি টেলিগ্রাম আসে। গ্রামের মুরুব্বীরা একজোট হয়ে প্রথমে ঠিক-ই করতে পারলেন না যে ব্যাপারখানা কি; এখানে কি আছে তাই বা কেমন করে জানা যায়? কেউ-ই তো ইংরেজী জানে না। অবশেষে, আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোক আমাদের নাম করে বললেন, ওদের কাছে নিয়ে গেলেই বোঝা যাবে—ছেলে দু'টো ইংরেজী পড়ছে। এই সংবাদ শোনামাত্র সেই ভদ্রলোক

চিৎকার করে বলে উঠলেন, কি বল হে, তারা যে ভদ্র ঘরের ছেলে, তারা কেন ইংরেজী শিখবে ? —আমরা ভদ্রলোক হোলেও রামপুরের বুকে বসেই ইংরেজী শিক্ষা করতাম।"

বি আম্মা বেগম তাঁর পুত্রদ্বয়কে দুই সিংহ শিশু করে গড়ে তোলেন। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় যখন আলী ভ্রাতৃদ্বয় ভারতের মুসলমানদের একতাবদ্ধ করছিলেন, সেই সময় পুত্রদের সঙ্গে জননীও সংগ্রামে নেমে এসেছিলেন এবং ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়িয়েছেন। আলী ভ্রাতৃদ্বয় একবার চিন্দওয়ারার মামলায়, আর একবার করাচীর মামলায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন ; আলী জননী হাসিমুখে পুত্রদের কারাগারে পাঠালেন। যখন তিনি শুনলেন যে, কারাগারের মধ্যে তার পুত্রদ্বয়ের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসার কথা হচ্ছে, তখন এই বীরনারী বলেছিলেন, 'যদি তাঁরা কোনো অসম্মানজনক শর্তে নিজেদের মুক্তি ক্রয় করে, তবে এই বাহুতে দু'জনকেই পিষে মেরে ফেলবার শক্তি আমার এখনও আছে'।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে তিনি পরিপূর্ণভাবে যোগ দেন এবং মহাত্মাজীকে নিজের পুত্রদের মতো স্নেহ করতেন। হিন্দু-মুসলমানদের মিলন সাধনে, এই নারী পরিণত বার্দ্ধক্যেও পুনরায় ভারতের নানান স্থানে তাঁর অগ্নিময় বাণী ছড়িয়ে বেড়ান। ১৯২১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর এক সভায় তিনি বলেন, 'আজ আমি আমার মাথার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেছি। আমি মনে করি, সভায় যাঁরা উপস্থিত হয়েছে, তারা সকলেই আমার মহম্মদ ও শওকতের ন্যায় পুত্র সদৃশ। আমি চাই আমার সন্তানেরা যেন একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কাউকেও ভয় না করে। কারাগার, ফাঁসীকাঠ তো তুচ্ছ। দুই পুত্র কারারুদ্ধ, কিন্তু আমার কোটী কোটী পুত্র আমার চারিদিকে।'

পরবর্তকালে আলী ভ্রাতৃদ্বয় যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেন তখন বি আম্মা বেগম জীবিত ছিলেন না, তিনি থাকলে একাজ করা তাদের পক্ষে কখনই সম্ভব হোতো না। ভারতের নারীশক্তির মূলে তিনি যে একদিন প্রেরণা সঞ্চার করে গিয়েছেন, পরবর্তীকালে তা ভারতের দিকে দিকে নারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। বি আম্মা বেগমের জন্ম ও মৃত্যু কোনো তারিখই আমার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হোলো না। এজন্য আমি দুঃখিত।

ভগিনী নিবেদিতা

(১৮৬৭—১৯১১)

শাশ্বত ভারতের প্রাণময় বাণীকে বহন করে নবযুগের ভাব-ভগীরথ স্বামী বিবেকানন্দ যেদিন ইংলণ্ডে উপস্থিত হন, সেদিন আয়ারল্যাণ্ডের এক দুহিতা সেই নিবেদিত সূর্যের অমিত বিরণের দিকে চেয়ে, পুরাকালের তাপস রমণীদের মত সেই মহাদ্যুতির অর্ঘস্বরূপ আপনাকে নিবেদন করেন ; সেইদিন থেকে এই নারী ধ্যানে, জ্ঞানে, ব্যবহারে, চিন্তায়, স্বপ্নে আপনাকে বিবেকানন্দের মধ্যে এবং বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া ভারত-বর্ষের শাশ্বত সত্তার মধ্যে বিলুপ্ত করে দেন। বিংশ শতাব্দীর জনারণ্যের মধ্যে এই তপস্যাসুন্দর নিঃশব্দ আত্মসমর্পনের কাহিনী মানবের চিত্তাকাশে প্রভাতী তারার মতো অনাদিকালের অমৃত আশ্বাস বহন করে চিরদিন বিরাজ করবে।

নিবেদিতা কোনো নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেননি, কোনো বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়েননি, ইতিহাসখ্যাত বীর রমণীদের মতো কোনো সংগ্রামে লিপ্ত হননি, বিংশশতাব্দীর সহস্রমুখ সংবাদপত্রে নিত্যপ্রচারিত হবার মতো কোনো ঘটনার সঙ্গে তাঁর নাম বিজড়িতও নয় ; কলকাতার এক নগণ্য পল্লীর এক সামান্য ভাঙ্গা বাড়ীতে কতকগুলি অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাদের মধ্যে তাঁর জীবন নদী নিঃশব্দে প্রবাহিত হ'য়ে গিয়েছে। প্রান্তরবাহিনী নিঃশব্দ নদীর ক্ষীণ জলধারা যেমন তার নিঃশব্দ উদয়ের ছন্দে প্রবাহিত হয়, নিঃশব্দে সূর্যকিরণ কখন তার সমস্ত অন্তরকে রঞ্জিত করে যায়, তার খবর যেমন কেহই রাখেনা,—তেমনি নিবেদিতার জীবনধারা লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনার ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে অন্তরের অনির্বচনীয়তায় আপনি পরিপূর্ণ হয়ে বয়ে চলে। এই নিঃশব্দ তপস্যাই এক মহাসাধনার প্রতীকরূপে আজ আমাদের সম্মুখে রয়েছে। ইহাই তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

নিবেদিতার কর্মজীবনের প্রথম পরিচয় বাগবাজারের একটি সামান্য বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালিকা হিসাবে। ঐ বিদ্যালয়ের বাড়ীভাড়া প্রত্যেকমাসে জোগাতে তাঁকে অসীম কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। এছাড়াও তাঁর আর একটি পরিচয় আমরা তাঁর পরবর্তী জীবনে পেয়েছিলাম। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে দীক্ষিত তিনি জগৎকে দিয়ে গিয়েছেন তপস্যা-পূত তাঁর জীবনকে। মহাকাব্যের মত এক বৃহৎ ভাবরসের মতো তাহাই অনাগত বহুমানবের চিত্তে নব নব শক্তি ও কর্মপ্রেরণা জোগাবে। অনেকে কাব্য রচনা করে ধন্য হয়, কেউ কেউ আপনার জীবনকেই মহাকাব্য রূপে রচনা করে। সৃষ্টির এই দুই ধারাই মানব ইতিহাসকে ঐশ্বর্য্যশালিনী করে তোলে। নিবেদিতা শেষোক্ত ধারায় মানব ইতিহাসের ভাণ্ডারে আপনার জীবন-মহাকাব্য দিয়ে একটি মহামূল্য সম্পদ সঞ্চিত করে রেখে গিয়েছেন।

নিবেদিতার পিতৃদত্ত নাম কুমারী মার্গারেট নোবেল ; তাঁর পিতা ছিলেন স্কটল্যাণ্ডবাসী, মাতা আয়ারল্যাণ্ডের মেয়ে, মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল ১৮৬৭ সালের ২৮শে অক্টোবর, আয়ারল্যান্ডের তাইরোন প্রদেশের দুপগনেপে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সামুয়েল রিচমণ্ড এবং মাতা মেরী ইসাবেলের তিনি প্রথম কন্যা। নিবেদিতা অর্থাৎ মার্গারেট ছিলেন নোবেল পরিবারের মেয়ে তাঁদের এই নোবেল পরিবার পাঁচশত বছর ধরে আয়ারল্যাণ্ডে বসবাস করতো। মার্গারেটের দাদু ছিলেন উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের ওয়েসলিয়ন চার্চের একজন ধর্মযাজক। তাঁর মায়ের বাবা রিচার্ড হ্যামিলটন ছিলেন আয়ারল্যাণ্ড স্বায়ত্ব শাসন আন্দোলনের (হোমরুল মুভমেন্ট) অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একজন।

স্যামুয়েল রিচমণ্ড অর্থাৎ মার্গারেটের পিতা ছিলেন ওয়েলিয়ন গীর্জার একজন অধ্যাত্মবাদের ছাত্র, তিনি ডিভনসায়ারে কাজ করতেন। মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর মার্গারেটের মা মেরী ইসাবেল সন্তানদের নিয়ে একা হয়ে পড়েন। মার্গারেটের শিক্ষালাভ হয়েছিল হ্যালিফ্যাক্স কলেজে। শৈশব থেকেই মার্গারেট অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন এবং কৈশোরেই তিনি তিনটি ভাষা আয়ত্ত করেন। তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় যৌবনের প্রারম্ভেই লণ্ডনের শিক্ষিত মহলে ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেকেই ভেবেছিলেন ইংল্যাণ্ডের কীর্তির ভাণ্ডার এই নারীর কীর্তির এক বড় অংশ দ্বারা পূর্ণ হবে। ১৮৮৪ সালে তিনি কেসউইকে শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন,

কিন্তু কর্মজীবনেও তাঁকে বেশ কয়েকবার স্থান পরিবর্তন করতে দেখা গিয়েছে। ১৮৮৬ সালে রেক্সহাম শহরে এবং ১৮৮৯ সালে চেস্টারে তিনি শিক্ষকতা করেন।

১৮৯২ সালে ইংল্যাণ্ডের নতুন শিক্ষাপদ্ধতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে তিনি উইমব্লেডনে 'রাসকিন স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এর ফলে তাঁর প্রতিভার দীপ্তি লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত পরিবারদের জন্য যে সিসেম ক্লাব, সেখানে ছড়িয়ে পড়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই মার্গারেটের মধ্যে খৃস্টান ধর্মের প্রভাব পড়েছিল; কিন্তু ১৮৯৫ সালে যেদিন স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনে পৌঁছান, এবং ধর্মসভায় বক্তৃতা দেন, সেদিন থেকেই তিনি স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হন। সত্যের সন্ধানে তিনি ছুটে যান স্বামীজীর কাছে। পরম দেবতার আহ্বানে যোগী যেমন করে সংসার, সমাজ, মান, যশ, খ্যাতি, ধন-অর্থ সমস্ত পিছনে ফেলে ধ্যানের-নির্জনতাকে বরণ করে নেয়, মার্গারেট নোবেলও তেমন করে জীবনের প্রথম বিকাশমুখে আত্মীয়-স্বজন, স্বদেশ, স্বধর্ম, পাশ্চাত্য জীবনের সমস্ত মোহ জীর্ণ বস্ত্রের মত পরিত্যাগ করে ১৮৯৮ সালে ভারতে চলে আসেন এবং রামকৃষ্ণদেবের চরণপ্রান্তে আত্মনিবেদন করেন।

১৮৯৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তিনি কলকাতায় আসেন; ২৫শে মার্চ বিবেকানন্দ তাঁকে ব্রহ্মচর্য দেন, এই দিন হতেই স্বামীজী তাঁকে 'নিবেদিতা' নাম দেন এবং বেলুড়মঠের সমস্ত সন্ন্যাসীরা এই বিদেশিনীকে ভগিনী নিবেদিতারূপে গ্রহণ করেন। ১৮৯৮ সালেই অর্থাৎ এই বছরেই তিনি হিন্দু বালিকাদের জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৯৯ সালে মার্চ মাস থেকে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগ ত্রাণের কাজে যোগ দেন; জুলাই মাসে স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে যান পশ্চিমে। আমেরিকাতে রামকৃষ্ণ সাহায্য সংঘ 'দি রামকৃষ্ণ গিল্ড অব হেল্প' তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০০ সালে বিবেকানন্দ যখন প্যারীসে ঐতিহাসিক ধর্মসভায় যান তখন তিনি তাঁর সঙ্গে যান; কিন্তু ১৯০০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে একাই ইংল্যাণ্ডে আসেন। ১৯০২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতে চলে আসেন।

ভারতে আসবার পর থেকেই জীবনের সব দিনগুলির জন্য ধর্মমাতা সারদা দেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও ১৯০২ সালে জুলাই মাসে স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর নিবেদিতা ভারতের রাজনীতির প্রতি কিছুটা অনুরক্ত হয়ে পড়েন। স্বাধীনতা আন্দোলনের মহড়া তখন চলছে দেশজুড়ে,

ভারতের এই স্বাধীনতা আন্দোলনে বহু বিপ্লবী তখন এগিয়ে চলেছেন এক আদর্শ, এক বাণী নিয়ে—সে হোলো ভারতমাতার শৃঙ্খল মুক্ত করা। নিবেদিতাও অধ্যাত্মবাদের কর্মধারায় প্রভাবিত সন্ন্যাসীনী জীবনের কর্মধারা থেকে নিজেকে কিছুটা সরিয়ে এনে স্বাধীনতা-সংগ্রামের আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন।

ভারতের নর-নারীর মধ্যে জাতীয়তার চেতনা জাগিয়ে তোলবার জন্য তিনি ১৯০২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত বক্তৃতা করে বেড়ান বিভিন্ন স্থানে। ১৯০৫-০৬ সালে তিনি বাংলার জনসেবামূলক সমস্ত কাজে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯০৬ সালের বন্যায় এবং দুর্ভিক্ষের মধ্যে ত্রাণ কার্য করতে গিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ১৯০৭ সালে আগস্ট মাসে তিনি ইউরোপে ও আমেরিকায় যান এবং ১৯০৯ সালে জুলাই মাসে ভারতে চলে আসেন। ১৯১০ সালে তিনি আবার আমেরিকা যান এবং ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে ফিরে আসেন। ১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে তিনি দার্জিলিং-এ স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য যান এবং সেখানে আমাশয় রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েন; ১৩ই অক্টোবর তাঁর ইহলোকের কর্মমুখর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে; পৃথিবী থেকে তাঁকে চিরদিনের জন্য চলে যেতে হয়।

সাহিত্যিক জীবনেও নিবেদিতার দান উল্লেখ করবার মত; তাঁর বহু রচনা 'রিভিউ অব্ রিভিউ', 'প্রবুদ্ধ ভারত', 'মডার্ণ রিভিউ' প্রভৃতি পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯০০ সালে তাঁর বই কালীমাতা (Kali, the mother) প্রকাশিত হয়। পূর্ণ সাধকের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি তাঁর সাবলীল ভাষায় হৃদয়ের অনুরাগের সঙ্গে হিন্দুধর্ম ও পুরাণের গূঢ় তত্ত্বের মর্ম উদ্ঘাটন করে সারা জগতের কাছে তুলে ধরেন তাঁর এই গ্রন্থের মাধ্যমে। তাঁর অন্যান্য বিশেষ গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে, 'ওয়েভ অব্ ইণ্ডিয়ান লাইফ', 'কালী ওয়ারশীপ', 'ল্যাম্বস্ এ্যামাং উলভস্' প্রভৃতি। ১৯০৪ সালে প্রকাশিত 'ওয়েভ অব্ ইণ্ডিয়ান লাইফ' পুস্তকটির মধ্য দিয়ে তিনি ভারতবর্ষের একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন। তাঁর 'মাস্টার এ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থটিতে বিবেকানন্দের শিক্ষা এবং জীবনের ব্যাখ্যা রেখেছেন।

যে মূল আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে তিনি কাজ করেছেন তার মধ্যে থেকে তিনি ভারতবাসীকে একটি দৃঢ় এবং শক্তিশালী জাতি হিসাবে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। ১৮৮৮ সালে তিনি ইংল্যাণ্ড ও ভারতের

মধ্যে মৈত্রী গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে প্রিন্স ক্রোসটকিনের মতামত তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। ১৯০২ সাল থেকে ভারতের প্রতি ব্রিটিশদের নীতির বিরুদ্ধে তিনি বক্তৃতা এবং লেখার মাধ্যমে প্রতিবাদ করেন। ১৯০৪ সালের 'ইউনিভার্সিটি এ্যাক্ট' প্রবর্তনের তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৯০৫ সালের বাংলা বিভাগের জন্য তিনি লর্ড কার্জনের তীব্র সমালোচনা করেন। ভারতীয় অর্থনীতির বিপর্যস্ত অবস্থার জন্য তিনি ব্রিটিশ রাজতন্ত্রকেই দায়ী করেন।

রাজনৈতিক জীবনের কর্মধারার ক্ষেত্রে তাঁর আক্রমণাত্মক মনোভাবের জন্য তাঁকে অধৈর্য হতে দেখা গিয়েছে বিভিন্ন সময়ে; কিন্তু তাহলেও তদানীন্তন নেতৃবৃন্দ, জি. কে. গোখলে, বিপিন চন্দ্র পাল এবং তরুণ বিপ্লবী তারকনাথ দাস প্রমুখের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৯০৫ সালের বেনারস কংগ্রেসে তিনি যোগ দেন। আদর্শগত দিক দিয়ে এবং অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও স্বদেশী আন্দোলনে তাঁর একান্ত সমর্থন ছিল; 'দেওয়ান সোসাইটিতে' এবং 'অনুশীলন সমিতি'র জাতীয় দলকে তিনি সাহায্য করতেন। অরবিন্দ ঘোষ কর্তৃক গঠিত 'সেণ্ট্রাল কাউন্সিল অব্ এ্যাকসন'-এর তিনি ছিলেন একজন সদস্যা। অরবিন্দ ঘোষ যখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া পরিত্যাগ করে পণ্ডিচেরীতে চলে যান তখন তাঁর 'কর্মযোগ' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন নিবেদিতা।

বিজ্ঞানের উন্নতির ক্ষেত্রেও তাঁর উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়; জগদীশ চন্দ্র বোসের গবেষণার কাজের তিনি ছিলেন একজন সহকারী। ভারতের সভ্যতার পূর্ণতার জন্য ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির পুনর্জন্ম হবার প্রয়োজন আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্যান্য সাহিত্যিকদের ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদের আকাশে নিবেদিতা একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা, এমনকি বিদেশীরা তাঁর গুণে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, বুদ্ধিদীপ্তি এবং শিক্ষার ব্যাপকতা তাঁকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতালাভে সাহায্য করেছে।

ব্যবহারিক জীবনে তাঁর সহজ সরল জীবনযাত্রা হিন্দুধর্ম এবং ভারতীয় ঐতিহ্য বহন করতে সক্ষম হয়েছে। বিবেকানন্দের চোখে তিনি ছিলেন

'সত্যিকারের সিংহী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চোখে তিনি 'লোকমাতা', অরবিন্দের চোখে তিনি 'অগ্নিশিখা', ইংল্যাণ্ডের চোখে তিনি 'দি চ্যাম্পিয়ন ফর ইণ্ডিয়া' এবং সমগ্র ভারতবাসীর কাছে তিনি 'ভগিনী' বলে পরিচিতা। জাতীয় সচেতনতার জন্য তাঁর অবদান অতুলনীয়। একদা তিনি বলেছিলেন—

"My task is to awaken nation"—ভারতবর্ষকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা অর্থাৎ জাতীয় ধার্মিকতা ছিল তাঁর স্বপ্ন।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর সমাধিতে তাই ভারতবাসীর নিবেদিত কয়টি পংক্তি দেখতে পাওয়া যায়—

"Here repose the ashes of sister Nivedita of the Ramakrishna-Vivekananda who gave her all to India."

মভিস ডুন্নলিঙ্গোডহো

(১৯০৬—১৯৬২)

স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনের ময়দানে ভারতের প্রতিটি প্রদেশে যে সংগ্রামের স্রোত বয়ে গিয়েছিল আসাম প্রদেশ তার বাইরে ছিল না। এ প্রদেশের বহু নর-নারী সেদিন উপযুক্ত নেতৃত্বের হাত ধরে এগিয়ে গিয়েছিলেন এই সংগ্রামের ময়দানে একটিই মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে সে হোলো পরাধীন ভারতের শৃংখল মুক্তি। এ আন্দোলনে যে সমস্ত ব্যক্তি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আজো অমর হয়ে আছেন। মহিলা নেতৃত্বের সংখ্যা নগণ্য হলেও তাঁরা কিন্তু ইতিহাসের পাতায় নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন। এমনি একজন নেতৃত্বকে স্মরণ করা বোধহয় একান্ত জরুরী ; ইনি ছিলেন মভিস ডুন্নলিঙ্গোডহো।

১৯০৬ সালের ৪ঠা জুন আসামের শিলং-এর খাসিয়া পাহাড় অঞ্চলে মভিস ডুন্নলিঙ্গোডহো জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সম্মানিত খাসিয়া পরিবারভুক্ত। পিতা-মাতার চার কন্যার ভিতর তিনি ছিলেন তৃতীয়। তাঁর পিতা ছিলেন এইচ. ডুন্ এবং মাতা ছিলেন কাহেলিবোন লিঙ্গডহো। তাঁর কাকা এডওয়ার্ড উইলিয়ম ডুন ১৯৩৩ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য এম. বি. ই. পুরস্কার পান। জন্ম থেকেই তিনি ছিলেন খৃষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নেন শিলং-এর ওলেস মিশন গার্লস স্কুল থেকে। এরপর কলকাতার ডায়শেসন কলেজ থেকে বি. এ. ডিগ্রী এবং বেথুন কলেজ থেকে বি. টি. ডিগ্রী নেন। এরপর তিনি আসামে চলে আসেন এবং গৌহাটি ইউনিভারসিটির ল' কলেজে আইন পড়বার জন্য ভর্তি হন এবং এখান থেকে বি. এল. ডিগ্রী নেন।

কলকাতায় কলেজে ছাত্রী অবস্থায় পাঠকালীন তিনি মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসেন। স্নাতক ডিগ্রীলাভের পর তিনি নারী-কল্যাণ কাজের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী হন এবং কিছু কাজ করতেও থাকেন। তবে

এসময় তিনি সমাজ-কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতেন না। ১৯৩৭ সালের ২৯শে জানুয়ারী আসাম বিধান সভার নির্বাচনে তিনি নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে একজন নির্দলীয় স্বাধীন প্রতিনিধি হয়ে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং তিনিই প্রথম আসাম বিধান সভায় মহিলা এম. এল. এ. নির্বাচিত হন। তাঁর এই নির্বাচিত হওয়া ছিল ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উপজাতীয় মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবার ক্ষেত্রে একটা বর্ধিত পদক্ষেপ।

১৯৩৯ সালে যখন কংগ্রেস দল কংগ্রেস সম্মিলিত সরকার (Coalition Government) থেকে পদত্যাগ করল তখন স্যার মহম্মদ সৈয়দ সয়েদুল্লা তাঁর সরকারে মভিস ডুন্নলিঙ্গোডহোকে মন্ত্রী হবার জন্য আমন্ত্রণ জানালে তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ১৯৩৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর তেত্রিশ বছর বয়সে তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা মন্ত্রীসভায় নির্বাচিত হন। এই সময় মন্ত্রী হিসাবে স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন; স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকাকালীন স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রভূত উন্নতিসাধনের কাজে তাঁকে সফলতা লাভ করতে দেখা গিয়েছে। সেই সময় বেসরকারী হাসপাতাল, ওয়েলস্ মিশন হাসপাতালের মত হাসপাতালের নার্সরা ট্রেনিং কোর্স শেষ করবার পর কোনো হাসপাতালে কাজ পেতো না, কোর্স শেষ করবার পরই তারা যে কোনো সরকারী অনুমোদিত হাসপাতালে যাতে কাজ পায় তার ব্যবস্থা করেন শ্রীমতী মভিস। এর ফলে খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের মেয়েদের আর ট্রেনিং শেষ করবার পর অঞ্চলের বাইরে দূরে কাজ করতে না গিয়ে কাছাকাছি কোনো সরকারী অনুমোদিত হাসপাতালে কাজ করা সম্ভব হোতো।

১৯৪৬ সাল পর্যন্ত মভিসডুন্ন সায়েদুল্লা মন্ত্রীসভায় ছিলেন। এর পরের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হবার পর তিনি সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন থেকে সরে আসতে লাগলেন। এর পরও কিন্তু তাঁকে কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়; তাঁর বিগত দিনের কার্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং একজন উপজাতি অগ্রণী মহিলা হিসাবে আসামের স্টেট ইন্ জেনারেলকে, আসামের মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বারডোলোইয়ের বিশেষ অনুরোধে ১৯৫০ সালের ২৪শে মে তিনি এড্ভাইজারি কাউন্সিলের সদস্যা হিসাবে সংবিধানের ষষ্ঠ তালিকাভুক্তিতে খাসিয়া এবং জয়ন্তিয়া পাহাড় অঞ্চলের যৌথ জেলা কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাবনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এ সমস্ত দায়িত্ব ছাড়াও, তিনি নিজেকে বিভিন্ন ধরনের সমাজ-কল্যাণ-

মূলক কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত করেন। ১৯৬০ সালে তিনি পরিদর্শক হিসাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যান, সেখানে তিনি বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন,—এর মধ্যে 'ব্রায়ন কলেজ ফর ওম্যান' এবং 'পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়'তেও তিনি বক্তৃতা প্রদান করেন; ১৯৬১ সালে কিছুদিনের জন্য তিনি ইংল্যাণ্ডে যান এবং নির্দিষ্ট সময়ের পরে ভারতে ফিরে আসেন।

১৯৬২ সালে ১০ই অক্টোবর সামান্য শারীরিক অসুস্থতার কারণে শিলং-এর খাসিয়া পাহাড় অঞ্চল অন্তর্গত প্রেস 'বাইটেরিয়ান হাসপাতালে', ছাপ্পান্ন বছর বয়সে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জীবনের ছাপ্পান্নটি বছর এই উপজাতি মহিলা নিজের দেশের কাজে, কখনো স্বাধীনতার, কখনও সমাজ-কল্যাণমূলক কাজে উৎসর্গ করেছেন। ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন এই মহিয়সী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছেন সবার মাঝে, ভারতের মাটিকে অঙ্গের ভূষণ করে মানুষের জন্য ভেবেছেন দিবারাত্রি। সমাজ-সংস্কারকদের তালিকায় আজ তাঁর নাম খোদিত। দেশের অন্যান্য অংশের মহিলাদের তুলনায়, খাসিয়া-মহিলারা যাতে সমাজে বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে সে ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। এ ব্যাপারে তিনি সর্বদাই প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। সর্বধর্ম বিষয়ের প্রতি তাঁর ছিল বিশ্বাস এবং উদারতা, এর মূলে ছিল তাঁর শিক্ষা এবং পরিবেশের প্রভাব।

নারী-পুরুষ সহশিক্ষা এবং শিক্ষার ব্যাপারে সমানাধিকারের প্রশ্নে তাঁর মত ছিল জোরালো। অদ্ভুত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শান্ত এই মহিলা ছিলেন মার্জিত এবং সেবাপরায়ণা, যা তাঁকে সকলের কাছে আকর্ষণীয় করেছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, তাঁকে সবসময়ই দেখা গিয়েছে কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্যা না হয়ে নির্দল হয়ে কাজ করতে, এটাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনে পদক্ষেপের সবচেয়ে ভুল পদক্ষেপ। এর ফলে, ভারত স্বাধীনতা লাভের দ্বারে পৌঁছতেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়। সমাজ এবং জাতির কাছে তাঁর অবদান ছিল উপজাতি সম্প্রদায়কে স্বাধীনতার কাজে, সমাজের উন্নতির কাজে পথপ্রদর্শক হিসাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে পথ দেখানো পর্যন্ত।

মাতঙ্গিনী হাজরা

(১৮৭০—১৯৪২)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে মাতঙ্গিনী হাজরা, নামটি অবিস্মরণীয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার যখন ভারতের প্রতিপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে, তখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সেই উষ্ণ বাতাসের স্পর্শে ভারতমাতার শৃংখলিত বন্ধন মুক্ত করতে এগিয়ে এসেছেন বহু মা-বোনেরা এবং তাঁরা তাঁদের জীবনও উৎসর্গ করেছেন। বাংলার মেদিনীপুর জেলায় আন্দোলনের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল প্রবলভাবে। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়েছিলেন অগণিত নর-নারী। মেদিনীপুরের ষাট বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনীকেও সেদিন দেখা গিয়েছিল জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে জনতার সামনে দাঁড়াতে, সংগ্রামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করে পুলিসের সামনে দাঁড়াতে, হাসিমুখে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে।

মাতঙ্গিনী হাজরার কর্মক্ষেত্র ছিল মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহাকুমা শহরে। তমলুক শহরের এই মহিয়সী নারী তাঁর দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু উৎসর্গ করেছেন দেশের স্বাধীনতার প্রয়াসে। মাতঙ্গিনী হাজরা জন্মেছিলেন, মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহাকুমা থানার অন্তর্গত হোগ্‌লা নামে একটি ছোট গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে ১৮৭০ সালে। বাবা ছিলেন ঠাকুরদাস মাইতি, মাতা ভগবতী দেবী। মাতঙ্গিনী হাজরার দুই বোন ছিল, কোনো ভাই ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যদিও স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হয়েছিল, কিন্তু তার প্রসার বিশেষ ছিল না। সেই কারণেই সুদূর গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই অন্যান্য মেয়েদের মতো মাতঙ্গিনী হাজরাকেও নিরক্ষর হয়ে থাকতে হয়েছিল। কৈশোরে

তাঁকে এক ষাট বছরের বৃদ্ধর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। তাঁর স্বামীর নাম ছিল ত্রিলোচন হাজরা; বাড়ী তাঁদের পাশের গ্রামেই। ত্রিলোচন হাজরার অনেক সম্পত্তি ছিল। মাতঙ্গিনীর বাবা চেয়েছিলেন ভবিষ্যতে মেয়ের হাতে অর্থের অভাব না থাকে তাই এই বিপত্নীক, ষাট বছরের বৃদ্ধর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন।

মাতঙ্গিনীর এক সতীনের ছেলে ছিল, নাম মহেন্দ্র। স্বামী-স্ত্রীর বয়সের অসঙ্গতি থাকায় মাত্র আঠারো বছর বয়সে মাতঙ্গিনীকে বৈধব্য জীবন মেনে নিতে হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি প্রথমে বাবার বাড়ীতে চলে যান, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার স্বামীর গৃহে ফিরে আসেন এবং স্বামীর ভিটেতে কুঁড়েঘর তুলে বসবাস করতে থাকেন। অর্থ-নৈতিক দায়দায়িত্ব অবশ্য তাঁর সতীন-পুত্র মহেন্দ্রই বহন করতেন। মাতঙ্গিনীর নিজের কোনো সন্তান ছিল না। তাই তিনি বিভিন্ন ধর্ম-আচার নিয়েই সারাদিন কাটিয়ে দিতেন এবং পরোপকার করে বেড়াতেন।

১৯৩০ সাল, তাঁর গ্রামের কিছু যুবক যখন স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করে,—সেই সময়েই মাতঙ্গিনী স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা প্রথম শোনেন। ১৯৩১ সালে তাঁদের গ্রামে একটি স্বেচ্ছাসেবক ক্যাম্প তৈরী হোলো—ক্যাম্পটি ছিল তাঁর ঘরের কাছেই। তিনি তখনও আন্দোলনে যোগ দেননি, তবে স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা তিনি গ্রামের যুবকদের মুখে শুনতেন।

১৯৩২ সালের ২৬-শে জানুয়ারী,—এ দিনটিকে 'স্বাধীনতা দিবস' হিসাবে চিহ্নিত করা হোলো। এই উপলক্ষে পতাকা উত্তোলনের পর শোভাযাত্রা বেরলো গ্রামের পথে। শোভাযাত্রায় শুধুমাত্র কয়েকটি কিশোরী ছাড়া কোনো মহিলা ছিল না। যখন শোভাযাত্রা মাতঙ্গিনীর কুঁড়েঘরের সামনে এলো তখন তিনি গ্রামের সবার সঙ্গে নেমে পড়লেন সেই মিছিলে, পায়ে পা মেলালেন সেই ষাট বছরের বৃদ্ধা, তরুণদের সঙ্গে তিনিও চলতে লাগলেন। এই দিনটিই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন,—এই ষাট বছরের বৃদ্ধা সেইদিনই স্বাধীনতার দাবীতে প্রথম ঘর ছেড়ে পথে এলেন।

এই দিনই তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এবং মহাত্মাজীর অহিংসনীতির সপক্ষে যে অঙ্গীকারবদ্ধ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি তাঁর আত্মনিবেদনের মধ্যে তা অক্ষুন্ন রেখে গিয়েছেন। এরপর মাতঙ্গিনী স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজে নেমে পড়েন। সুদূর

বারো-তেরো মাইল পথ হেঁটে এই ষাট বছরের বৃদ্ধা উপস্থিত হতেন কংগ্রেসের বিভিন্ন সভায়। এই বছরেই অর্থাৎ ১৯৩২ সালে তিনি লবণ আইন ভঙ্গের প্রচার অভিযানে অংশ নেন এবং সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন শোভাযাত্রা করতে গিয়ে তাঁকে একাধিকবার কারাবরণ করতে হয়। তবে প্রতিবারেই তাঁর বয়সের কথা বিবেচনা করে পুলিস তাঁকে কয়েক ঘণ্টা পরে এই বন্দীত্ব থেকে মুক্তি দিত।

এইসময় তমলুক কোর্টে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করবার জন্য অভিযান চালানো হয়। মাতঙ্গিনী হাজরা এ অভিযানের পুরোভাগে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে চললেন। কোর্টের কাছাকাছি আসতে পুলিস তাঁদের গতিরোধ করে। মাতঙ্গিনী এ-বাধা আগ্রাহ্য করে পুলিস বেষ্টনীর মধ্যেই কোর্টের মাথায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। প্রতিদান হিসাবে পেলেন পুলিসের নির্মম প্রহার। তিনি জ্ঞানহীন হয়ে পড়লেন, তাঁর মুখ থেকে রক্ত বেরোতে লাগল। এ অবস্থায় তাঁকে স্ট্রেচারে করে কংগ্রেসের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হোলো।

এরপর ১৯৩৩ সাল, স্যার জন এ্যানডারসন তখন বাংলার গভর্ণর। তিনি এলেন তমলুকে, কড়া পাহারার ব্যবস্থা, জনসমাগম হয়েছে ভাল। এই কড়া পাহাড়ার মধ্যেও মাতঙ্গিনী কালো পতাকা নিয়ে উপস্থিত হলেন গভর্ণরের সামনে। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হোলো এবং ছয় মাসের জন্য কারাবরণ করতে হোলো। জেলের মধ্যে তিনি বহু মহিলা কংগ্রেস কর্মীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁদের কাছ থেকে জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে অনেক বিষয় জেনে নেন। এমনকি কংগ্রেস আন্দোলন তুলে নেবার পরও মাতঙ্গিনীর উদ্দীপনা একটুও হ্রাস পায়নি; ১৯৪২ সালের তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি তমলুকে কংগ্রেসের কার্যবিধির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি খুব ভাল ছিল না; তবুও তিনি প্রতিদিন সুতো কাটতেন এবং খদ্দর ছাড়া অন্য কোনো বস্ত্র পরিধান করতেন না।

তিনি ছিলেন গান্ধীজীর প্রিয় শিষ্যা। গান্ধীজীর বিভিন্ন কাজের তিনি ছিলেন একজন প্রধান অনুসরণকারী। খাদি ও গ্রামোদ্যোগ শিল্প, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ প্রভৃতি কাজের প্রচার অভি-যানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রণী। তাঁর এই আত্মনিয়োগ তাঁকে তমলুক মহাকুমাবাসীর কাছে পরিচিত করিয়ে ছিল 'গান্ধীবুড়ী' নামে। সেদিন থেকে তিনি কংগ্রেস কর্মী হিসাবে গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত

হন, সেই দিন থেকেই তিনি গান্ধীজীর নীতি এবং অহিংসা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এজন্য তাঁকে অনেক নিপীড়ন ও কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। নিজের খাবার না খেয়ে দরিদ্রকে দিয়ে দিতেন, বিশেষ করে যাঁরা দেশের জন্য নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন তাঁদের সাধ্যমত সাহায্য করবার জন্য তিনি সর্বদাই আগ্রহী ছিলেন। তাঁর এ কুঁড়েঘরে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং এ. আই. সি.সি-র সদস্য কুমার জানা ছিলেন বহুদিনের অতিথি।

১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে বোম্বাইতে 'ভারত ছাড় আন্দোলনের' প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মেদিনীপুরে তখন সংগ্রামের জোয়ার, নেতাদের গ্রেপ্তারের পর মেদিনীপুরের কংগ্রেস কর্মীগণ অসংখ্য সভা ও শোভাযাত্রা করে বৃটিশের শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করতে করতে অগ্রসর হতে থাকেন। প্রতিটি থানাকে তাঁরা স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। মহিষাদল থানার সামনে প্রায় কুড়ি হাজার লোকের মিলিত সভায় যখন তাঁদের স্বাধীনতার সংকল্প ঘোষণা করা হয়, তখন তমলুকের মহাকুমা শাসক সভার বক্তাদের মধ্যে চারজনকে গ্রেপ্তার করবার আদেশ দেন। কিন্তু জনতা এতে রুখে দাঁড়ায়। মহাকুমা শাসক লাঠি চার্জের হুকুম দিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কনষ্টেবলরা লাঠি চার্জ না ক'রে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মহাকুমা শাসকের পরাজয় ঘটল।

এরপর সরকারের নজর পড়ল স্বেচ্ছাসেবক শিবিরের উপর। সরকার থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের শিবিরগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হতে লাগল। তমলুকের এ ঘটনায় সবাই একটু বিচলিত হয়ে পড়লেন। তখন কংগ্রেস কর্মীরা অন্যান্য মহাকুমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেন। যতবার সরকার স্বেচ্ছাসেবকদের শিবিরগুলি পুড়িয়ে দিতে লাগল ততবারই আরো অধিক সংখ্যক শিবির পুনর্গঠিত হতে লাগল। সরকারী অফিস ও আদালত বয়কট করা হতে লাগল। ক্রমে ক্রমে জনগণও সরকারী আসন দখল করবার জন্য অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। তখন কর্মীগণ সভা করে সিদ্ধান্ত নিলেন ২৯-শে সেপ্টেম্বর তাঁরা থানা, কোর্ট এবং অন্যান্য সরকারী কেন্দ্র আক্রমণ ও দখল করবেন।

২৮-শে সেপ্টেম্বর রাত্রে কংগ্রেস কর্মীগণ বড় বড় গাছ ফেলে বাইরে থেকে তমলুক আসবার প্রধান রাস্তাগুলি বন্ধ ক'রে দিলেন। আতাশ মাইলের মধ্যে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া হোলো,

খেয়া পারাপারের নৌকাও ডুবিয়ে দেওয়া হোলো। ১৯৪২ সালের ২৯-শে সেপ্টেম্বর তারিখটি মেদিনীপুর জেলার ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় দিন। তমলুক মহাকুমার তিনটি থানা,—তমলুক, মহিষাদল ও সুতাহাটা একসঙ্গে আক্রমণ করা হোলো। পাঁচ দিক থেকে পাঁচটি বিরাট শোভাযাত্রা তমলুক শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, সময় বেলা তিনটে। নরনারী সুসজ্জিত সে বিরাট শোভাযাত্রা। উত্তর দিক থেকে আসছিল যে বিপ্লবাহিনী তার মধ্যে চলেছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা; বাহাত্তর বর্ষীয়া এই বৃদ্ধা। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই দলের পিছনের দিকে মহিলাদের রাখা হয়েছিল, যাতে আক্রমণের প্রথম ধাক্কা তাদের উপর না পড়ে। মাতঙ্গিনী শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকতে পারলেন না বলে একটু হতাশ হলেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিজের কাজ করতে লাগলেন। যদিও তাঁকে শোভাযাত্রার সামনে থাকতে দেওয়া হয়নি, কিন্তু তাঁকে বলা হয়েছিল যে কোনো রকম অসুবিধা দেখা দিলে তিনি নেতৃত্ব দিতে পারবেন।

শোভাযাত্রা যখন থানার সামনে এসে হাজির হোলো তখন তাঁরা সশস্ত্র রক্ষীদলের কাছ থেকে বাধা পেল। সৈন্যরা চিৎকার করে উঠল, হলট্‌।...তারা গুলী করবার জন্য প্রস্তুত, বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়াল তারা, এতে গ্রামবাসীরা ভয় পেয়ে গেল, তারা কি করবে ঠিক করতে পারল না এবং মুহূর্তের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে মাতঙ্গিনী দেবী মুহূর্তের মধ্যে তাঁর কর্তব্য স্থির ক'রে নিলেন। তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠল বীরাঙ্গনার তেজ দীপ্তি। তিনি জাতীয় পতাকা হাতে সামনে এগিয়ে এসে বিদ্রোহীদের আহ্বান করলেন,—"করব অথবা মরব, হয় জয় না হয় মৃত্যু, তেমরা বাড়ী ফিরে গিয়ে কি উত্তর দেবে"।

তাঁর এই আহ্বানে ছত্রভঙ্গ গ্রামবাসীরা ফিরে দাঁড়াল। সমস্ত বিদ্রোহী দল তখন মাতঙ্গিনী দেবীর নেতৃত্বে সুশৃঙ্খলভাবে সশস্ত্র রক্ষীবাহিণীর দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। রক্ষীদল তখন বেপরোয়া গুলিবৃষ্টি করতে শুরু করল। মাতঙ্গিনী জাতীয় পতাকা দৃঢ় মুষ্ঠিতে ধরে এগিয়ে চললেন সকলের পুরোভাগে। পশ্চাতে চলেছে পাঁচ হাজারের বেশী আবালবৃদ্ধ নরনারীর বিশাল নিরস্ত্র বাহিনী। রক্ষীদল আবার তাঁকে বাধা দিল—'হল্ট'। কিন্তু মাতঙ্গিনী সব বাধাকেই অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলেছেন যেন 'ভারত মাতা'।

সৈন্যরা এবার তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো, অব্যর্থ গুলি এসে

তাঁর হাতে বিদ্ধ হল। পতাকা অন্য হাতে তুলে নিলেন মাতঙ্গিনী। দু'খানা হাতই আক্রান্ত হোলো গুলিতে। হাত স্খলিত হোলো, কিন্তু জাতীয় পতাকা বীরাঙ্গনার গুলিবিদ্ধ হাতে সগর্বে মাথা উঁচু করে উড়তে থাকল। মাতঙ্গিনী অকম্পিত পদে এগিয়ে চলেছেন, সৈন্যদের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যদের আহ্বান করে বলে চলেছেন,—"ভাইয়ের বুকে গুলি চালিও না। তোমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান কর"। উত্তরে একটি গুলি এসে তাঁর কপাল ভেদ করে চলে গেল।

'বন্দেমাতরম'-ধ্বনি করে ধুলায় লুটিয়ে পড়লেন মাতঙ্গিনী। ভুলুণ্ঠিত রক্তাপ্লুত দেহের সেই প্রাণহীন হাতে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় তখনো উঁচু হয়ে উড়ছে জাতীয় পতাকা। সরকারী সৈন্য ছুটে এসে তৎক্ষণাৎ সেই জাতীয় পতাকা ধুলায় লুটিয়ে দিল। শহীদ মাতঙ্গিনীর পুণ্য-দেহের পশ্চাতে ছাড়িয়ে পড়ল আরো কয়েকজন গুলিবিদ্ধ শহীদ ভাইয়ের মৃতদেহ। তাঁরা হলেন—লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, পুরীমাধব প্রামাণিক, নগেন্দ্রনাথ সামন্ত, জীবন বেরা।

মেদিনীপুরে সেদিনের সেই সংগ্রাম ইতিহাসের পাতায় একটি অধ্যায় রচনা করেছে। 'মার অথবা মর'—গান্ধীজীর প্রিয় শিষ্যা মাতঙ্গিনী তাঁর গুরুর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

মীরা বেন
(১৮৯২—　　)

ভারত দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন করতে শুধুমাত্র ভারতীয় নয়, অভারতীয় মহিলারাও সমবেদনার সঙ্গে এগিয়ে এসেছিলেন। ভারতের পরাধীনতার জ্বালা তাঁদের কাছে মর্মস্পর্শী মনে হয়েছিল তাই তাঁরাও অনুভব করেছিলেন ভারতমাতার দুঃখ-বেদনা, পরাধীনতার গ্লানিকে। এমনি একজন বিদেশী মহিলা যিনি আমাদের ভারতবাসীর কাছে মহিয়সী নারীরূপে হয়ে থাকবেন স্মরণীয়, হলেন জন্মসূত্রে ইংল্যাণ্ডবাসী, কর্মসূত্রে ভারতবাসী মীরা বেন।

১৮৯২ সালে মীরা বেন ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম মেডেলিয়নে স্লেড, পিতা ছিলেন একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় ইংরেজ, মহামান্য এডমণ্ড স্লেড। তিনি ছিলেন একজন অদ্ভুত ধরনের মানুষ: স্নেহপরায়ণ অথচ কঠোর, ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ এবং সত্যবাদী, সত্য পথ অনুগামী। স্লেডের মাতা ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে, তিনি একজন শিল্পীও ছিলেন। মেডেলিয়নে স্লেডের বংশের মধ্যে যাযাবরের রক্ত ছিল; সেই কারণেই আমরা পরবর্তী সময়ে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দেখতে পাবো যে, তাঁর মধ্যেও একটা ঘরছাড়া প্রবৃত্তি দেখা গিয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই মেডেলিয়নেকে নিঃসঙ্গভাবে থাকতে দেখা যেতো, তিনি বেশীর ভাগ সময়ই একা থাকতে ভালবাসতেন, স্কুলে যেতে তাঁর কখনো ভাল লাগতো না; সেই কারণে তাঁর পিতা তাঁকে গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করে দিলেন। গৃহশিক্ষকের কাছে লিখতে পড়তে ভালবাসতেন এবং করতেনও তাই; কিন্তু অংক করতে ভালো পারতেন না। ফুল, পাখী, গাছ এবং পশু ভালবাসতেন। তিনি উদ্ভিদবিদ্যা এবং প্রাণীবিদ্যা বিষয়ে পড়াশুনা করতেন, এছাড়া ছবি আঁকা ছিল তাঁর সহজাত নেশা। দিনের সমস্ত কাজের মধ্যে অবসর সময়ে তিনি ঘোড়ায় চড়া, বাগান করা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। গৃহশিক্ষকের

কাছে ধীরে ধীরে তিনি বিভিন্ন ভাষা শিখেছেন.—ফরাসী, জার্মানী এবং মিশরীয়।

ছয় ফুট লম্বা আকর্ষণীয় গড়ন, উন্নত নাসিকা এবং সুন্দর দুটি চোখের অধিকারিণী মেডেলিয়ানে ছিলেন সকলের কাছে আকর্ষণীয়। তদানীন্তন ইংল্যাণ্ডের যুবসমাজে তাঁর আকর্ষণও ছিল প্রচুর। এই সৌন্দর্যের অধিকারিণী যুবতীকে তাই যুবকদের কাছ থেকে এত বেশী সমাদর পেতে হোতো যার জন্য তিনি বিরক্ত বোধ করতেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে আনন্দ উপভোগ করা ছাড়া অন্য কোনো কৃত্রিম উপকরণ তাঁকে আনন্দ দান করতে পারতো না। ক্লাবে, পার্টিতে নাচ-গান করে স্ফূর্তি করা তিনি একদম পছন্দ করতেন না, তাই তিনি ক্লাবে যেতেন না। ফরাসী দার্শনিক বিথোভেন সম্বন্ধে জানবার পর, তাঁর মধ্যে অধ্যাত্মবাদের আকাংখা জাগে। তিনি একবার বেনে এবং ভিয়েনা যেখানে বীথোভেনের জন্মস্থান ছিল সেখানে যান। এছাড়া, বীথোভেনের জীবনকে ভিত্তি করে লেখা 'জীন ক্রী মেঠাফে' রোমা রোলার এই বইটিও তিনি পড়েন। এর পর থেকেই এই ফরাসী দার্শনিকের সঙ্গে যোগাযোগ করবার একটা প্রবল আকাংখা তাঁর মনের মধ্যে চাহিদা সৃষ্টি করে, তখন তিনি বিথোভেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য ফরাসীতে যান। ফরাসীতে কিছুদিনের জন্য তাঁকে ফরাসী ভাষা শিখবার জন্য থাকতে হয়।

বীথোভেন ছাড়া, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গেও রোমা রোলা তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর লেখা পুস্তক 'মহাত্মা গান্ধী'র মাধ্যমে। এই পুস্তকটি পড়বার পরই তাঁর জীবনে পরিবর্তন এলো; তিনি উপলব্ধি করলেন তিনি ঠিক পথের সন্ধান পেয়েছেন। নিজের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তিনি একবার বলেন, 'Now I know what that some thing was, the approach of which I had been feeling.' মহাত্মা গান্ধীর কথা পড়বার পর তিনি একথা উপলব্ধি করলেন যে, ভারতবর্ষের মুক্তি আনবার জন্য ভারতবাসীর কাছে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বান ভয়শূন্য, সত্যবাদী এবং অহিংস প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার। মহাত্মা গান্ধীর এই আদর্শ মেডেলিয়নেকে আকর্ষণ করেছিল। তিনি গান্ধীজীর কাছে আসবার জন্য নিজেকে তৈরী করতে লাগলেন,—মাদকদ্রব্য পান করা পরিত্যাগ করলেন, নিরামিষভোজী হলেন এবং ভগবদ্‌গীতা পাঠ করা শুরু করলেন।

১৯২৪ সালে যখন একুশ দিন অনশন করবার পর গান্ধীজী অনশন

ভঙ্গ করলেন, তখন মেডেলিয়নে তাঁর হাত খরচার অর্থ থেকে কুড়ি পাউণ্ড গান্ধীজীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন, সঙ্গে এই অনশন আন্দোলনের জন্য অভিনন্দনবার্তা। কিছুদিনের মধ্যে তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাঁকে পত্র লিখলেন। পত্র পাবার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজী তাঁর ইচ্ছাকে স্বাগত জানালেন; এর পর ১৯২৫ সালের ৬ই নভেম্বর তিনি বোম্বাইতে আসেন এবং ৭ই নভেম্বর আমেদাবাদের সবরমতী আশ্রমে চলে আসেন। আশ্রমজীবনের প্রচণ্ড কঠোরতা পালন করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য হলেও তিনি মানিয়ে নিলেন। ভারতীয় পোষাক পরিধান করা, হিন্দিভাষা শেখা এবং তাঁত বোনা প্রভৃতি বিষয় ধীরে ধীরে শিখে ফেললেন।

মেডেলিয়নের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে এবার কিছু কথায় আসা যাক। তিনি যদিও জীবনে দু'বার দু'জন প্রেমিকের সংস্পর্শে আসেন কিন্তু বিবাহ করেননি। এদের মধ্যে একজন ছিলেন ইংল্যাণ্ডের - একজন পিয়ানোবাদক, যাঁকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল এবং অন্য জন ভারতীয়। তিনি ব্রহ্মচর্য নিলেন, মস্তক মুণ্ডিত করলেন; পরবর্তী সময়ে অবশ্য পুরোপুরিই সন্ন্যাসী হয়েছিলেন এবং গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে গান্ধীজী তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করলেন; তিনি বললেন, "ঈশ্বরের সব পথই এক, সেইজন্য ধর্ম পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না।" ধর্ম সম্বন্ধে পরবর্তী সময়ে যখন ইংল্যাণ্ডে তাঁর কাছে তাঁর ধর্মমত সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হয়, তখন তিনি বলেন, 'একদা খৃষ্ট ছিলেন এবং একজন বুদ্ধ ছিলেন, বর্তমানে আছেন গান্ধীজী'। এ উক্তি থেকে বেশ বোঝা যায় যে, তিনি গান্ধীজীকে দেবতার মত দেখতেন। নিউইয়র্কে একজন প্রতিনিধি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'তোমাদের কাছে তোমাদের খৃষ্ট আছেন, কিন্তু আমার কাছে গান্ধীজীই আমার খৃষ্ট।'

তিনি বেদ, উপনিষদ এবং পুরাণ পড়তেন; তাঁর কিছু লেখার মধ্যে এক জায়গায় আমরা পাই, 'এমন দিন হয়েছে যখন আমি বেদের মধ্যে ডুবে গিয়েছি, অনেক বছর আগেকার সেই মানুষগুলো আমার হৃদয়ের সঙ্গে যেন মিলে যেতো'। গান্ধীজীর আন্দোলনের একান্ত অনুরাগী ভক্ত এবং ভারতবর্ষের জন্য উৎসর্গকৃত প্রাণ মেডেলিয়নকে গান্ধীজী নতুন ভারতীয় নামে সম্মানিত করলেন 'মীরা'। 'মীরা' তাঁর যৌবন থেকে শুরু করে জীবনের অধিকাংশ সময় ভারতেই ছিলেন; কিছুদিনের

জন্য নিজের দেশে গেলেও গান্ধীজীর চিঠি পেয়ে তিনি আবার চলে এলেন এদেশে। ভারতে এসে তিনি দেরাদুনে গুরুকুল আশ্রমে থাকতে লাগলেন এবং এখানে ইংরেজী, হিন্দিভাষা এবং ধর্মগ্রন্থ শেখাতেন; সঙ্গে তাঁত বোনা শেখাতেন।

প্রথম দিকে গান্ধীজী তাঁকে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে দিতে চাননি; সেই কারণেই মীরা বিহার, বাংলা, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে খাদি বস্ত্রের প্রসারের জন্য ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এই সময় বিহারের দারিদ্র্য তাঁকে মর্মাহত করে, তিনি গ্রামের মানুষদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান করতে লাগলেন। বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করতে করতে তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়েন; কিন্তু সুস্থ হবার পরও তিনি কাজে লেগে গেলেন। ১৯৩২ সালের দ্বিতীয় দফায় যে গোলটেবিল বৈঠক হয় সেখানে গান্ধীজীকে তিনি তাঁরই নির্দেশে সহযোগিতা করেন। এর পর ধীরে ধীরে তিনি রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন। গান্ধীজীর ভাষ্যকার হিসাবে তিনি বিদেশে তাঁর আদর্শের কথা প্রচারের কাজে লেগে গেলেন। ধীরে ধীরে তিনি ভারতেরই একজন হয়ে গিয়েছিলেন, ভারতের মাটিকে ভালও বেসেছিলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেন, এর ফলে কারাবরণ করতে হোলো তাঁকে। পরবর্তীকালে কস্তুরবার সঙ্গে একবার এবং একা দু'বার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছিল।

সমাজসেবার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহশীল হলেও এবং কয়েকটি গ্রামে কাজ করবার জন্য ঠিক করলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁকে পুনরায় বাপুজীর কাছে ফিরে আসতে হোলো। ১৯৩৪ সালে তিনি ওয়ার্ধার কাছাকাছি একটি গ্রাম সেগনে কাজ করতে শুরু করলেন। গান্ধীজী তাঁকে এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য বললে তিনি রাজী হলেন এবং বাপুজী তাঁকে তাঁর শেষ আশ্রম সেগনে 'সেবাগ্রাম' নামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে দিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাপুজী মীরাকে উড়িষ্যা, আসাম এবং বাংলায় পাঠালেন; মীরার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে গান্ধীজী তাঁর অহিংস আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে বাধা প্রদানের জন্য অহিংস আন্দোলন শুরু হয় গান্ধীজীর নেতৃত্বে। মীরা ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি মীরার সঙ্গে দেখা করলেন না; ভাইসরয়ের সেক্রেটারী মিঃ লেথওয়েট ভাইসরয়ের পরিবর্তে মীরার সঙ্গে দেখা করলেন। মীরা তাঁকে বলেন

যে, সেই সময় এসেছে যখন ব্রিটিশকে ভারত ছাড়তে হবে নিশ্চয়ই, ব্রিটিশের শাসনের অবসান অবশ্যই হবে।

বাপুজী তাঁকে এলাহাবাদে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির (All India Congress Committee) কাছে ভারত-ছাড় আন্দোলনের প্রস্তাব সম্বন্ধে একটি পত্র দিয়ে পাঠান। গান্ধীজীর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি যে প্রস্তাবের খসড়া করেন। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই-এর বৈঠকে তা ভারত-ছাড় প্রস্তাব হিসাবে গৃহীত হয়। ভারত-ছাড় আন্দোলনের প্রস্তুতি চলতে থাকে, এই বছরই ৯ই আগস্ট গান্ধীজীর সঙ্গে তিনিও গেপ্তার হন এবং ১৯৪২ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯৪৪ সালের মে মাস পর্যন্ত আগাখান প্যালেসের ডিটেনশন্ ক্যাম্পে তাঁকে রাজনৈতিক বন্দীশিবিরে থাকতে হয়। বন্দী থাকাকালীন রাজনৈতিক বন্দীশিবিরে তিনি একটি হাতীর দাঁতের তৈরী বালকৃষ্ণের মূর্তি এমন সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতেন যে সকলেই দেখতে আসতেন। এই শিবিরের মধ্যে সবাইকে নিয়ে তিনি নিয়মিত ব্যায়াম, ব্যাডমিণ্টন, টেবিল-টেনিস খেলতেন। তিনি বন্দীশিবিরে গান্ধীজীর সঙ্গে যে সমস্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন সেগুলি তিনি তাঁর 'দি স্পিরিটস্ পিলগ্রীমেজ' পুস্তকে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন।

জেল থেকে ছাড়া পাবার পর তিনি হৃষিকেশের কাছে একটি গ্রামে সেবাকেন্দ্র স্থাপন করেন। এখানে পুরানো গাভী ও ষাঁড়ের সেবা করা হোতো। সেবাকেন্দ্রটির নাম দেন 'কৃষাণ আশ্রম'। পরবর্তী সময়ে এ নাম পরিবর্তন করে তিনি নাম রাখেন 'পশুলোক'। কিছুদিনের জন্য তিনি উত্তরপ্রদেশ সরকারের 'অধিক খাদ্য উৎপাদন' (Grow more food) প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি এই একই কাজ কাশ্মীরে করেন অল্প সময়ের জন্য। বাপুজীর মৃত্যুর পর তিনি আর ভারতে থাকেন নি।

১৯৫৯ সালের ১৮ই জানুয়ারী তিনি ভারত ত্যাগ করে ভিয়েনায়, ভিয়েনা শহর থেকে তিরিশ মাইল ভিতরে একটি ছোট গ্রামে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। এখানে তিনি বেথোভেনের গান শুনে সময় কাটাতেন; এই সঙ্গে কৃষক এবং শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করতেন। তিনি যখন মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতেন তখন কৃষক এবং মজুররা তাঁকে ডাকত 'দি ইণ্ডিয়ান লেডি' অর্থাৎ 'ভারতীয় মহিলা' বলে, এ নামেই তিনি সেখানকার সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন।

ম্যাডাম ভিকাজি কামা

(১৮৬১—১৯৩৬)

সংগ্রাম দীর্ঘ প্রসারিত হোক ; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, দশকের পর দশক ধরে সংগ্রামী মানুষ যখন অধিকারের জন্য সংগ্রাম করে তখন তার এই একটিই কামনা থাকে। তাই তো সংগ্রামের ময়দানে যে সকল সচেতন মানুষ নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে এগিয়ে আসে সার্বিক স্বার্থের সফলতা অর্জনের আশায় তারা জয়ী হন সর্বকালের জন্যই। সংগ্রামের সচেতনতা শুধুমাত্র স্থান, কাল, পাত্র বিচার করেই হয় না, এটা পুরো তার নিজস্ব ব্যাপার, আর সেই কারণেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনে আমরা ঐশ্বর্যশালী রক্ষণশীল পরিবারের মহিলাকেও বেরিয়ে আসতে দেখেছি। বর্তমানে আমরা যাঁকে নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি তিনি হলেন ম্যাডাম ভিকাজী কামা।

১৮৬১ সালের ২৪-শে সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে ম্যাডাম ভিকাজী কামা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সোরাবজি ফ্রামজি প্যাটেল এবং মাতা জিজিবাঈ। তাঁদের পরিবারটি ছিল একটি পার্সী পরিবার। প্রসঙ্গত তাঁদের পরিবার সম্বন্ধে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সোরাবজি ফ্রামজি প্যাটেল তাঁর পুত্রদের প্রত্যেকের জন্য তেরো লক্ষ টাকা এবং আট কন্যার প্রত্যেকের জন্য, একলক্ষ টাকার ট্রাস্ট করে যান। এই পরিবারের মহিলা তো দূরেই থাক্ কোনো পুরুষেরও বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করবার কথা ভাবাই যায় না এবং তারা সে কথা চিন্তাই করত না। ম্যাডাম ভিকাজিই প্রথম মহিলা যিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য, ব্রিটিশ শত্রুর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করবার জন্য বিপ্লবী কাজে আত্মোনিয়োগ করেন।

ম্যাডাম ভিকাজি আলেকজানড্রা গার্লস স্কুল থেকে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণ করেন ; সেসময় ভারতের মেয়েদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

হিসাবে এই স্কুলটি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিল। ম্যাডাম ভিকাজি এমন একটি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে সময়টি ছিল সিপাহী বিদ্রোহ সম্পন্ন হবার চার বছর পর। এই সময়ে ভারতের একটা বড় সংখ্যার স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক মানুষ জাতীয় কর্মধারায় অংশ-গ্রহণের ব্যাপারে ছিল আগ্রহী। ১৮৮৫ সালের ৩-রা আগষ্ট রুস্তমজী কামার সঙ্গে ভিকাজির বিবাহ হয়। এই বছরেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় বোম্বাইতে, অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডাবলুঃ মি. বোনারজি। এর ফলে এসময়েই মানুষের মনে সংগ্রামের নতুন চেতনা জাগতে থাকে এবং জনগণের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের জন্য নতুন উদ্যম গড়ে ওঠে। বাংলার অরবিন্দ ঘোষ এবং মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলন গড়ে ওঠে। কিশোরী ভিকাজির মনেও তখন এই নতুন উদ্যম প্রেরণার সঞ্চার করে এবং তা তাঁর ভবিষ্যত গঠনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর স্বামী রুস্তমজী কামা, রাজনীতি সম্বন্ধে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না, এই কারণেই এই দম্পতির বিবাহিত জীবন মোটেই সুখের হয়নি। জাতীয় আন্দোলনের ব্যাপারে দম্পতির উভয়ের ছিল ভিন্ন মত।

১৯০২ সালে ম্যাডাম ভিকাজি চিকিৎসার জন্য লণ্ডনে গেলেন, সেখানে দাদাভাই নৌরোজির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব-পূর্ণ দাদাভাই নৌরোজির সম্পর্ক তাঁকে রাজনৈতিক বিষয়সম্বন্ধে আরো বেশী উৎসাহী করে তুলল। তিনি রাজনৈতিক কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য মনস্থ করলেন; তবে তাঁর কর্মধারা শুরু করবার আগে তিনি মনস্থ করলেন ইউরোপ এবং আমেরিকা ভ্রমণ করে আসবেন। তিনি জার্মানী, ফ্রান্স স্কটল্যাণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করলেন। ১৯০৭ সালে তিনি স্টুট্টগার্ট-এ সোসালিষ্ট কংগ্রেসে যোগ দিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করলেন উৎসাহী জনতার সামনে। ১৯০৮ সালে তিনি বিপিন বিহারী পালের সঙ্গে দেখা করবার জন্য লণ্ডনে গেলেন। লণ্ডনে থাকাকালীন তিনি আরো অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন,—এ'দের মধ্যে আছেন, শ্যামজী কৃষ্ণভার্মা, বীর সাভারকার, সর্দার সিং রানা, মুকুন্দ দেশাই এবং বীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

পরবর্তী সময়ে তিনি রাশিয়ার বিপ্লবীদের সঙ্গেও পরিচিত হন। তিনি লেনিনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। একজন বিপ্লবী হিসাবে

সমাজ সেবামূলক কার্যের প্রতিও ম্যাডাম কামার আগ্রহ ছিল। জনগণের সঙ্গে তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল সমাজসেবা কার্যের মধ্য দিয়ে। '72 good Indian' দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তাঁর একনিষ্ঠ দেশ প্রেমিকতা এবং ধৈর্য্য তাঁকে দৃঢ় এবং সুশৃঙ্খল ও জাতীয়তাবাদী করে তুলেছিল। তাঁকে লক্ষ্যে পেঁছবার ক্ষেত্রে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী ছিলেন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব শ্যামজী কৃষ্ণভার্মা এবং তাঁর সহকর্মীরা। লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউস' খুব শীঘ্রই তাঁদের প্রভাবে দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের মূল কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠল।

ভারতকে ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে মুক্ত করবার সংগ্রামের আহ্বানে ম্যাডাম কামা প্রতিনিয়ত সভা-করতে লাগলেন ; তাঁর জ্বালাময়ী, উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে সকলকে অনুপ্রাণিত করতে লাগলেন তিনি। তাঁদের সভাগুলির বেশীর ভাগই হোতো হাইড পার্কে, তাঁর এ ধরনের বক্তব্য তাই স্বভাবতই শ্বেতকায় শিবিরের আকর্ষণ সৃষ্টির প্রধান সহায়ক হোলো ; ফলে তাঁর উপর অত্যাচারের ভয় দেখানো হোতে লাগল। ইতি-মধ্যে তিনি প্যারীস চলে যান। ১৯০৯ সাল থেকে প্যারীস হোলো তাঁর প্রধান কার্যক্ষেত্র। যুবশক্তি ও বিপ্লবীদের স্থান হরদয়াল, সাথুলাৎভালা এবং অন্যান্য কিছু নির্দিষ্ট স্থানকে তাঁরা বেছে নিলেন সভা করবার স্থান হিসেবে। এখান থেকেই তিনি বিভিন্ন সভায় তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে দেশের মানুষজনের কাছে সনির্বন্ধ ভাবে অনুরোধ প্রকাশ করলেন ব্রিটিশ শাসনের আইনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠবার। ম্যাডাম কামা ছিলেন স্বচ্ছ মনের অধিকারিণী, তাই তাঁর আহ্বানও ছিল খুব স্পষ্ট।

ম্যাডাম কামা যে কাজই করতেন না কেন তা অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে সম্পূর্ণ করতেন। যখন তিনি বিপ্লবী কাজের জন্য হিংসার নীতিকে বেছে নিয়েছিলেন তখন বোমা তৈয়ারী করবার জন্য তিনি যুব বিপ্লবীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। ভারতের জনগণের অবস্থা সমস্ত জগতের সামনে তুলে ধরবার জন্য তিনি ইউরোপ এবং আমেরিকা ভ্রমণ করেন। বিদেশী সরকার যখন শ্যামজী কৃষ্ণভার্মা এবং রানাকে স্মাগলিং এর অপরাধে অভিযুক্ত করে তখন ম্যাডাম কামা সরাসরি সরকারের কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে কর্তপক্ষকে সত্যতা বুঝিয়ে বিপ্লবী দু'জনকে ভারতে ফিরিয়ে আনবার যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তা পূর্ণরূপে পালনে সক্ষম হন। ফ্রান্সে যখন সাভারকার গেপ্তার হন তখন তাঁকে মুক্ত করবার জন্য প্রাণপণ

প্রচেষ্টা দ্বারা তাঁর সাহস এবং একনিষ্ঠতার পরিচয় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকেই দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য তাঁর কর্মধারা শুরু হয়; ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যখন মৈত্রী হয় এবং তার চাপ ফ্রান্স সরকারের উপর পড়ে, তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিন বছর কালের জন্য তাঁকে কারাজীবন কাটাতে হয়। প্যারীসে তিনি ত্রিশ বছর বাস করেন, তাঁর বিশ্বাস ছিল ভারত স্বাধীনতা পাবেই; বেশ কয়েকবার তিনি ভারতে চলে আসবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কর্মকর্তাগণ যতক্ষণ পর্যন্ত মনে করেছেন তাঁকে ছাড়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর ভারতে আসা হোলো না। অবশেষে, চুয়াত্তর বছর বয়সে ১৯৩৫ সালে তিনি ভারতে আসেন এবং একবছর বাদেই এই দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবের পুরোধা মহিয়সী মহিলা পার্সী হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কোনো সম্বর্ধনা, কিম্বা অশ্রুজল তাঁর জন্য ছিল না, তবু মনে প্রাণে যাঁরা ভারতকে ভালবেসেছেন, যাঁরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন, তাঁদের কাছে ম্যাডাম ভিকাজি কামা স্মরণীয় এবং উজ্জ্বল প্রতীক হিসাবে বেঁচে আছেন। তাঁর স্মরণে বোম্বাই শহরে একটি রাস্তার নামাঙ্কিত হয়। ১৯৬২ সালের ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে তাঁর সম্মানে একটি ডাকটিকিট বের করা হয়। স্বামী, সংসার সমস্ত অগ্রাহ্য করে এই মহিয়সী সেদিন নেমে পড়েছিলেন নির্ভয়ে এবং নিস্বার্থ ভাবে একটিই উদ্দেশ্য নিয়ে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি ভারতে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন, বিপ্লবী মনোভাব নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

রমা দেবী

(১৮৯৯—   )

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ারে শুধু বাংলা নয়, ভারতের সমস্ত প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তাল জনস্রোত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নর-নারী জাতিগত, ভাষাগত ভেদাভেদ ভুলে এগিয়ে এসেছিলেন, জড় হয়েছিলেন একটি মাত্র মঞ্চে যা হোলো দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমুক্ত করবার সপথের মঞ্চ। উড়িষ্যা প্রদেশের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার প্রেরণা সঞ্চার করে তাঁদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যে সমস্ত নেতৃত্ব তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন রমা দেবী ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন মহীয়সী নারী, যিনি পুরুষ নেতৃত্বের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন, সংগঠিত করেছেন স্বাধীনতাকাঙ্খী মা-বোনেদের, তাঁদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে।

১৮৯৯ সালে ৩রা ডিসেম্বর রমা দেবী উড়িষ্যার কটক শহরের ব্যাঙ্কাবাজার নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গোপালবল্লভ দাস ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং মাতা বসন্ত কুমারী দেবী ছিলেন একজন বিদুষী মহিলা। গোপালবল্লভ দাস ছিলেন "উজ্জ্বল গৌরব" মধুসূদন দাসের ছোট ভাই। রমা দেবী কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষা-গ্রহণ করেন নি, তিনি তাঁর গৃহে কৃপাসিন্ধু হোতা এবং লোকনাথ পট্ট-নায়ক—এই দুজন শিক্ষকের কাছে উড়িয়া, বাংলা ও হিন্দী শেখেন। লোকনাথ পট্টনায়ক ছিলেন তদানীন্তন ইস্কুলগুলির ইন্সপেকটর। যদিও রমাদেবী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করেন নি, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁকে সত্যিকারের শিক্ষিত করে তুলেছিল। ১৯১৪ সালে ১৪ বছর বয়সে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট গোপবন্ধু চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। গোপবন্ধু ছিলেন একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, আর সেই জন্য যখন গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন, তখন গান্ধীজীর

আহ্বানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মানিত পদের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে আন্দোলনে যোগ দিতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি। তদানীন্তন রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি গান্ধীজির একজন বিশ্বাসী এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ অনুসরণকারী হয়ে উঠেছিলেন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনে নয়, গান্ধীজীর পরিচালনায় অন্যান্য যে সমস্ত সামাজিক এবং গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হোতো, সেখানে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

রমা দেবী তাঁর স্বামী গোপবন্ধুর কাছ থেকে উদ্দীপনা পান প্রচুর, যা তাঁকে জাতির কাজে আত্মোৎসর্গ করতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করেছিল। রমা দেবীর রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবার ক্ষেত্রে তাঁর স্বামীর পূর্ণ সমর্থন ছিল। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, রমা দেবী শৈশব এবং কৈশোরেও কিছু জাতীয়তাবাদের প্রেরণা পেয়েছিলেন। সেই সময়কার উড়িষ্যার রাজনৈতিক নেতৃত্ব নন্দকিশোর দাসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তিনি যে পরিবারে ছেলেবেলা থেকে বেড়ে ওঠেন সেই পরিবারে সেই সময়কার সমাজের বেশ কিছু উচ্চপরিবারের আদান প্রদান ছিল। বিবাহের পরও তিনি স্বামীর সম্পূর্ণ সমর্থন নিয়ে স্বামীর পাশে থেকে সবসময়ই কাজ করে গিয়েছেন। রাজনৈতিক আন্দেলনের বহু নেতৃত্বের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস, টক্কর বাপা, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সর্দার বল্লভ প্যাটেল, আচার্য জে. বি. কৃপালিনী, সি. এ. এন্ড্রুজ প্রমুখ নেতৃত্ব ছাড়াও সরজিনী নাইডু, কমলা দেবী চট্টপাধ্যায়, সুশীলা পাই, অ্যানীবেশান্ত প্রমুখ স্বদেশী আন্দোলনের মহিলা নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল।

পরবর্ত্তী জীবনে তিনি বিনোবা ভাবের প্রভাবে প্রভাবিত হন এবং বেশ কয়েক বছর তাঁর সঙ্গে কাজ করেন। এ সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব ছাড়াও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যের আদর্শ, ম্যাটসিনী, গ্যারিবল্ডি এবং নেপোলিয়ান প্রমুখ ব্যক্তিত্বের আদর্শ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তাঁর উপর এই সব ব্যক্তিত্বের প্রভাব তাঁকে সামাজিক নানান সমস্যা সমাধানে বিশেষরূপে সাহায্য করেছে। অল্প বয়স থেকে ভারতীয় নানান কুসংস্কার তাঁর মনে প্রতিবাদী ভাব এনে দিয়েছিল এবং পরিণত জীবনে কর্মক্ষেত্রে নামার প্রথম থেকেই তিনি জাতিগতবিরোধ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর মতামতকে সোচ্চার করেন। একজন বহু সম্মানিত "কল্পনা"

পরিবারের অন্তর্ভূক্ত হয়েও হরিজনদের সঙ্গে কাজ করতে তিনি কখন দ্বিধা বোধ করেন নি। বিধবা বিবাহের পক্ষে এবং শিশুবিবাহের বিপক্ষে তিনি সবসময়ই তাঁর কণ্ঠকে সোচ্চার করেছেন। নারী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্নের সঙ্গেও তিনি সহমত পোষণ করেছেন। একজন হিন্দু হয়েও সর্বধর্মের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। যদিও তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধিতা কখনও করেননি, তথাপি জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতি, বিশেষ করে বনিয়াদি শিক্ষা পদ্ধতির পক্ষে তিনি সর্বদাই সহমত পোষণ করেছেন।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন তাঁকে জাতীয়তাবাদের উপর আস্থা স্থাপন করতে সাহায্য করেছে। রমাদেবী সংবাদপত্রের মাধ্যমে সমাজ এবং রাজনীতিগত সমস্যা সম্বন্ধে মতামত প্রদান পূর্বক সমাধানের ব্যাখ্যা করে লিখতেন; তাঁর পাঠকও ছিল বিস্তর; তাঁর লেখাও সমাদৃত হোতো। এছাড়া, তিনি ছিলেন সুবক্তা; তাঁর বক্তব্যে অন্তরের অন্তস্থল থেকে যা প্রকাশ হোতো তা পাঠককে মুগ্ধ করত। তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে উৎস্বর্গ করলেন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় যখন উচ্চনেতৃবর্গ কারাগারে রাজবন্দী হয়েছিলেন, তখন রমাদেবী, উড়িষ্যা কংগ্রেসের পরিচালক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির তিনি একজন সদস্যা ছিলেন। এইসময়ই তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেসকমিটির সদস্যাও ছিলেন। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়; ১৯৪৪ সালে তিনি কারামুক্ত হন। উড়িষ্যার বহু মহিলাকে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ কারবার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন এবং বহু মহিলা তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে।

সামাজিক সেবার ক্ষেত্রেও তাঁর দান উল্লেখযোগ্য। গান্ধীজীর মতো তাঁর মত ছিল, 'Service to humanity is Service to God,' অর্থাৎ মানব সেবাই ঈশ্বরের সেবা; বিশেষত, হরিজন, আদিবাসী, পিছিয়েপড়া মহিলাদের এগিয়ে আনবার জন্য এবং সামাজিক উন্নতির কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তিনি 'হরিজন সংঘের' সভাপতি পদে নিযুক্ত থেকে কাজ করেন। মহিলাদের অবস্থার উন্নতির জন্য উড়িষ্যা প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে 'মহিলাসংঘ' স্থাপন করেন।

১৯৪৫ সালে তাঁরই প্রচেষ্টায় কটকে 'কস্তুরবা নারীমঙ্গল কেন্দ্র' নামে প্রসিদ্ধ প্রসূতিসদন প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের নিপীড়িতদের জন্য স্থাপিত আশ্রমে তিনি স্বামীর সঙ্গে থেকে সেবা করেন। এইসব আশ্রমের মধ্যে বিখ্যাত ছিল, কটকের জগৎসিংহপুর জেলার 'অলকেশরাম্না' ও 'বাড়ী' আশ্রম। 'নিখিল ভারত চরকা সংঘের' ট্রাণ্টী ছিলেন; ট্রাণ্টী নিযুক্ত থাকাকালীন তিনি সর্বদাই উড়িষ্যার খাদি ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির জন্য সক্রিয়ভাবে প্রচেষ্টা করেন। খরা ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গত মানুষজনের পাশে তিনি সবসময়ই থেকেছেন। উড়িষ্যার বিভিন্ন প্রান্তের 'সেবাসংঘ'-গুলি প্রতিষ্ঠা হয় তাঁরই উদ্যোগে। উড়িষ্যার প্রতি ঘরে ঘরে তাঁর নাম তাই প্রত্যেকের মুখেমুখে। স্বাধীনতালাভের পর স্বাধীনভারত নতুনগতি নিয়ে চললেও রমাদেবী নিজেকে সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়ে আসতে থাকেন এবং সমাজ সেবামূলক কাজে আরো বেশী করে জড়িয়ে পড়তে থাকেন। ভুবনেশ্বরের মহিলা কলেজটির নাম রাখা হয় 'রমাদেবী মহিলা কলেজ''।

রমাবাঈ রানাডে

(১৮৬২—১৯২৪)

ভারতের আন্দোলনের ইতিহাসে মহারাষ্ট্রের আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেবার জন্য যেসব মহান ব্যক্তিত্বের উল্লেখ আছে, তাঁদের মধ্যে গোবিন্দ রাণাডের নামের সঙ্গে অল্পবিস্তর আমাদের প্রত্যেকেরই পরিচয় আছে। এই গোবিন্দ রানাডে ছিলেন মহারাষ্ট্রের প্রগতিশীল দলের সুপরিচিত নেতৃত্ব। তাঁরই অভিভাবকত্বে যিনি নিজেকে শিক্ষিত করে দেশের মাটিকে ভালবাসতে শিখেছিলেন, তিনি হলেন তাঁর সহধর্মিণী রমাবাঈ রানাডে।

১৮৬২ সালের ২৫-শে জানুয়ারী রমাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর স্বামী জাষ্টিস মহাদেব গোবিন্দ রানাডের জন্মের কুড়ি বছর পড়ে। রমাবাঈ-এর পিতা মহাদেও মানিকরাও কালেকর ছিলেন একজন খ্যাত-নামা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক। ১৮৭৫ সালে তাঁর পিতা গোবিন্দ রানাডের সঙ্গে তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করেন। গোবিন্দ রানাডে ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র এবং মহারাষ্ট্রের প্রগতিশীল দলের সুপরিচিত নেতৃত্ব। বয়সের বিরাট তারতম্য থাকবার জন্য গোবিন্দ রানাডে প্রথমে রমাবাঈকে বিবাহ করতে আপত্তি জানান। কিন্তু তাঁর নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই রমাবাঈকে তাঁকে বিবাহ করতে হয়। বিবাহের পর গোবিন্দ রানাডে হলেন রমাবাঈ-এর বন্ধু, দার্শনিক এবং অভিভাবক ; জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ গোবিন্দ রানাডের ১৯০১ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রমাবাঈ-এর সঙ্গে তাঁর স্বামীর সম্বন্ধ অব্যাহত ছিল। তাঁর স্বামীই ছিল তাঁর একান্ত সঙ্গী।

গোবিন্দ রানাডে রমাবাঈকে নিজে সমাজসেবা কর্মের শিক্ষক হিসাবে শিক্ষা দিতে লাগলেন ; তাঁকে সত্যিকারের সমাজসংস্কারক হবার মতো শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী করতে লাগলেন, সঙ্গে প্রেরণা যোগাতে লাগলেন। রমাবাঈ ধীরে ধীরে স্বামীর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে লাগলেন।

শীঘ্রই তিনি মারাঠী, বাংলা, ইংরাজী এবং সংস্কৃত ভাষা শিখে ফেললেন। এছাড়া, তিনি অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, সমকালীন রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের উপর জ্ঞান অর্জন করেন। নিজেকে তিনি এমনভাবে শিক্ষিত করেছিলেন যা তাঁকে ভবিষ্যৎ জীবনে বহু দূরে সম্মানের উচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। এই কারণেই ১৯১৭ সালে যখন তিনি ফিজি আয়ারল্যাণ্ডের শ্রম ব্যবস্থার বিষয়ে যে আন্তর্জাতিক সমস্যার উদ্ভব হয়, তিনি তখন সেই সমস্যাকে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় শ্রমিকদের দুর্দশার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য জনসভা করেন এবং ভাইসরয় ও তাঁর স্ত্রীকে এই মর্মে একটি প্রস্তাব পাঠান।

১৯০৪ সালে রাষ্ট্রীয় সামাজিক পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ভারত মহিলা পরিষদের প্রথম সভায় রমাবাঈ সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৮ সালে, সুরাটে, ১৯১২ সালে বোম্বাইতে এবং ১৯২০ সালে সোলাপুরে এই ভারত মহিলা পরিষদেরই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৮ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি বোম্বাই সেবাসদনের সভাপতি ছিলেন। ১৯০৯ সাল থেকে তিনি পুনা সেবাসদনের সভাপতি ছিলেন। এই মহিলা সমিতির সঙ্গে তিনি যুক্ত হন ১৮৮৫ সাল থেকে ; ১৮৮১ সাল থেকেই অর্থাৎ তাঁর কৈশোরের সময় থেকেই তিনি প্রার্থনাসমাজের প্রার্থনাগুলিতে যোগ দিতেন। আর্য মহিলা মণ্ডলের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তাঁরই প্রচেষ্টায় ডঃ ধুনডু কেশাও কারভে এবং অন্যান্যদের সাহায্যে সেবাসদন স্থাপিত হয়েছিল।

যে সমস্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে হিন্দু মহিলারা শিক্ষাগ্রহণ করতেন, সেগুলির সঙ্গে রমাবাঈ যুক্ত ছিলেন। ১৯০৪ সালের পর তিনি এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠানের মূলদায়িত্বে চলে আসেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলির বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ছিল বোম্বাই এবং পুনাতে। তিনি 'হিন্দু মহিলা সমাজ সংঘ' (Hindu Ladies Social Club) স্থাপন করেন। এই সংঘে সাঁতার, প্রাথমিক চিকিৎসা, মারাঠী এবং ইংরাজী শেখানো হোতো। তিনি সেবাসদনেও শিক্ষাদান করতেন ; রমাবাঈ সেবাসদনে অর্থ ও সাহায্য করতেন এবং এখানে একটি মহিলাদের জন্য হোস্টেলও তৈরী করান। সেবাসদনের মহিলাদের চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষাদানের সুবিধার জন্য ১৯১১ সালের তাঁরই প্রচেষ্টায় ডেভিড সাসুন হাসপাতালে নার্সিং ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা হয়।

এছাড়া এ-হাসপাতালের চিকিৎসা বিভাগের ছাত্রীদের জন্য একটি বোর্ডিং হাউস তাঁরই উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টায় তৈরী হয়।

পরবর্তী সময়ে সেবাসদনে টিচারস্ ট্রেনিং ক্লাস, পাবলিক হেলথ্ স্কুল, ডিপার্টমেন্ট অব্ মেডিকেল সার্ভিস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, স্পোকেন ইংলিশের ক্লাস, গৃহবিজ্ঞান এবং প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র চালু হয়। ১৯১২ সালে তিনি সেন্ট্রাল ফ্যামিন রিলিফ কমিটির কাজ করতে থাকেন। সময় পেলেই তিনি প্রত্যহ পনেরো দিনে একবার ইরোদো জেলের মহিলাদের পরিদর্শন করতে যেতেন। এছাড়া শিশুদের জন্য সংস্কারসাধক বিদ্যালয়গুলিও তিনি নির্দিষ্ট সময়ে পরিদর্শন করতেন। দীর্ঘ ছয় বছর সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার পর ১৯২৩ সালে বোম্বে রমাবাঈ-এর নেতৃত্বে মহিলাদের ভোটাধিকার অর্জন আইনত অধিকৃত হোলো।

শুধুমাত্র মহিলা ও শিশুদের জন্যই নয়, শ্রমিকদের পাশে তিনি সব সময়ই থাকতেন। ভারতীয় শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ তিনি সব সময়ই করেছেন সোচ্চার কণ্ঠে। কেনা কলোনীর ভারতীয় শ্রমিকদের উপর যে নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়, সে অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি জনসমক্ষে সভা করে সরকারের এই কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, জনগণ যেমন সরকারের নিকট বাধ্য তেমনি সরকারকেও জনগণের নিকট দায়িত্ব পালনে, তাদের অধিকার পূরণে বাধ্য থাকা উচিত। এই চিন্তা এবং মত তিনি জনমনেও সোচ্চার কণ্ঠেই বলেন। সবশেষে, আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাব একজন মারাঠী লেখিকা হিসাবে,—তাঁর লেখা 'অমিচ্যা আয়ুস্মতী কাম্বতী আত্মবাণী' নামক পুস্তিকাটি প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এই পুস্তিকাটিতে তিনি কয়েকজন বিখ্যাত মহিলার জীবনী লেখেন।

১৯২৪ সালে এই কর্মমুখর নারী তাঁর সমস্ত কর্মের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে ভারতের মাটি থেকে চিরবিদায় নিলেন। পরাধীন ভারতের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যাঁর সর্বদাই ছিল জেহাদ ঘোষণা, এই ভারতের মাটিতে পরাধীন শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করে মহিলাদের সুশিক্ষিত করা এবং পাশাপাশি একই সঙ্গে দুস্থ ও পীড়িত মহিলা, শিশুদের সুস্থ করে তোলবার প্রয়াস, এইসব বিশাল কর্মকাণ্ডের যিনি পুরোধা তিনি ভারতের স্বাধীনতালাভের পূর্বেই, সুস্থ ভারতবাসীর উজ্জ্বল মুখ দেখবার পূর্বেই ইহলোক থেকে চিরবিদায় নিলেন। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমরা তাই আবার তাঁকে স্মরণ করছি।

রাজকুমারী অমৃত কাউর

(১৮৮৯—১৯৬৪)

রাজকুমারী অমৃত কাউর ১৮৮৯ সালে ২-রা ফেব্রুয়ারী লক্ষ্মৌশহরে জন্মগ্রহণ করেন। কাপুরতলা ষ্টেটের আহলুওয়ালিয়া সম্ভ্রান্ত পরিবার-ভুক্ত ছিল তাঁদের পরিবার। তাঁর পিতা ছিলেন রাজা স্যার হরনাম সিং; তিনি ছিলেন তাঁর পিতার একমাত্র কন্যা, এবং অমৃত কাউরের সাত ভাই ছিল। তাঁর পিতা ছিলেন খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। পাঞ্জাবের সরকার তাঁর পিতাকে অযোধ্যা ষ্টেটের ম্যানেজার হিসাবে নিয়োগ করেন। এই ষ্টেটটির মূল্যমান কাপুরতলা ষ্টেট অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী ছিল। পিতা-মাতার ধর্মঅনুযায়ী রাজকুমারীও খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর শৈশবের শিক্ষা হয় ইংল্যাণ্ডে; তাঁকে শেরবোণ বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হোলো, এটি ডোর সেট শ্যায়ারে অবস্থিত।

শৈশব এবং কৈশরের শিক্ষা সমাপ্ত করে অমৃত কাউর লণ্ডনের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পড়াশুনা ছাড়াও তিনি আরও বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষ করে খেলার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তিনি খুব ভাল টেবিল টেনিস খেলতে পারতেন এবং এর জন্য তিনি বহু চ্যাম্পিয়নের সম্মানও লাভ করেছিলেন। রাজকুমারী সারাজীবন অবিবাহিত ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন পবিত্রতারক্ষাকারী খৃষ্টান। পিতার কাছ থেকেই রাজকুমারী খ্যাতি ও সম্মান পাবার ক্ষেত্রে ক্ষমতার অধিকারিণী হয়েছেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলে, রাজা স্যার হররাম সিং প্রমুখের সঙ্গে তাঁর পিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার প্রাপ্তি স্বীকার করেই, রাজকুমারী অমৃত কাউর বলেন, "আমার তীব্র ইচ্ছা, ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হতে দেখা।"

অমৃত কাউর মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে এসে তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, ধীরে ধীরে গান্ধীজীর খুব ঘনিষ্ঠ অনুসরণকারী ও সারাজীবনের জন্য শিষ্যা হয়েছিলেন তিনি। সমাজকল্যাণমূলক কাজের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল, এছাড়া, বিশেষভাবে তিনি

মহিলাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন ; তাদের কিভাবে রাজনীতিতে প্রভাবিত করা যায় এবং রাজনীতি সম্পর্কে আরো বেশী সচেতন করা যায়। ১৯৩০ সালের সর্বভারতীয় নারী সম্মেলনে তিনি ছিলেন সম্পাদক। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত তিনি মহিলা সংগঠনের (Women's Association) সভাপতি হিসাবে কাজ করেন। ১৯৩২ সালে ভারতীয়দের ভোটাধিকারের দাবীতে তিনি লাহোর কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেন এবং মহিলা সংগঠনের একজন সদস্য হিসাবে কাজ করেন।

এই সংগঠনের প্রতিনিধি থাকাকালীন তিনি সংগঠনের সদস্যা হিসাবে পার্লামেন্টের সংবিধানের পুনর্গঠনের দাবীতে পার্লামেন্টে জয়েন্ট ষ্টীল কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেন। ১৯৩৮ সালে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় নারী সম্মেলনে তিনি সভাপতি হন। মহাত্মা গান্ধীর সহকারী হিসাবে একটানা ষোলো বছর তিনি কাজ করেন। তিনিই প্রথম মহিলা, যিনি, এড্ভাইজারি বোর্ড অব্ এডুকেশনের সদস্য নির্বাচিত হন ; কিন্তু ১৯৪২ সালে তিনি ঐ পদ থেকে ইস্তফা দেন। হিন্দুস্থানী তালিমি সংঘের তিনি একজন সদস্যা ছিলেন ; এই সংঘের সদস্যা হিসাবে, ১৯৪৫ সালে তিনি লণ্ডনে UNESCO-তে যোগ দেন। এই একই উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালে তিনি ভারতের প্রতিনিধি হয়ে প্যারীসের সম্মেলনে যোগ দেন। সর্বভারতীয় চরকাসংঘের (All India Spinners Association) তিনি ছিলেন একজন বোর্ড অব ট্রাষ্টির সদস্য। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর তিনি ভারতের প্রথম স্বাস্থ্য মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

গান্ধীজীর অনুপ্রেরণাতেই তিনি কংগ্রেসের দলে যোগ দিয়েছিলেন এবং সারাজীবনই এদলের কর্মসূচীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহকারী। পরবর্তী সময়ে যখন সাম্প্রদায়িক বিষয়ের উপর পুরস্কার ঘোষণা করা হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর নিন্দা করে তা ত্যাগ করেন। এনঃ ডাবলু. এফ. পি.-তে তিনি কংগ্রেসের কাজে মানুতে যান। ১৯৩৭ সালে ১৫-ই জুলাই তিনি রাজদ্রোহীর অপবাদে গ্রেপ্তার হন এবং কারাবরণ করেন। ১৯৪২ সালে ভারত-ছাড় আন্দোলনের সময়ে তিনি বহু শোভা-যাত্রার নেতৃত্ব দেন। এইসব শোভাযাত্রার উপর পুলিসের অত্যাচারও হয়েছে প্রচুর ; সিমলাতে তাঁরা যখন শোভাযাত্রা করেন তখন তাঁদের শোভা-যাত্রার উপর লাঠিচার্জ হয়। পরে তিনি কলকাতায় গ্রেপ্তার হন।

রাজনীতি অপেক্ষা সামাজিক কাজে রাজকুমারী বেশী সক্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই কাটিয়েছেন নারী জাগরণের কাজে, সমাজের নারীদের উপর অন্যায় ও অবিচারপূর্ণ ব্যবহারের প্রতিবাদে তাঁর কণ্ঠ সবসময়ই সোচ্চার হয়েছে; বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, অশিক্ষা; প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি তাঁকে সবসময়ই গুরুত্বসহকারে, সামাজিক এ সমস্ত কুপ্রথাগুলি সমূলে উৎপাটন ক'রে সুন্দর, সুস্থ সমাজ তৈরী ক'রে নারীদের মুখে একটু হাসি ফোটাবার কাজে প্রচেষ্টা চালাতে দেখা গিয়েছে সর্বদাই। বাল্য বিবাহের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, এ-ধরনের সামাজিক কুসংস্কার আমাদের সমাজের ব্যাধি, এর ফলে মেয়েদের স্বাস্থের ক্ষতি হয় এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারেও বাল্যবিবাহ প্রথা যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে থাকে। বাল্যবিবাহের ফলে খুব অল্প বয়সেই মেয়েরা সন্তানের জননী হয়, যার ফলে বাইরের সমস্ত যোগাযোগ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, ঘরে বন্দী হয়ে থাকেন, সঙ্গে শারীরিক দিক দিয়েও তাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

অমৃত কাউর ছিলেন নারী শিক্ষার একজন বলিষ্ঠ সমর্থনকারী, এ ব্যাপারে তাঁকে সর্বদাই অগ্রণীভূমিকা পালন করতে দেখা গিয়েছে। একবার নারী সম্মেলনে তিনি বলেন, "শিক্ষার পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের সর্বদা নজর দিতে হবে বাধ্যবাধকতামূলকভাবে, স্বাধীন শিক্ষালাভের ব্যাপারেও আমাদের নজর দিতে হবে। বিশেষত, যতক্ষণ না পর্যন্ত নারীশিক্ষার বিস্তার লাভ হবে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণতা আসা সম্ভব নয়। সেই কারণে নারীকে অবশ্যই শিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে করে তারা শিক্ষিত হয়ে ভবিষ্যতে শিক্ষা দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে।"

হরিজনদের প্রতিও তাঁর সমান দৃষ্টি ছিল। হরিজনদের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন যে, তারা সমাজে সবচেয়ে বেশী অবহেলিত, আমাদেরকে তাদের প্রতি নজর দেওয়া, তাদের কাছে টেনে নেবার দায়িত্ব অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই রাজকুমারী নিজেকে তৈরী করেছিলেন, সত্যিকারের দেশপ্রেমিক এবং অহিংস আন্দোলনের সাথী হতে পেরে-ছিলেন। রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রের পাশাপাশি সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করবার কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং একজন সমাজ সংস্কারক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৬৪ সালে এই মহিয়সী নারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রুক্মিণী আম্মাল লক্ষ্মীপাতি

(১৮৯১—১৯৫১)

ভারতের এই ধূলিকণা স্বর্গ সবার কাছে ; এই অনুভূতি চলে এসেছে দশকের পর দশক, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, যে মানুষেরা মিশে আছেন ভারতের মাটির সঙ্গে, তাঁদের মধ্যে। ভারতের মাটিকে ভারত-বাসী মাথায় করে নিয়েছে ; সংস্কৃতিতে-সাহিত্যে, ফলে-ফুলে, সবুজ মাঠের ধানের শীষে পূর্ণ ভারতের এই মাটি কিন্তু যেদিন বিদেশীশক্তির কাছে হস্তগত ছিল, ভারতমাতা পরাধীনতার শৃংখল হাতে নিয়ে বিদেশী শক্তির অত্যাচারের ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করছিলেন, আর নীরবে অশ্রু ঝড়িয়ে ছিলেন তাঁর পরাধীন, অসহায় সন্তানদের জন্য, সেদিন কিন্তু অগণিত ভারতবাসীর জোয়ানরা এই অসহায় নিপীড়িত জনগণের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছেন পরাধীন ভারতমাতার শৃংখল-মুক্ত করবার জন্য। ভারতের প্রদেশে প্রদেশে সেদিন বেজে উঠেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের রণতূর্য। দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজে এমনি জোয়ানদের মধ্যে যিনি বা যাঁরা নেতৃত্ব দিয়ে আলোর পথ দেখিয়েছিলেন ভারত-বাসীকে, তাঁদের মধ্যে একজনকে আমাদের আজ স্মরণ করবার বোধ হয় বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইনি হলেন রুক্মিণী আম্মাল লক্ষ্মীপাতি।

১৮৯১ সালে রুক্মিণী আম্মাল লক্ষ্মীপাতি মাদ্রাজে জন্মগ্রহণ করেন, প্রাচীন সম্মানিত এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁর পিতা এইচ: শ্রী নিভাস রাও ছিলেন একজন জমিদার এবং প্রাদেশিক সরকারের কর্ম-সংস্থার সদস্য। রুক্মিণীর দাদু ছিলেন টি. রামা. রাও, তিনি ত্রিভাংকুরের দেওয়ান-পদে কাজ করতেন। সমাজ-সংস্কার এবং স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী ও কর্মমুখর তাঁদের এই ব্রাহ্মণ পরিবারটির আদর্শের প্রভাব ছেলেবেলা থেকেই রুক্মিণীর উপর পড়ে। সেই কারণেই পিতার ইচ্ছানুযায়ী শৈশবে বাল্যবিবাহ হওয়া থেকে বিরত

হওয়া এবং শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। তদানীন্তন সময়ে সামাজিক কুসংস্কারের বেড়াজাল থাকবার ফলে খুব কমসংখ্যক মহিলাই শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেতেন। রুক্মিণী এ সুযোগ পেয়েছিলেন সম্পূর্ণভাবেই ; তিনি গৃহশিক্ষার কাজে ল্যাতিন এবং ফরাসী ভাষা বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। পরবর্তী সময়ে নিজের চেষ্টাতেই হিন্দি এবং উর্দু ভাষা শেখেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত করবার পর তিনি কলকাতার ওম্যানস্ খৃষ্টান কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. (স্নাতক) ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯১০ সালের ১০-ই ডিসেম্বর ডঃ অচান্ত লক্ষ্মীপার্তীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এ বিবাহ হয়েছিল তাঁর নিজের পছন্দ অনুযায়ী এবং এ-বিবাহের ব্যাপারেও তাঁকে তাঁর অভিভাবকের কাছ থেকে প্রচুর বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কারণ, একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হয়ে তিনি শৈব নিয়োগী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ডঃ অচান্ত লক্ষ্মীপাতীকে বিবাহ করেন, যিনি ছিলেন গোঁড়া জাতীয়তাবাদী এবং রাজনীতিবিদ্। স্বামীর আগ্রহ এবং প্রচেষ্টার ফলেই তিনি বিবাহিত জীবনের দিনগুলিতে নিজেকে বিভিন্ন সমাজ-সংস্কারমূলক এবং রাজনৈতিক কাজের মধ্যে যুক্ত রাখতে পেরেছিলেন। রাজনীতিতে প্রবেশ করবার পূর্বে তিনি কিছুদিন সমাসসেবা এবং সমাজ-সংস্কারকের কাজ করেন ; মাদ্রাজের ভারতশ্রী মহামণ্ডলের তিনি ছিলেন সেক্রেটারী।

ভারতীয় মহিলা সংঘের (Women's Indian Association) জন্মলগ্ন থেকেই তিনি ছিলেন এর সক্রিয় সদস্যা। মাদ্রাজের সমাজসেবামূলক কাজের প্রতিষ্ঠান ইউথলীগের তিনি সভাপতি ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন তিনি মহিলাদের উপর যে সমস্ত সামাজিক অবিচার করা হোতো তার প্রতিবাদ করতেন এবং মহিলাদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করতেন। ১৯২৬ সালের জুন মাসে প্যারীসে যে দশম আন্তর্জাতিক মহিলা ভোটাধিকার রাষ্ট্রসংঘ কংগ্রেস (10th International Women's Suffrage Alliance Congress in Paris) অনুষ্ঠিত হয় সেখানে তিনি প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। সেই সময়ে তিনি ভারতের সমর্থন লাভের জন্য সংঘবদ্ধ প্রচারকার্য চালাবার সুযোগ গ্রহণে ইউরোপ এবং ইংল্যাণ্ড পরিদর্শনে যান।

পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তিনি আগ্রহী ছিলেন এবং এমতের প্রতি

তাঁর বিশ্বাসও ছিল ; ১৯৩১ সালে মাদ্রাজে ম্যালথুসিয়ান লীগ স্থাপিত হবার পর যে সমস্ত আলোচনা হয় সেখানে তাঁর অংশগ্রহণ ছিল। তাঁর স্বামীও তাঁর সঙ্গে সমাজের গঠনমূলক কাজে যুক্ত ছিলেন। ধীরে ধীরে স্বামীর সঙ্গেই তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯২৮ সালে তিনি কংগ্রেসের সদস্য হন ; তবে এর আগে বহুদিন তিনি কংগ্রেসের কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশের পর তিনি যে সমস্ত ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হন ; তাঁরা হলেন, গান্ধীজী, সরোজিনী নাইডু এবং সি. রাজাগোপালচারীয়া। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তিনি কোনো আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এটা ছিল, "a mere camouflage and a delusion to think of internationalism before strengthening ourselves......... .. from within."

অর্থাৎ এটা ছিল শুধুমাত্র একটি ছদ্মবেশের সাহায্যে প্রতারণা এবং একটি বিভ্রান্তিকর আন্তর্জাতিকতার চিন্তা করা যা নিজেদেরকে শক্তিশালী করবে।

মাদ্রাজের সমস্ত জায়গায় তাঁর কার্যধারা ছড়িয়ে পড়েছিল। একজন মহৎ দেশপ্রেমিক এবং একজন উদ্দীপনাময় কংগ্রেস মহিলা হিসাবে তিনি কংগ্রেসের সেবা করেন ; ১৯৫১ সাল অর্থাৎ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্যা হিসাবে কাজ করে যান। গান্ধীজীর কল্যাণ তহবিলে তিনি তাঁর সমস্ত স্বর্ণলংকার দান করেন সাধারণ দুঃস্থ মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে। কংগ্রেসে অংশগ্রহণের পর থেকেই তিনি সক্রিয়ভাবে কাজে নেমে পড়েন, ১৯৩১ সালে ভেক্তারানয়ামে যে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয় সেখানে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং এক বছরের জন্য কারাবরণ করেন। ভেলোরের জেলের মহিলা রাজবন্দীদের যে বিভাগটি আছে সেটি তাঁকে দিয়েই শুরু করা হয়, তিনিই ছিলেন এই জেলের প্রথম মহিলা রাজবন্দী। ১৯৩২ সালে আইন-অমান্য আন্দোলনে তিনি গেপ্তার হন। একই বছরে তামিলনাড়ু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী এবং সর্বভারতীয় স্বদেশী প্রদর্শনীর (All India Swadeshi Exhibition) সেক্রেটারী হন।

১৯৩৫-৩৬ সালে তিনি তামিলনাড়ু কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৩৬ সালে কারাইকুডিতে যে তামিলনাড়ু প্রাদেশিক সম্মেলন হয় সেখানে রুক্মিণী সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি পুনরায়

মাদ্রাজ বিধানসভায় ফিরে আসেন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির সদস্যা নির্বাচিত হন। মাদ্রাজ প্রথম কংগ্রেস মন্ত্রীসভার তিনি ছিলেন ডেপুটী স্পীকার। এই সময় ১৯৩৮ সালে রুক্মিণী গুডউইল মিশনের একজন সদস্যা হিসাবে জাপান পরিদর্শনে যান। ১৯40 সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তিনি ব্যক্তিগতভাবে যোগদান করলেন ; এর ফলে তাঁকে সেই বছরেই এক বছরের জন্য কারাবরণ করতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন আবার কংগ্রেস নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তখন তিনি ১৯৪৬ সালে টি. প্রকাশমের পরিচালনায় গঠিত মাদ্রাজ বিধানসভার মন্ত্রীসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে তিনি বিধানসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হন এবং মন্ত্রীসভার প্রত্যক্ষ দায়িত্বে না থেকে, এম. এল. এ. (বিধায়ক) পদে কাজ করেন, মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি এ পদে কাজ করে যান।

বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, মাদ্রাজ করপোরেশন বোর্ড, চিংলেপুট জেলা বোর্ড-এ তিনি কিছুদিনের জন্য হন্যারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতবর্ষের কৃষকদের প্রচেষ্টার উপরই কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি নির্ভর করে। শ্রমিকদের অবস্থার সম্বন্ধে তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাদের অবস্থার উন্নতির প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করতেন। ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন না হয়ে তিনি শুধুমাত্র বাস্তববাদী, সামাজিক কুসংস্কারের বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। জাতিগত প্রথাকে তিনি নিন্দা করেন। হরিজনদের মধ্যে থেকে তিনি তাঁর কাজের লোক নিযুক্ত করেন এবং তাদের সঙ্গে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভিন্নতা প্রকাশ না করে তাদেরকে বিভিন্ন কাজে উৎসাহ দিতেন। তিনি গোঁড়া হিন্দুদের সমালোচনা করেছেন। ধর্মের ভয়াবহতা সম্বন্ধেও তাঁর সচেতনতামূলক বক্তব্য তিনি সকলের সামনে তুলে ধরেছেন।

সামাজিক বিভিন্ন অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ সব সময়ই ছিল সোচ্চার, যুবসমাজের কাছে তিনি অনুরোধ করেছেন তারা যেন জাতিগত প্রথা, বাল্যবিবাহ, মাদকদ্রব্য পান, অস্পৃশ্যতা, দেবদাসী ব্যবস্থা প্রভৃতি সমাজের ঘৃণ্য ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে জনগণের মধ্যে এর কুফলগুলি তুলে ধরে জনমত গঠন করবার চেষ্টা করে এবং জনগণের সাহায্যে এসমস্ত কুফলগুলিকে উচ্ছেদ করে। একজন স্বদেশপ্রেমিক হিসাবে শুধুমাত্র

স্বাধীনতা সংগ্রামেই নয়, আঞ্চলিকতাবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদ সমাজে যখন যে রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে তার তিনি তীব্র বিরোধিতা করেছেন। বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদাই মত প্রকাশ করেন এবং যুবসমাজের কাছে তাঁর এই মতের পক্ষে কাজ করবার জন্য সর্বদাই আহ্বান জানান।

শিক্ষা বিষয়ে তাঁর মত ছিল দ্বিবিধ; প্রথম দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি প্রচণ্ড বিশ্বাস থাকলেও পরবর্তীসময়ে তিনি প্রাথমিক এবং বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট আস্থাশীল এবং আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন। প্রাথমিক শিক্ষা আইন (Elementary Education Act) কার্যকরী করবার জন্য এবং এর ব্যাপকতার পক্ষে তাঁর পূর্ণ উদ্যম এবং সমর্থন ছিল; বয়স্কশিক্ষা এবং স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা তাঁর প্রচেষ্টাতেই আইনের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং কার্যকরী রূপ নেয়। কিছুদিনের জন্য তিনি মাদ্রাজ এবং আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্যা ছিলেন। পাশ্চাত্য দেশে বিশেষ করে জাপানে ভ্রমণের সময় তিনি শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনা করেন এবং ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় তার উৎকৃষ্ট এবং ফলপ্রসূ দিকগুলি প্রবর্তন করবার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, "India could not rest content with the old system of education……they should evolve a system which would embrace all prograssive ideas."

পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার কিছু কিছু দিকের প্রতি উৎসাহপূর্ণ দৃষ্টি প্রদর্শন করলেও তিনি ব্রিটিশ শিক্ষানীতির যথেষ্ট সমালোচনা করেন। এ বিষয়ে তাঁর মতামত হোলো এই যে, ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য বিদেশী সরকারের এবং তার আদর্শের কাছে আনুগত্য স্বীকার করা। তিনি বলতেন যে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও শিক্ষা যুবসমাজের মধ্যে দাসত্বের মনোভাব তৈরী করে। ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাকে মিলিটারী প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করবার পক্ষে তাঁর সমর্থন ছিল। সহজ, বীরোচিত সাহসে পরিপূর্ণ মনোভাবের এই মহিলা তাঁর সাংসারিক জীবন থেকে উন্নীত হয়ে নিজেকে একজন সমাজ-সংস্কারক এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামী হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন, তাঁর সমাজ-সংস্কারের এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিষয়ের উপর বহু প্রবন্ধ তদানীন্তন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া তাঁর আরো একটি যে প্রতিভা সর্বসমক্ষে প্রকাশিত ছিলো তা হোলো তিনি ছিলেন একজন সংগীতজ্ঞ এবং শক্তিশালী বক্তা।

সমস্ত কংগ্রেসকর্মী এবং নেতৃত্ব তাঁকে সম্মান দিতেন ও ভালবাসতেন ; তিনি ছিলেন তাদের সকলের 'মাম্মী'। ১৯৪২ সালে যখন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় স্তরের নেতৃরা গ্রেপ্তার হয়ে কারাবরণ করেছেন এবং সমগ্র কংগ্রেসপার্টি বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়েছে, তখন তিনি জেলের বাইরে থেকে তামিলনাড়ু কংগ্রেস প্রাদেশিক কমিটির কার্যকরী সভাপতি-রূপে দলের গুরুদায়িত্ব পালন করে যান অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। আদর্শগত দিক দিয়ে যদিও ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস পদত্যাগ করে, সেই সময় তিনি কংগ্রেস প্রতিনিধিদের কেন্দ্রীয় বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজয়ী হন।

যে সমস্ত মহান নেতৃত্ব দেশের জন্য সারাজীবন উৎসর্গ করে-ছিলেন, রুক্মিণী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন। জাতীর উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে গিয়েছেন। ১৯৫১ সালে এই মহিয়সী ভারতের মাটির মায়া ছেড়ে চিরদিনের জন্য মৃত্যুর অনন্ত অজানালোকে চলে গেলেন, ভারতবাসীর জন্য রেখে গেলেন শুধুমাত্র তাঁর সমস্ত কর্মমুখর জীবনের কিছু সংগ্রামী স্মৃতি।

রাণী গুঁইদালো

(১৯০৫—   )

"We are a poor people, the white men should not rule over us, we will not pay house tax to the Government, we will not obey their unjust laws like forced labour and compulsory porter subscription."—

আমরা দরিদ্র মানুষ, শ্বেতাঙ্গদের উপর আমাদের শাসনক্ষমতা দেওয়া উচিত নয়, আমরা সরকারকে বাড়ীর ট্যাক্স দেব না; জোরপূর্বক শ্রম, বাধ্যবাধকতাজনিত দাসবৃত্তির স্বাক্ষর গ্রহণ প্রভৃতি অযৌক্তিক আইন মানব না।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার যখন ভারতের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল তখন মণিপুরের পাহাড়ী এলাকাগুলিতে ব্রিটিশ শাসনের স্বেচ্ছাচারিতা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক নারীর কণ্ঠ সোচ্চার হয়েছিল; তিনি তাঁর সহযোগী অনুসরণকারীদের কাছে তাঁর প্রতিবাদের ভাষা ব্যক্ত করেছিলেন, উল্লিখিত লাইনগুলি দিয়ে। সেদিন এই নারীর নেতৃত্বে মণিপুরের নাগাদের মধ্যেও জেগেছিল স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা, যা কার্যকরীরূপ নিয়েছিল পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যেই।

মণিপুর রাজ্যের ট্রান্সবরাক নদীর অববাহিকায় অবস্থিত পশ্চিম নাঙ্গকাও জেলার করাই গ্রামে ১৯১৫ সালে ২৬-শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার এই বীর নারী জন্মগ্রহণ করেন; ইনিই রাণী গুঁইদালো। পিতামাতার আট সন্তানের মধ্যে তিনি তৃতীয় সন্তান। করাই গ্রামে গুঁইদালোর পরিবার ছিল খুবই প্রভাবশালী বংশের। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন স্বাধীন মনভাবাপন্ন এবং দৃঢ় মানসিকতার মেয়ে। তাঁর পুরুষসুলভ কার্যকলাপে গ্রামের মহিলারা ভ্রুকুটি করত। জাডোনাং ছিলেন সেই সময়

মণিপুরের নেতা ; মণিপুর থেকে ব্রিটিশকে তাড়াবার জন্য তিনি ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যান। তেরো বছর বয়সে গুইদালো জাডোনাং-এর সঙ্গে পরিচিত হন ; তাঁর সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপে গুইদালো জাডোনাং-এর প্রতিনিধি-স্বরূপ হয়ে উঠলেন। সর্বদা তিনি জাডোনাং-এর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত অনুসরণ করতেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মোৎসর্গ করলেও আন্দোলনের কার্যকরী রূপ নেবার আগেই ১৯৩১ সালের ২৯-শে আগষ্ট জাডোনাং ব্রিটিশের দ্বারা গ্রেপ্তার হন ; বিচারে তাঁর ফাঁসী হয়। সুতরাং ১৯৩১ সালের পরই গুইদালো একা হয়ে পড়লেন ; কিন্তু তিনিই জাডোনাং এর আদর্শকে পরবর্তী জীবনে কার্যকরী রূপ দেন।

জাডোনাং-এর মৃত্যুর পর, গুইদালো স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার দায়িত্বভার নিজেই গ্রহণ করলেন। ব্রিটিশ শাসক পাহাড়ী এলাকা-বাসীদের ভয়ে ভীত ছিল, কারণ এই এলাকার মানুষরা হোলো জঙ্গী। তাই ব্রিটিশ এই এলাকাগুলিতে কড়া শাসনের ব্যবস্থা করল ; তারা বিদ্রোহীভাবাপন্ন গ্রামগুলিতে সংঘবদ্ধভাবে এগোবার ব্যবস্থা করল এবং সেই সব এলাকার লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুকগুলির লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করল। সরকারী আমলারা ছিল প্রচণ্ড স্বেচ্ছাচারী ও উদ্ধত। গুইদালোর দায়িত্বে ছিল ট্রান্সবরাক নদীর অববাহিকা অঞ্চল, তাঁর পরিচালনায় এইসব এলাকায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল সামাজিক, ধর্ম সম্বন্ধীয় ও রাজনৈতিক ; সামাজিক দিক দিয়ে, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তিন ধরনের উপজাতি নাগাদের (জেমি, লেইনজোম এবং রণংমাই) একত্রিত করা। তাঁর ধর্ম ছিল 'হরকা' অর্থাৎ অপবিত্র নয়। রাজনৈতিক কর্মসূচির দিক দিয়ে জাডোনাং-এর আদর্শকে কার্যকরী রূপ দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। জাডোনাং যদিও গান্ধীজীর সংস্পর্শে দুই-একবার এসেছিলেন, কিন্তু গুইদালো তাঁর রাজনৈতিক প্রচারকার্যের ক্ষেত্রে গান্ধীজীকেই 'জাতির জনক' হিসাবে ব্যবহার করতেন।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের কার্যধারার বিষয় তিন তাঁর অনুসরণ-কারী সহযোগীদের বলতেন। জাডোনাং-এর মৃত্যুর পর জনসাধারণ গুইদালোর নেতৃত্বই মেনে নিয়েছিল। তিনি যা বলতেন, তারা তা বিশ্বাস করতো এবং তাদের ভক্তি ও ভালবাসা গুইদালোর প্রতি এত প্রগাঢ় ছিল যে তাঁকে জনসাধারণ দেবীর মতো দেখতো। তাঁর অনুসরণ-কারীদের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে এই উচ্চধারণার জন্য ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে

কর্তৃপক্ষরা এবং বেশ কিছু লেখক অজ্ঞতার বশেই বলত যে তিনি নিজেকে দেবীরূপে প্রচার করেছেন, যেটা মোটেই সত্য নয়।

জাডোনাং-এর মৃত্যুর পর মনিপুরের পশ্চিমের জেলাগুলি, দক্ষিণ নাগাল্যাণ্ড এবং আসামের উত্তর কাছাড় অঞ্চল প্রভৃতি অঞ্চলের যে সমস্ত অঞ্চল বিদ্রোহের বাতাস থেকে দূরে সরে ছিল সেখানেও বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। গ্নুইদালোকে এইসময় আত্মগোপন করতে হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার এই সতেরো বছর বয়সের দুর্ধর্ষ বালিকার নেতৃত্বে উজ্জীবিত বিদ্রোহী জনগণ সম্বন্ধে তটস্থ হয়ে পড়েছিল। কারণ এই বিদ্রোহী বাহিনী কোনো জালিয়াতি বা গুণ্ডাদল নয় এবং গ্নুইদালো দেবীত্বের প্রচণ্ডতায় ঈশ্বরের রকেট থেকে ছড়িয়ে পড়া অর্থবৃদ্ধির মতোও ছিল না; এটা ছিল সংগঠিত এবং জনপ্রিয় রাজনৈতিক বিদ্রোহ। বিদ্রোহ সংগঠিত করবার জন্য জনসাধারণ এগিয়ে এলো; মনিপুর ও নাগা পাহাড়ের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য তারা অর্থ এবং জনবল সংগ্রহ করার কাজে নেমে পড়লেন এবং প্রচুর পরিমাণে অর্থ ও বিপুল সংখ্যক দেশপ্রেমিক মানুষ দেশের স্বাধীনতার কাজে এগিয়ে এসে জড়ো হোলো। স্বাধীনতা লাভের জন্য তাঁরা শুধুমাত্র গ্নুইদালোকেই নেত্রী করে এগিয়ে এসেছিল।

ব্রিটিশ সরকার তখন মরিয়া হয়ে উঠল। তারা এত বিদ্রোহের অবসানকল্পে একটি মাত্র পথ বেছে নিল, তা হোলো গ্নুইদালোকে সরকারী হাজতে রুদ্ধ করা। বিদ্রোহের এই ভয়াবহতা দেখে আসামের গভর্নর-ইন-কাউন্সিল নির্দেশ দিলেন যে, গ্নুইদালোর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য নাগাপাহাড়ের ডেপুটি কমিশনার মিঃ জে. পি. মেলস্-এর উপর দায়িত্ব দেওয়া হোক কেন্দ্রীয়ভাবে বিদ্রোহকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনবার। আসামের বন্দুকধারী সৈন্যদের একটা বড় দলকে তিনটি জেলাতেই পাঠিয়ে দেওয়া হোলো; উত্তর কাছাড় পাহাড়ের এস. ডি. ও-কে সাহায্য করবার জন্য এবং মণিপুর রাজ্যের জে. পি. মেলস্‌কে সাহায্য করবার জন্য একজন করে অফিসারও দেওয়া হোলো। যুদ্ধের পথে উপযুক্ত জায়গাগুলি বেছে নেওয়া হোলো মণিপুর ও আসাম রাজ্যের যে সব জায়গায় ঘাঁটি করা সম্ভব হয় সেই সব জায়গায় এবং সেইমত কাজও হোলো। গ্নুইদালোকে খুঁজে বার করবার জন্য ব্রিটিশ পক্ষের অফিসাররা উঠে পড়ে লাগল, তিনটি জেলার সমস্ত জায়গায় গ্নুইদালোর ফটো বিলি করে দেওয়া হোলো।

এছাড়া কিশোরীদের উপর চলল চরম জুলুম, গুইদালো নামের সমস্ত কিশোরীদের নানানভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোতো এবং একথাও বলবার যে সেদিন বহু কিশোরী নিজেদের নাম পরিবর্তন করতে লাগল; গুইদালো নামের সমস্ত কিশোরীরা সেদিন ব্রিটিশ প্রশাসনের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। গুইদালো নিজেও নিজের নাম পরিবর্তন করে 'দিলেন লো' নাম রাখলেন। মণিপুর রাজ্যের রাজদরবারের প্রেসিডেন্ট মিঃ হারভি গুইদালোকে গ্রেপ্তার করবার জন্য দুইশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেন এবং এই টাকার অঙ্ক বাড়তে বাড়তে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত পেঁছোল। এর সঙ্গে আরো ঘোষণা করা হোলো যে, যদি কোনো গ্রামের মানুষ তাঁর খবর দিতে পারে তবে সেইগ্রামের দশ বছরের খাজনা মকুর হবে।

এত পুরস্কার ও প্রলোভন সত্ত্বেও, উত্তর কাছার পাহাড়ে এবং কেপেলোর মাসাং-এ গুইদালো গা-ঢাকা দিয়ে থেকেছেন, গোপনে তাঁর প্রতিনিধিরা আন্দোলনের খবর পেঁছে দিয়েছে, তবুও একদিনের জন্যও প্রতিটি নর-নারী তাদের প্রিয় নেত্রীর একটি খবরও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কানে পেঁছে দেয়নি। মণিপুর সরকার তখন বিদ্রোহের সমর্থনকারীদের চরম শাস্তির ব্যবস্থা করবার পরিকল্পনা নিলেন এবং এর কার্যকরীরূপ দিলেন বেশ কিছু গ্রাম পুড়িয়ে দিয়ে। ১৯৩২ সালের ১৬-ই ফেব্রুয়ারী আসামের বন্দুকধারী সৈনিকরা উত্তর কাছাড় পাহাড়ের বিপ্লবীদের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ করেছিল। দীর্ঘ এবং জটিল পদ্ধতি অনুসরণ করে তারা যুব বিপ্লবী নেতৃত্বদের গ্রেপ্তার করবার জন্য চেষ্টা করেছিল, যদিও ততটা সাফল্য হয়নি। ১৯৩২ সালের মার্চ মাসে একটা বড় সংখ্যক নাগা-বাহিনী দিনের আলোয় হানগ্রাম ঘাঁটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এরা শুধুমাত্র ডোটা এবং লাঠি নিয়ে সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করেছিল যা বন্দুকধারী সৈন্যদের রুখবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সীমান্তরক্ষীরা ফায়ার করা শুরু করল; এর ফলে কয়েকজন নাগা নিহত হোলো। এই আক্রমণের ফলে নাগা পাহাড়ের বুপাগওয়েমি গ্রামেও আগুন জ্বলে উঠল; গুইদালো এই সময় মণিপুর রাজ্যের সীমান্তের গ্রাম অ্যানীগামী গ্রামের দিকে রওনা হলেন, এটি পূর্বাভিমুখী সীমান্ত গ্রাম। মনিপুরের প্রায় বেশীর ভাগ অঞ্চলেই গুইদালোর প্রভাব ছিল। উত্তর মণিপুরের মাও অঞ্চলের ম্যারাম নাগাদের মধ্যেও তাঁর প্রভাব পড়েছিল, এমনকি রাজধানী কোহিমাতেও তাঁর প্রচুর সমর্থক ছিল। গুইদালোকে এই অঞ্চলে দেবীর মতো পুজো করা হোতো। 'গুইদালো পানি'

(Guidinliu water) অ্যানীগামী গ্রামে চড়া দামে বিক্রি হোতো।

ডেপুটি কমিশনার মিঃ জে. পি. মিলস্, খুব শীঘ্রই রিপোর্ট পাঠালেন যে, আন্দোলনের ভয়াবহতা এখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, এ-আন্দোলনের তীব্রতা কমাবার একটি মাত্র পথ তার মাথায় এলো, তা হোলো, গুইদালো এবং খোনামা গ্রামের শক্তিশালী নাগাদের মধ্যে শত্রুতা বাঁধানো। গুইদালোর বেশ কিছু গুপ্তচর কোহিমায় কাজ করছিলেন, তাঁরা আসাম বন্দুকধারীদের গতিবিধির প্রতি নজর রাখছিলেন। সময়টা ১৮৭৯ সাল, অক্টোবর মাসে গুইদালো পেলোমী গ্রামের দিকে এগোলেন এবং সেখানে একটি বিস্ময়কর কাঠের দুর্গ তৈরী করবার কাজ শুরু করলেন; বিস্ময়কর বলছি এজন্য যে দুর্গটির ডিজাইন ঠিক করা হোলো হানগ্রামের পলিসেভের আসাম বন্দুকধারীদের আস্তানার জন্য যে দুর্গটি তৈরী করা হয়েছিল ব্রিটিশের পক্ষ থেকে, ঠিক সেই দুর্গটির অবিকল একটি নকল দুর্গ হিসেবে।

গুইদালো তার দলের লোকদের বললেন যে, আগামী দু'মাসের জন্য তাদের দলের কর্মসূচী হবে গুরুত্বপূর্ণ, হয় ব্রিটিশ, না হয় তিনি জয়ী হবেন। দুর্গটিতে একসঙ্গে চারহাজার সৈন্য থাকবার ব্যবস্থা করা হবে ঠিক করা হোলো। গুইদালো আসামের বন্দুকধারী সৈন্যদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা করবার জন্য তাঁর লোকদের তৈরী করবার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। এই কার্যকলাপের রিপোর্ট ইতিমধ্যেই সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের মারফত মিঃ মিলসের কাছে পেঁছলো; তিনি তখন আসামের বন্দুকধারী সৈন্যদের একটা ফোর্স ক্যাপ্টেন ম্যাকডোনাল্ডের তত্ত্বাবধানে পাঠিয়ে দিলেন, পুলোমীর মিঃ হরি ব্রাহকে সাহায্য করবার জন্য। ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাস, দুর্গ তৈরীর কাজ তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। যোদ্ধারাও সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা নেয়নি; হঠাৎ ১৭-ই অক্টোবর ক্যাপ্টেন ম্যাক-ডোনাল্ড পুলোমী গ্রাম আক্রমণ করলেন।

বিপ্লবী যোদ্ধারা হতবাক হয়ে গেল, বাধা দেবার মত ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তারা সক্ষম হোলো না। তাই তারা আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হলো। গুইদালো গ্রেপ্তার হলেন; তাঁকে কোহিমায় নিয়ে যাওয়া হোলো। এখানে ইম্ফল জেলে জেরা করবার জন্য তাঁকে আনা হোলো। সরকারী পক্ষে মিঃ হিগিনস্ তাঁকে রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। তাঁকে যথাক্রমে একবছর

গৌহাটি, ছয় বছর শিলং, তিনবছর আইজল ও মিজোপাহাড়ে, চারবছর গারো পাহাড়ের টুরার জেলে কারাবাসে থাকতে হয়। এই ঘটনায় গুইদালোর দলের প্রায় সমস্ত কর্মীদেরই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু গুইদালোর গ্রেপ্তার ও কারাবাসের কথা সবচেয়ে বেশী ছড়িয়ে পড়েছিল জনগণের মধ্যে; তারা এর প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করলেও সামর্থ্য অনুযায়ী পেরে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব পর হোলো না। তাঁর সহযোগীদের মধ্যে যাঁরা জেলের বাইরে ছিলেন তাঁরা কয়েক বছর আন্দোলন অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

১৯৩৭ সালে যখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আসাম পরিদর্শনে আসেন, তখন তিনি গুইদালোর আন্দোলনের ইতিহাস শোনবার পর মুগ্ধ হয়ে গেলেন, সঙ্গে দুঃখিত হলেন;—এইভাবে একজন কুড়ি বছরের যুবতীকে এত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তিনি তাঁকে নাগাদের রাণী বলে আখ্যা দেন এবং সেই থেকে গুইদালো রাণী নামে খ্যাত হয়ে আছেন। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর মুক্তির জন্য চেষ্টা করা হয়, কিন্তু যেহেতু মণিপুর সরাসরি ব্রিটিশ শাসনে ছিল না, সেইকারণেই এ চেষ্টা ব্যর্থ হোলো। গুইদালোর মুক্তির জন্য পণ্ডিত নেহেরু তৎকালীন পার্লামেন্টের মহিলা সদস্য লেডি অস্টারকে অনুরোধ জানালেন। লেডি অস্টার এ ব্যাপারে চেষ্টা করলেও তা ফলপ্রসু হোলো না, ব্রিটিশ সরকারের সেক্রেটারী অব্ স্টেট গুইদালোর ব্যাপারে রাখা লেডি অস্টারের অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করে; কারণ ব্রিটিশের ধারণা ছিল গুইদালোকে মুক্ত করলে আন্দোলন আরো ভয়াবহ হবে; আন্দোলনের এখনও পরিসমাপ্তি ঘটেনি, যদি গুইদালোকে মুক্ত করা হয়, তবে তিনি আবার আন্দোলনের ভয়াবহতা মণিপুর ও আসাম রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এসে এখানের শান্তি বিঘ্নিত করবেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু গুইদালোর মামলার ঘটনা সম্বন্ধে পত্রিকায় প্রকাশ করে মন্তব্য করেন—

'Perhaps she thought rather prematurely that the British Empire still functioned effectively and aggressively, it took vegeane on her and her people. Many villages were brunt and destroyed and this heroic girl was catared and sentenced to transportation foı life, And now she lives in some prison in Assam wasting her

bright young womenhood in dark cells and solitude: Six years she had been there. What torment and suppression of spirit they have brought to her, who in the pride of her youth dared to challenge an Empire."

পণ্ডিত নেহেরু চেষ্টা সত্ত্বেও সেদিন গুইদালোকে কারামুক্ত করা গেলো না। অবশেষে, ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলে স্বাধীন ভারতের পক্ষ থেকে টুরা জেল থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। জেল থেকে মুক্ত হবার পর আর তাঁকে মণিপুরে ফিরে যেতে দেওয়া হোলো না। সরকার থেকে তাঁকে মাসিক কিছু ভাতা দেবার ব্যবস্থা হোলো, তিনি নাগাল্যাণ্ডের মোকোকচুনং জেলার ভিমারুপ নামক স্থানে রইলেন। এরপর তিনি বলতে গেলে সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর নিয়েছিলেন; চৌদ্দ বছর এভাবে কাটানোর পর তাঁকে প্রয়োজনে সক্রিয় হতে হোলো; ১৯৫৬ সালে নাগাদের মধ্যে একটা সমস্যা দেখা দিল, সে সমস্যা ছিল ধর্ম নিয়ে; গুইদালো এবং তাঁর ধর্মের (হরকা) উপর আক্রমণ এলো। নাগাদের মধ্যে থেকে তাঁদের প্রতিনিধি মারফত গুইদালো সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা করা হোতে লাগল। গুইদালো এর প্রতিবাদ করবার জন্য ১৯৬০ সালে তাঁর দলের কর্মীদের নিয়ে গোপনে চারশত/পাঁচশত বন্দুকধারী সহ এক হাজার লোকের এক সৈন্যদল গঠন করলেন, তাঁর ধর্মকে রক্ষা করবার জন্য।

মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড এবং আসামের অন্তর্ভুক্ত নাগা অঞ্চল,—জেমি, লিয়েনমেই এবং রংমেই অঞ্চলের প্রসাশনিক দাবী আদায়ের জন্য, নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য, এই ব্যাপারে তাঁকে গোপনে কাজ করতে হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে আত্মগোপন করতে হয়েছিল। সরকার থেকে তাঁর ডাক পড়বার জন্য ছয়বছর আত্মগোপন করে থাকা কঠোর জীবন থেকে তিনি বাইরে বেড়িয়ে এলেন। ১৯৬৬ সাল থেকে তিনি কোহিমায় চলে এলেন। এবং এখানেই বাস করতে লাগলেন। এরপর থেকে তিনি জনগণের শান্তি ও উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। রাণী গুইদালো ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী মহিলা। তিনি ছিলেন একজন দানবতী। একজন নাগা হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের মঞ্চে তিনি যে সম্মান এবং মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন তা নাগাদের মধ্যে বিশেষ করে নাগা মহিলাদের মধ্যে একটা জাজ্বল্য উদাহরণ রেখে যেতে সক্ষম হয়েছে।

লীলাবতী মুন্সী

(১৮৯৯—   )

আমাদের দেশের জন্য যে সমস্ত বিবাহিত দম্পতি ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে নিজের জীবন এবং সংস্কৃতিকে উৎসর্গ করেছেন, লীলাবতী মুন্সী তাঁদের মধ্যে একজন। ১৮৯৯ সালে আমেদাবাদের এক জৈন পরিবারে লীলাবতী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কেশবলাল ছিলেন একজন ব্যবসায়ী এবং মাতা মতিবাঈ একজন জৈনভক্ত মহিলা। শৈশবে লীলাবতীর শিক্ষাগ্রহণ হয় আমেদাবাদে, পরবর্তী সময়ে তিনি বোম্বাই-এর পঞ্চগিরি কনভেণ্টে ভর্তি হন। সেখানে তিনি ইংরাজী শিক্ষা করেন, এছাড়া গৃহশিক্ষা হিসাবে সংস্কৃত শিক্ষাগ্রহণ করেন। চোদ্দ বছর বয়সে লালভাই ত্রিকামলাল শেঠের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু এ বিবাহ তাঁর সুখের হয়নি; কারণ তাঁর স্বামী ছিলেন গোঁড়া এবং স্বাধীন মনোভাবের চরিত্রের মানুষ। এ ধরনের পুরুষের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া লীলাবতীর সম্ভব হোলো না; তাই তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়।

এ সময় থেকে তিনি সাহিত্য-চর্চার দিকে নজর দিলেন এবং এই সময় থেকেই তাঁর লেখার জীবন শুরু হয়। সাহিত্যিক জীবনে প্রবেশ করবার কিছুদিনের মধ্যে কানাইলাল মুন্সীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ১৯২৬ সালে তাঁর প্রথম স্বামীর মৃত্যু হবার পর তিনি দ্বিতীয়বার কানাইলাল মুন্সীর সঙ্গে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেন। কানাইলাল মুন্সী ছিলেন মার্জিত ব্রাহ্মণ, ভিন্ন জাতের বিবাহের জন্য তাঁদের নবদম্পতীকে এক প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তাঁরা সাফল্যজনকভাবে এ অবস্থার পরিবর্তন করেন। দ্বিতীয় বিবাহের পূর্ব থেকেই লীলাবতী জনসেবার কাজে নিজেকে যুক্ত করতে থাকেন।

১৯২০ সালে বি. জি. তিলকের আহ্বান এলো তহবিল সংগ্রহের জন্য, তিনি নেমে পড়লেন তিলকফাণ্ডে অর্থসংগ্রহের কাজে।

১৯৩০ সালে গান্ধীজীর লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তাঁর উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়; এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবার জন্য ১৯৩২ সালে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। ১৯৪০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তাঁকে আবার কারাবরণ করতে হয়। এই একই সময়ে একই সঙ্গে জাতীয়তা আন্দোলনে অন্যান্য বিবিধ গঠনমূলক কর্মসূচীর সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তদানীন্তন সময়ে বিভিন্ন গঠনমূলক সংগঠনের সঙ্গে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; এগুলি হোলো—মহারাষ্ট্র প্রদেশ কমিটি, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে ১৯৩১ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত; ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত বোম্বাই প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে। ১৯৩১ সালে তাঁকে বোম্বাই সরকারের স্বদেশী-পার্চেজ কমিটির একজন সদস্যা নির্বাচিত করা হয়। ১৯৪৩ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বোম্বাই-এর হরিজন সেবক সংঘের সভাপতি হিসাবে হরিজনদের মধ্যে কাজ করেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত, এই দশ বছর সময়ের জন্য তিনি বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের সদস্যা ছিলেন; ১৯৩৫ থেকে ১৯৫২ সালের এই সময়ের জন্য তিনি বোম্বাই বিধানসভার সদস্যা নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্যা নির্বাচিত হন। হিন্দি বিদ্যাপীঠের সভাপতি এবং রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির সহ-সভাপতি হিসাবে বেশ কিছুদিনের জন্য তাঁকে কাজ করতে হয়।

লীলাবতীর নেতৃত্বে ভারতের নারীর মর্যাদা রক্ষার একজন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে নারীদের জন্য সমান অধিকারের প্রশ্নে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম আন্দোলন সংগঠিত হয়। নারীদের সামাজিক সংস্কারসাধনের কাজে সংগঠিত নারী সংগঠনের তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় নেত্রী। এছাড়া বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, এগুলি হোলো—'বোম্বে মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অন চিল্ড্রেন এড সোসাইটি', 'বোম্বে ইনফ্যাণ্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি', পশ্চিম ভারতের 'বোম্বে সোসাইটি ফর দি প্রোটেকশন অব চিল্ড্রেন ওমরকাহাড়ি', 'ওম্যান রেসকিউ হোম', 'গুজরাট শ্রীমণ্ডল', 'আদম ওয়ালিয়ে হসপিটাল', 'ভগিনী সমাজসেবা মন্দির'

এবং অন্যান্য কয়েকটি সংগঠনের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এইসব সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করবার দায়িত্বও ছিল তাঁর উপর।

স্বাধীনতালাভের পরও তাঁকে কর্মজীবনের গতি অব্যাহত রাখতে দেখা গিয়েছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে তিনি বোম্বাই মহিলা সংস্থার (বোম্বে ওম্যান এ্যাসোশিয়েশন) সভাপতি হন। তিনি ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ ওম্যান ইন ইন্ডিয়ার সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত এপদে আসীন থেকে কাজ করেন। তিনি ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ভারতীয় স্ত্রী সেবা সংঘের সভাপতি নির্বাচিত হন, ১৯৪৮-৪৯ সালের জন্য অল ইন্ডিয়া ওম্যানস্ কনফারেন্সের বোম্বাই শাখার সভাপতি, ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত লক্ষ্ণৌ নার্সিং এ্যাসোশিয়েশনের এবং লক্ষ্ণৌ মতিনগর মহিলা আশ্রমের সভাপতি হিসাবে কাজ করেন।

লীলাবতী তাঁর স্বামীর সাহিত্যজ্ঞান, ধর্ম এবং শিক্ষার আদর্শে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। গুজরাটী সাহিত্যের উপর তাঁর বেশ দখল ছিল এবং এই ভাষার উপর তিনি সাহিত্যও সৃষ্টি করেছেন বেশ কিছু। গুজরাটী সাহিত্যের অবদানরূপে তাঁর আছে চারটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—'রেখাচিত্র এনে বিজালেখা' (১৯২৫)—এখানে কয়েকজন প্রতিকৃত শিল্পী এবং লেখকের সম্বন্ধে লেখা আছে, 'কুমার দেবী' (১৯২৯)—এটি ঐতিহাসিক নাটক, 'জীবন মনথি জাদেলি' (১৯৩২)—এখানে আত্মজীবনীর কিছু অংশ লেখা আছে এবং 'রেখাচিত্র জুনা এন্ড নভ' (১৯৩৫) অর্থাৎ নতুন এবং পুরাতন প্রতিকৃত শিল্পী ও অন্যান্য লেখকদের সম্বন্ধে লেখা। তাঁর সহজবোধ্য রচনাশৈলী, সহজ ভাষা এবং স্বচ্ছ ব্যাখ্যা করবার ক্ষমতার জন্য তিনি জনপ্রিয় লেখিকা হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

ধর্মের সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল যুক্তিপূর্ণ। জন্মসূত্রে জৈন হলেও স্বামীর শৈবধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থ 'গীতা'র আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হন। এমন কি ১৯৬৪ সালে তিনি আন্তর্জাতিক যীশুখৃষ্টের নৈশভোজ সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে (ইন্টারন্যাশনাল ইউক্যারিসসিক্ কংগ্রেস) আমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও ব্রিটিশ শিক্ষানীতির সমালোচনা করে গিয়েছেন সোচ্চার কণ্ঠেই। ভারতীয় বিদ্যাভবন এবং কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। এইসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে তিনি প্রাচীন শিক্ষার মূল্যকে পুনরুজ্জীবিত করবার

চেষ্টা করেন। কৃষি, ফুলের বাগান তৈরী করা, ঘোড়ায় চড়া, রান্নাকরা, রেডক্রশ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল এবং বহু শিক্ষাগত মূল্যমানসম্পন্ন বিষয়ের প্রদর্শনী তাঁর সংগঠিত প্রচেষ্টাতেই হয়। তাঁরই প্রচেষ্টায় এদেশে প্রথম রান্না শেখাবার কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভ্রমণ ছিল তাঁর নেশা। ইউ. কে., ইউ. এস. এ., জাপান, ইস্রায়েল, ইউরোপ মহাদেশে তিনি ভ্রমণ করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি পৃথিবী ভ্রমণের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, কিন্তু তা সম্পূর্ণ প্রতিপালন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সক্রিয় জনজীবন এবং গৃহ জীবনের ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি ছিল সর্বোতভাবে ব্যাপক। কে. এম. মুন্সীর কাছে এবং গৃহ-জীবনের ক্ষেত্রে, এমন কি কর্ম জীবনের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা, সক্ষমতা, সহযোগিতা, ধৈর্য কল্পনাশক্তি এবং পৃথিবীকে বুঝবার ক্ষমতা প্রভৃতি গুণের অধিকারিণী এই দেশপ্রেমিকা আমাদের কাছে স্মরণীয় হবার দাবী রাখে।

লীলা রায় (নাগ)

(১৯০০—১৯৭০)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার যখন দেশের সর্বত্র প্লাবিত তখন দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ ভারতবাসীর সঙ্গে কিশোরী ছাত্রীরাও হাতে হাত রেখেছিলেন। তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন দেশমাতৃকার বন্ধন মুক্ত করতে সংঘবদ্ধভাবেই। সময় বিংশ শতাব্দী-দ্বিতীয় দশকের বলতে গেলে শেষ প্রান্ত। স্কুল কলেজের ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও তাঁদের সত্তাকে উপলব্ধি করলেন। ১৯২৬ সালে ঢাকায় বিপ্লবী চেতনা নিয়ে গড়ে ওঠে 'দীপালী সংঘ' নামে ছাত্রীদের এক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠবার মূলে ছিলেন ছাব্বিশ বছরে এক যুবতী, নাম লীলা নাগ (রায়)।

১৯০০ সালে আসামের গোয়ালপাড়ায় এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারে লীলা নাগের জন্ম। তাঁর পিতা গিরিশচন্দ্র নাগ ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। মাতা শ্রীমতী কুঞ্জলতা দেবী ছিলেন একজন শিক্ষিতা মহিলা। মাতামহ প্রকাশচন্দ্র দেব ছিলেন আসামের সেক্রেটারিয়েটের প্রথম ভারতীয় রেজিষ্ট্রার। পিতা এবং মাতামহ দু'জনেই সরকারী চাকুরীয়া হওয়া সত্ত্বেও লীলা শৈশবে তাঁর পিতাকে দেখেছেন জাতীয় আন্দোলনের এবং স্বদেশী বস্ত্র গ্রহণ, বিদেশী জিনিস বর্জনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে। ১৯০৫ সালে অর্থাৎ তাঁর পাঁচ বছর বয়স থেকে লীলা নাগ দেখেছেন, তাঁদের বাড়ীতে বিলাতী বস্ত্র বর্জন করে, পরিবর্তে বঙ্গলক্ষ্মীর মোটা কাপড় প্রত্যেকের বরাদ্দ হিসাবে ব্যবহার করতে। জাতীয় আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের ক্ষেত্রে বহু নিদর্শনের মধ্যে একটি নিদর্শনস্বরূপ তিনি দেখেছেন, ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিনে এই পরিবার অশ্রুবর্ষণ এবং অরন্ধনের মধ্যে দিয়ে বাংলার প্রথম শহীদের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে।

পিতা মাতা এবং মাতামহর কাছ থেকে লীলা দেশ বিদেশের উত্থান-পতনের ইতিহাস শুনতেন। ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি, নেপোলিয়ান প্রমুখের জীবনের ঘটনাবলী এই কিশোরী মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। লীলা নাগের মাতা ছিলেন একজন বিদুষী মহিলা ; শৈশব থেকেই তিনি কন্যাকে শিখিয়েছিলেন ত্যাগের মধ্যে দিয়ে সেবা করতে হয়। মায়ের শিক্ষা, পরিবারের পরিবেশ লীলাকে জাতীয়তা ও স্বদেশীকতার ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। গোয়ালপাড়ায় থাকা-কালীন শৈশবের কিছুসময় বাড়ীতেই শিক্ষালাভ করেন। পরে আসামের প্রাইমারী স্কুলে এবং ইডেন হাইস্কুলে শিক্ষালাভ করেন। বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় তিনি বেথুন কলেজে ভর্তি হন। ১৯২১ সালে লীলা মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে 'পদ্মবতী' স্বর্ণপদক সম্মানপূর্বক বি. এ. (স্নাতক) পাশ করেন। এইসময় তাঁর পিতা স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস আরম্ভ করলে তাঁদের ঢাকায় চলে যেতে হয়।

লীলা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পড়বার জন্য ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেইসময় ছেলেমেয়েদের সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় তাঁকে প্রথমে ভর্তির অনুমতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু তাঁর দৃঢ়তার ও শিক্ষার আকাংখা শেষ পর্যন্ত কার্যকরীরূপ নিয়েছিল অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ক্লাসে সহ শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। ১৯২৩ সালে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ছাত্র জীবনের শুরু থেকেই লীলা ছিলেন ছাত্রী নেতা। বেথুন কলেজে তাঁর চেষ্টাতেই বিভিন্ন সেমিনারের ব্যবস্থা হোতো। বেথুন কলেজের ছাত্রী বি. ইউনিয়ন গড়ে ওঠে যাঁদের প্রচেষ্টায় লীলা নাগ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে এবং প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে আন্দোলনের পক্ষে তাঁর সংগ্রামী মন সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকে। তিনি 'নিখিল বঙ্গ নারী ভোটাধিকার কমিটি'র (All Bengal Women's suffrage Committee) সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯২১ সালেই তিনি এই কমিটির সহ-সম্পাদিকা হন। সহ-সম্পাদিকার দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নারীর সামাজিক ও আর্থিক অধিকার রক্ষার সপক্ষে জনমত গঠন

করবার জন্য বহু সভাসমিতির আয়োজন করতে থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ শেষ করে লীলা দেশের সেবায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর কর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল ঢাকা এবং কলকাতা। নারী শিক্ষার পক্ষে ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বারোজন মহিলা সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি 'দীপালী সংঘ' স্থাপন করেন। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে 'দীপালী সংঘের' উদ্যোগে বারোটি অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল এবং 'নারী শিক্ষা মন্দির' ও 'শিক্ষাভবন' নামে দু'টি ইংরেজী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সব কর্মসূচীর পূর্ণ রূপদানে লীলা নাগের প্রচেষ্টাই ছিল মুখ্য। এ ছাড়া 'দীপালী স্কুল' নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ও তিনি স্থাপন করেছিলেন।

এইসব উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে বিদ্যাশিক্ষার ফাঁকে রাজনৈতিক বিভিন্ন আলোচনা হোতো ; পরাধীন দেশমাতৃকার শৃংখলা মুক্ত করবার কাজে আহ্বানই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। আলোচনায় যাঁরা দায়িত্ব নিতেন তাঁরা ছিলেন তদানীন্তন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ। শিক্ষাবিস্তারের পাশাপাশি 'দীপালী সংঘের' কাজকর্মগুলিও তিনি সুষ্ঠভাবে চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯২৪ সালে 'দীপালী সংঘের' বাৎসরিক অনুষ্ঠানে তিনি 'দীপালী শিল্প প্রদর্শনী'র ব্যবস্থা করেন। এই শিল্প প্রদর্শনীতে মেয়েদের হাতের কাজ, শিল্প ও অন্যান্য কারিগরী কাজের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯২৬ সালে তিনি প্রথম ঢাকাতে 'দীপালী ছাত্রী সংঘ' স্থাপন করলেন। পরবর্তী সময়ে বাংলা এবং আসামের বিভিন্ন স্থানে এই সংঘের শাখা বিস্তৃত হয়েছিল।

'দীপালী সংঘে'র সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন তিনি ১৯২৫ সালে ঢাকার বিপ্লবীদল 'শ্রীসংঘে' যোগ দিলেন। ১৯৩২ সাল পর্যন্ত তিনি 'শ্রীসংঘে'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৭-২৮ সালে পূর্ববঙ্গে ব্যাপক নারীনিগ্রহ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। নারীনিগ্রহের এই সংবাদ লীলাকে বিচলিত করে তোলে, নিগৃহীত নারীদের পাশে ছুটে যান। নিগৃহীত নারীদের আশ্রয়দান, তাদের মামলা পরিচালনার সাহায্য এবং সাধারণভাবে নারীদের মধ্যে সাহস এবং আত্মরক্ষার ভাব উদ্বুদ্ধ করবার জন্য চেষ্টা চালান। এই উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকায় 'নারী আত্মরক্ষা ফাণ্ড' খোলেন। একই সময়ে মহিলাদের আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দেবার জন্য এবং তাদের মধ্যে মানসিক শক্তি বিকাশের জন্য ঢাকায় ও অন্যান্য স্থানে মেয়েদের লাঠি

খেলা, ছোরা খেলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতেন আশুতোষ দাশগুপ্ত। মূলতঃ মহিলা কলেজের ছাত্রীদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই সময় মহিলা কলেজের আবাসিক নিয়মগুলি ছিল অত্যন্ত কঠোর, রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন ছাত্রীদের থাকবার ব্যাপারে খুবই অসুবিধা ছিল। এই কারণেই লীলার পরিকল্পনায় কলকাতায় 'ছাত্রীভবন' নামে একটি ছাত্রী আবাসিক খোলা হয়। একই বছরে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ বাণী নিয়ে তাঁরই সম্পাদনায় 'জয়শ্রী' নামে মহিলাদের একটি মুখপত্র প্রকাশিত হয়।

১৯৩০ সালে ঢাকাতে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়, এই আন্দোলনে লীলাকে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে দেখা যায় তিনি ঢাকার মহিলাদের নিয়ে 'ঢাকা মহিলা সত্যাগ্রহ সমিতি' গঠন করেন। এই সমিতি ঢাকা শহর ও জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সভাসমিতিতে প্রকাশ্যে লবণ তৈরী ক'রে লবণ আইন ভঙ্গ করেন। লীলার এই কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করেন রেণু সেন, বীণা রায়, শকুন্তলা চৌধুরী প্রভৃতি কর্মীগণ। ১৯৩০ সালে শ্রীসংঘের দলনেতা অনিল রায় গ্রেপ্তার হলেন, এর ফলে দলের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ল লীলার উপর। ১৯৩১ সালে ২০শে ডিসেম্বর তাঁর সঙ্গী রেণু সেনের সঙ্গে তিনিও রাজবন্দীরূপে জেলে আটক হন। এই সময় আরো যে সমস্ত মহিলা রাজবন্দীরূপে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা হলেন বীণা রায়, শকুন্তলা চৌধুরী, সুশীলা দাশগুপ্তা, প্রমীলা গুপ্তা, হেলেন দত্ত, লতিকা সেন, সীতা সেন, উমা রায় প্রমুখ।

১৯৩৭ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশের রাজবন্দীদের ব্যাপকভাবে মুক্তি দেওয়া হোলো সেই সময় লীলা নাগও মুক্তি পেলেন। এর পর এই বছরই তিনি কংগ্রেসে যোগ দিলেন। পরের বছরই তাঁর নেতৃত্বে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস মহিলা সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও ১৯২০ সালের পর তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শে এসেছিলন তবুও ১৯৩৭ সালেই তিনি নেতাজীর খুব ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস সভাপতিরূপে নেতাজী সুভাষচন্দ্র কর্তৃক 'জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি' গঠিত হয়। লীলা এই কমিটিতে বাংলাদেশ মহিলা সাব-কমিটির অন্যতম সভ্য মনোনীত হন। ১৯৩৯ সালে লীলা নাগ ও অনিল রায় পরস্পর পরস্পরকে জীবন-সঙ্গীরূপে গ্রহণ করলেন। ১৯৩৯ সালে জুন

মাসে নেতাজীর নেতৃত্বে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠিত হয় ; এই সময়ই লীলা ফরোয়ার্ড ব্লকের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের যে আন্দোলন হয়, সে আন্দেলনে লীলা রায় এবং অনিল রায় নেতাজীর সঙ্গে কারাবরণ করেন। কিছুদিনের মধ্যে সকলেই মুক্তি পান, কিন্তু নেতাজী সুভাষ কারান্তরালে রয়ে গেলেন। লীলা কিন্তু নেতাজীর নির্দেশেই 'ফরওয়াড সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনার ভারগ্রহণ করেন।

নেতাজীর ভারত ত্যাগের পরও কয়েকবছর পর্যন্ত তিনি এই কাগজের সম্পাদনার কাজ করেন। নেতাজীর অন্তর্ধানের পূর্বেই উত্তর ভারতের পার্টির দায়িত্ব অনিল রায় এবং লীলা রায়ের উপর এসে পড়েছিল, নেতাজীই এ দায়িত্ব তাঁদের দিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৪১ সালে লীলার উপর সভাসমিতিতে বক্তৃতা দেওয়া এবং বাংলার বাইরে যাবার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। ক্রিপস্ মিশন ব্যর্থ হবার পর 'ফরওয়ার্ড ব্লক' দলকে বেআইনী ঘোষণা করা হোলে, সারাভারতের ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হ'তে থাকে। ১৯৪২ সালে এপ্রিল মাসে লীলা নিরাপত্তা বন্দীরূপে জেলে আটক হন। 'জয়শ্রী' অফিসে পুলিস তালা লাগিয়ে দিল। সহকর্মী বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই তার সঙ্গে বন্দী ছিলেন। প্রথমে দিনাজপুর জেলে এবং পরে প্রেসিডেন্সী জেলে তাঁকে আটকে রাখা হয়। ১৯৪৬ সালে তিনি মুক্তি পান।

জেল থেকে মুক্তি পাবার পর তিনি আবার 'ফরওয়ার্ড ব্লক' এবং 'জয়শ্রী' পত্রিকার সম্পাদনা উভয় দায়িত্বকেই পালন করতে থাকলেন। ঐ একই বছরে ডিসেম্বর মাসে বাংলার সাধারণ আসন থেকে তিনি ভারতীয় কন্‌ষ্টিটিউয়েণ্ট এ্যাসেম্বলির সদস্য নির্বাচিত হয়ে ভারতীয় সংবিধান রচনায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালের কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হলে তিনি চলে আসেন দুর্গতদের মধ্যে রিলিফের কাজ করতে। একই বছরে নোয়াখালির দাঙ্গাতেও তাঁকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে দুর্গত মানুষ জনের পাশে। নোয়াখালির দাঙ্গার পর তিনি নোয়াখালিতে 'ন্যাশনাল সার্ভিস ইন্‌ষ্টিটিউট' নামে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলেন এবং তার সম্পাদিকারূপে সেখানে তিনি শান্তি ও সেবাকর্মে নিযুক্ত হন। গান্ধীজী তাঁর এই কাজের উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন।

১৯৪৭ সালে বহু সংগ্রামের পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতালাভ করল ;

এরপরেই এলো ভারত বিভাগের দুর্যোগ। বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলো। ভারত বিভাগের এই দুর্যোগ লীলাকে আন্তরিকভাবে বিদ্ধ করেছিল কারণ এ ধরনের বিভাগ তাঁর কাম্য ছিল না। এরপর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে তাঁর দীর্ঘ সময়ের কর্মভূমি ঢাকা ছেড়ে চলে আসতে হোলো ; তিনি পূর্ববঙ্গ ছাড়া হলেন। এবঙ্গে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে এসে তিনি তাঁর কার্যধারাকে অক্ষুন্ন রেখে এগিয়ে চললেন : 'জাতীয় মহিলা সংহতি' নামে একটি মহিলা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। ১৯৪৯ সালে তিনি আবার পূর্ব-পরিত্যক্ত কংগ্রেস দলে যোগ দিলেন, তবে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এদল পুনরায় ত্যাগ করলেন। ১৯৪৯ সালে ফরওয়ার্ড ব্লক দ্বিধা বিভক্ত হোলে তিনি পশ্চিমবঙ্গ ফরওয়ার্ড ব্লক (সুভাষিট) দলের সাধারণ সম্পাদিকা নিযুক্ত হলেন।

১৯৫২ সালের খাদ্য আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন ; এ জন্য তাঁকে দু'বার গ্রেপ্তার হতে হয়। ১৯৫৪ সালে ফরওয়ার্ড ব্লক (সুভাষিট) পার্টি যখন 'প্রজা সোসালিস্ট' পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয় তখন লীলা রায় ছিলেন পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্যদের মধ্যে একজন। ১৯৬০ সালে তিনি এই পার্টির সভাপতি হন। এর দু' বছর পরে তিনি প্রত্যক্ষ-ভাবে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। অবসর গ্রহণ করলেও পার্টির কর্মীরা বিভিন্ন সময়ে তাঁর পরামর্শ নিতেন। ১৯৭০ সালে জুন মাসে দীর্ঘদিন অসুস্থতার পর তিনি দেহত্যাগ করেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে লীলা রায় ছিলেন ব্রিটিশের দৃষ্টিতে একজন ভয়াবহ নারী। একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে লীলা রায় মনে করতেন প্রত্যেক নারীকেই স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেওয়া উচিত। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রেও তাঁর উৎসাহ ছিল যথেষ্ট ; এর জন্য তিনি সারা জীবন প্রচেষ্টাও চালিয়ে যান। পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপারেও তিনি আগ্রহী ছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন, শিল্পের উন্নতি সম্ভব হবে তখনই যখন শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি ঘটবে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে লীলা রায়ের গতিশীল ব্যক্তিত্বপূর্ণ নেতৃত্ব স্মরণীয় হয়ে আছে, বিশেষ করে নারী আন্দোলনে তাঁর প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। তদানীন্তন স্বাধীনতা আন্দোলনে বহু রাজনৈতিক মহিলাবর্মী রাজ-নৈতিক প্রশিক্ষণে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা তাঁর কাছেই গ্রহণ করে-ছিলেন। একজন সমাজ সেবী হিসাবেও তাঁর স্থান উল্লেখ্য ; নারী

শিক্ষা প্রসারে তাঁর প্রচেষ্টা আমাদের স্মরণীয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে দৃষ্টান্ত হিসাবে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাজনৈতিক জীবনেও তাঁকে আমরা একজন আদর্শ রাজনৈতিক কর্মী ও দেশপ্রেমিক বলতে পারি। বাংলায় বিশেষ করে, পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখের দাবী রাখে।

স্বর্ণ কুমারী দেবী

(১৮৮৫—১৯৩২)

স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেছিল সে কথা বিভিন্ন সময়ে আমরা আলোচনা করেছি। তবে এ-আন্দোলনের জোয়ার যে ঠাকুরবাড়ীর অন্দরমহলেও প্রবেশ করে ঠাকুরবাড়ীর মহিলাদের মনে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের উদ্দীপনা পূর্ণ সাহিত্য দিয়ে, সেই সঙ্গে বিভিন্ন কর্মধারার সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করেছিলেন—এ-খবর বোধ হয় আমাদের সকলের জানা নেই। এখন ঠাকুর বাড়ীর যাঁকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব, তিনি হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দশম সন্তান স্বর্ণ কুমারী দেবী। ১৮৮৫ সালে স্বর্ণ কুমারী দেবী কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা সরলাকুমারী দেবী ছিলেন একজন আদর্শ রমণী, ব্রহ্মধর্মের তিনি ছিলেন একান্ত ভক্ত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তদানীন্তন ব্রহ্মধর্ম প্রবর্তকদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব; তিনি যখন তাঁর ধর্ম প্রবর্তকের কাজ করতেন তখন তাঁর স্ত্রী সরলাকুমারী দেবী তাঁর পাশে থেকে তাঁকে সাহায্য করতেন।

স্বর্ণকুমারী দেবীর বয়োকনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন যথাক্রমে সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথঠাকুর। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার ছিল 'পিরালী' ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই পরিবারটি সংস্কৃতির দিক দিয়ে অত্যন্ত সুপরিচিত ছিল; পরিবারটি নিজেই ছিল একটি প্রতিষ্ঠান। স্বর্ণ কুমারী দেবী কোনো বিদ্যালয় থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেননি। গৃহে শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে, প্রথমে একজন ইউরোপিয়ান মহিলা এবং পরে অযোধ্যা নাথ পাকড়াশীর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন। তদানীন্তন সময়ে এ ধরনের সুযোগ পাবার কথা মহিলারা ভাবতেই পারতেন

না। এ পরিবারের মহিলাদের মধ্যে কিন্তু একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশ সবসময়ই বর্তমান থাকত ; পরিবারের বৃদ্ধ মহিলারাও রামায়ণ, মহাভারত, তন্ত্র এবং সাংখ্য দর্শনের-উপর পুস্তক পাঠ করে তাঁদের সময় কাটাতেন। এছাড়া কুমারীরা বিভিন্ন উপন্যাস, পদ্য প্রভৃতি পুস্তক পাঠের মধ্য দিয়ে তাঁদের আনন্দের খোরাক সংগ্রহ করতেন।

১৮৬৭ সালে জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর বিবাহ হয়। জানকীনাথ ছিলেন দেশপ্রেমিক তরুণ যুবক ; পরবর্তীকালে তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একজন বড় নেতা হন। বিবাহের পর জানকীনাথকে স্বর্ণকুমারী দেবীর ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে উচ্চশিক্ষার সুবিধার্থে বোম্বাই পাঠানো হোলো। স্বর্ণকুমারী দেবী এই সময় পিতৃগৃহেই থাকতেন। ঠাকুর পরিবারের মধ্যে সর্বক্ষণ একটা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের আবহাওয়া ছড়িয়ে থাকত। স্বর্ণকুমারীর অন্য ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবারের ছোটদের নিয়ে ইংরাজী গল্পের আসর বসাতেন, সেখানে স্বর্ণ কুমারী দেবীও যোগ দিতেন। ভাইদের সঙ্গে সব সময়ই তিনি সাহিত্য এবং সঙ্গীত আলোচনায় যোগ দিতেন। তিনি ছোট বয়স থেকেই গল্প লিখতেন ; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকে উৎসাহ দিতেন। শুধুমাত্র সাহিত্য আলোচনায় যোগ দেওয়া নয়, নিজেও তিনি আলোচনা করবার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিতেন। এইভাবেই তিনি তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু করেন।

বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল ; কয়েকটি উপন্যাস প্রবন্ধ, নাটক, গান, পদ্যকাব্য প্রভৃতি সমৃদ্ধ পুস্তকও তিনি রচনা করেন। সাহিত্যের কার্যধারার মধ্যে,—দ্বীপনির্বাণ (১৮৭৬), ছিন্নমুকুল (১৮৭৯), হুগলীর ইমামবারী (১২৯৪ বি.এস.), বিদ্রোহ (১৮৯০), ফুলের মালা (১৮৯৪), বিচিত্রা (১৯২০), মিলন রাত্রি (১৯২৫), স্নেহলতা (১২৯৯-বি.-এস.) প্রভৃতি। ১৮৯২ সালে তাঁর নবকাহিনী পুস্তকে স্থান পেয়েছে তাঁর রচিত বহু ছোট গল্প অর্থাৎ এটি ছোট গল্প সংকলন। নাটকের সৃষ্টির দিকেও তাঁর অবদান উল্লেখ করবার মতো,—বসন্ত উৎসব (১৮৭৯), বিবাহ উৎসব (১৯০১), দেবকৌতুক (১৩১২-বিঃ এস.), কনে বদল (১৩১৩ বি.এস.) পাকচক্র (১৩১৮-বিঃ এস.) নিবেদিতা (১৩২৪ বি.এস.) এবং দিব্যকমল (১২৯৯ বিঃ এসঃ)। কবিতার মধ্যে যে সব পুস্তক আছে সেগুলি হোলো,—গাথা (১২৯৯ বি. এস.), কবিতা ও গান (১৩০২ বি. এস.)।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিয়ানো বাজানোর হাত ছিল খুব সুন্দর। তাঁর পিয়ানো বাজনার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবী ও রবীন্দ্রনাথ গান করতেন। পত্রিকা সম্পাদনার কাজেও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল; 'ভারতী' মাসিক পত্রিকার সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। তিনি পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। পরবর্তী সময়ে, ১৮৮৪ সালে উক্ত পত্রিকার সম্পাদিকা নিযুক্ত হন। একনাগাড়ে আঠারো বছর তিনি এই পত্রিকায় সম্পাদিকা হিসাবে কাজ করেন। সেই সময় তাঁর তত্ত্বাবধানে ভারতী পত্রিকাটি একটি সুপরিচিত মাসিক পত্রিকা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৮৮৬ সালে তাঁরই প্রচেষ্টায় 'সখি সমিতি' নামে যে মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি ছিলেন তার সম্পাদিকা। বাঙালী মহিলাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা বিনিময়ের উদ্দেশ্যেই এই সংগঠনটি স্থাপিত হয়। এই সংস্থা দরিদ্র মহিলা এবং অনাথদের সাহায্য করত।

১৮৮০ সালে লেডি ব্যালে বেথুন স্কুলে যে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন, সেখানে এই সমিতির মহিলাদের তৈরী হাতের কাজ প্রদর্শিত হয়েছিল। এই প্রদর্শনীতে কবিগুরুর 'মায়ার খেলা' নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ করা হয় বলে প্রদর্শনীটি সাহিত্য প্রেমীদের কাছে স্মরণীয়। বস্তুতপক্ষে, সখি সমিতির কার্যাবলীকেই মাথায় রেখে এবং এরই একটা উদাহরণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ এই কাব্য নাটকটি রচনা করেন। এই সমিতি বিভিন্ন ব্যক্তির দানের উপর রবীন্দ্রনাথ এই কাব্য নাটকটি রচনা করেন। এই সমিতি বিভিন্ন ব্যক্তির দানের উপর কিছুটা নির্ভর থাকত, যদিও এদের স্বনির্ভর করবার জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা ছিল। রাণী স্বর্ণময়ী ছিলেন স্বর্ণকুমারীর বান্ধবী; তিনি এবং তদানীন্তন সময়কার বাংলার বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির কাছ থেকে 'সখি সমিতি' দান পেয়েছিল।

১৮৮২ সাল থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত লেডিস থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির (Ladies Theosophical Society) সভাপতি হিসাবে তিনি এ সোসাইটির কাজ করেন। তাঁর কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীর প্রতিষ্ঠিত 'বিধবা শিল্প আশ্রমের' তিনি ছিলেন সভাপতি এবং এই সংগঠন বিধবাদের কল্যাণের কাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর স্বামী জানকীনাথ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন, তাঁরই উদ্দীপনায় স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সম্মেলনের ষষ্ঠ সম্মেলনে প্রতিনিধি হয়ে যান। ১৯২৯ সালে কলকাতায় বাঙালী সাহিত্য সম্মেলনে (Bengal

Literary Conference) তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২৭ সালে তাঁকে 'জগত্তারিণী' স্বর্ণপদক পুরস্কার দেওয়া হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। বাংলায় তিনিই প্রথম মহিলা লেখিকা হিসাবে এই পুরস্কারের সম্মানের অধিকারিণী হয়েছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান উল্লেখের দাবী রাখে। সামাজিক, ঐতিহাসিক বহু উপন্যাস তিনি রচনা করেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। স্বর্ণকুমারীর রচিত ছিন্ন মুকুল একটি অনবদ্য চিন্তা—বিষয়, অবৈধ প্রেম, সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের বিষয়ের উপর রচনা এই প্রথম বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ ঘটাল। তাঁর রচিত 'দ্বীপনির্বাণ' গ্রন্থটি জাতীয় সচেতনতা বাড়ায়; সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর 'মহসীন' গ্রন্থটিতে। তিনি ছিলেন কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে। জাতি সমস্যা এবং বিধবা বিবাহের ব্যাপারে কাজ করতে গিয়ে তিনি সর্বদাই খোলা মনের পরিচয় দিয়েছেন। জাতীয় শিল্পের তিনি ছিলেন একজন অনুগ্রাহী। ১৯৩২ সালে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লেখনী বাংলার আকাশে বাতাসে যে সুগন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছিল, তা ছিল, মানবপ্রেম, স্বাধীনতা, জাতীয়তাবাদ, কুসংস্কারের প্রতিবাদ, সমাজের নিপীড়িত নারীদের সংগঠিত করবার প্রচেষ্টায় ভরপুর। তাই আজও আমাদের স্বাধীন দেশের মানুষের কাছে তিনি একান্ত আপনার।

সরলা দেবী

(১৯০৪—   )

স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী আর একজন উড়িষ্যাবাসী মহিলার নাম ভারতবাসী স্মরণে রাখে, তিনি হলেন, সরলাদেবী। উড়িষ্যার কটক শহরে সম্ভ্রান্তশীল করণ পরিবারে ১৯০৪ সালে ২৯-শে আগষ্ট, সরলাদেবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পালক পিতা বালমুকুন্দ কাননগু ছিলেন একজন ডেপুটি কালেক্টর; তিনি বিহার এবং উড়িষ্যার রাজ্যের অধীনে কিছুদিন কাজ করেন। বালমুকুন্দ কাননগুর ঘনিষ্ঠ পরিজনদের মধ্যে ছিলেন রায় বাহাদুর—রাজকিশোর দাস, নন্দকিশোর দাস, উৎকল-গৌরব মধুসূদন দাস এবং তাঁর ভাই গোপাল বল্লভ দাস। সরলাদেবীর জন্মদাতা পিতা ছিলেন বাসুদেব কাননগু এবং মাতা পদ্মাবতী দেবী। বালীকুন্ডু থানার অন্তর্গত নাইলো গ্রামে ছিল তাঁদের বাসস্থান; কটক শহর থেকে এই স্থান ছিল প্রায় চল্লিশ মাইল ভিতরে।

১৯১৮ সালে, চৌদ্দ বছর বয়সে ভগীরথী মহাপাত্রর সঙ্গে সরলা দেবীর বিবাহ হয়। পেশায় ভগীরথী ছিলেন একজন আইন ব্যবসায়ী; পেশায় আইনজীবী হলেও জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। সরলাদেবী শৈশবের প্রাথমিক মানের শিক্ষা নেন গ্রামের পাঠশালা থেকে; বর্ণ পরিচয় ও অক্ষরজ্ঞান এখানেই তাঁর শিক্ষা হয়। সেই সমাজে মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে আপত্তি সামাজিকভাবেই জোরদার ছিল, সেই কারণে তাঁর পরিবারও মহিলা শিক্ষার পক্ষে ছিল না। সেজন্য শুধু মাত্র মাধ্যমিক ইংরেজীমান পর্যন্ত কটকের রভেনস্ গার্লস স্কুলে পড়বার পর তিনি আর কলেজে পড়তে পারেননি। তবে বাড়ীতে হিন্দি ভাষায় মহাকাব্য এবং ওড়িয়া সাহিত্য, বিশেষত রাধানাথরাই এবং ফকির

মোহনের সাহিত্য তিনি পড়তেন। বাংলায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং হিন্দিতে তুলসী দাসের রামায়ণ পড়েন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার পর তিনি তাঁর সাহিত্য কর্তৃক বিশেষভাবে প্রভাবিত হন ; এ ছাড়া ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ছিল।

তাঁর জীবনে সবচেয়ে বেশী করে যাঁর প্রভাব তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল, তিনি হলেন মহাত্মাগান্ধী। উৎকল গৌরব মধুসূদন দাস এবং পণ্ডিত গোপাল বন্ধু দাসের দ্বারাও তিনিও অনুপ্রাণিত হন। এ ছাড়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সুভাষ চন্দ্র বোস, সরোজিনী নাইডু, বিধানচন্দ্র রায়, লাবণ্য ঘোষ, রমাপদ চ্যাটার্জী, কৃপালিনী এবং তদানীন্তন সময়কার আরো বহু বিখ্যাত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে তিনি আসেন।

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিপূর্ণ মনের সরলা দেবী এমন একজন মহিলা ছিলেন, যিনি প্রথম উড়িষ্যার সামাজিক চিরন্তন জড়তা এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের পর্দার আড়াল থেকে বাইরে বেড়িয়ে আসেন এবং জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন ; এই মহিলা এতটুকু দ্বিধা না করে স্বামীর সঙ্গে বেড়িয়ে পড়েন একটাই উদ্দেশ্যে, নিজেকে উৎসর্গ করে দেন একটাই কাজে, তা হোলো স্বাধীনতা চাই। ১৯২০ সাল থেকে তিনি আন্দোলনে সক্রিয়ভূমিকা নিতে শুরু করেন ; স্বাধীনতা লাভের দিন পর্যন্ত তাঁর এই কর্মধারা তিনি অব্যাহত রেখেছেন। দেশ মাতৃকার শৃঙ্খল মুক্তির চিন্তা ছাড়া একদিনের জন্যও তিনি অন্য কোনো ভাবনা ভাববার জন্য সময় ব্যয় করেননি। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় কর্মী। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় উড়িষ্যা থেকে সত্যাগ্রহী হিসাবে মহাত্মাগান্ধী তাঁকেই প্রথম নির্বাচিত করেন।

তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা এবং নিষ্ঠার জন্য তিনি ছিলেন পরিচিত। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি উড়িষ্যা বিধানসভার সদস্যা ছিলেন ; এ দায়িত্বে থাকাকালীন বিশেষ দক্ষতা ও বিশ্বস্ত পরামর্শ দানের দ্বারা বিধানসভায় নিজের আসন রক্ষা করতে সমর্থ হন। রাজনৈতিক কর্ম ছাড়াও সরলাদেবী সমাজসেবা এবং নারী প্রগতির জন্য কাজ করতেন, এর জন্য তিনি বহু প্রচেষ্টা করেও আমাদের পুরানো সামাজিক ও ধার্মিক কুসংস্কারগুলিকে সমূলে উৎপাটন করতে সক্ষম হননি। হিন্দু

ধর্মের সমস্ত প্রথা ও রীতিনীতিকে সঙ্গে নিয়েই এ ধর্মের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় বিশ্বাস। সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলনে (All India Womens' Conference) উড়িষ্যা শাখার সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন এবং বহু সামাজিক ও শিক্ষাসংস্থা কমিটির সদস্যা নির্বাচিত হন।

উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং উৎকল সাহিত্য সমাজের সিনিটের তিনি একজন সদস্যা ছিলেন। দরিদ্র মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি সবসময়ই তাদের পাশে থাকতেন; বন্যা, মহামারী প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তিনি উড়িষ্যার বিভিন্নস্থানে দুর্গত মানুষজনের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। ওড়িয়া সাহিত্যে তাঁর অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে তিনি বহু পুস্তক রচনা করেন। এগুলি হোলো 'নারীর দাবী', 'ভারতীয় মহিলা প্রসঙ্গ', 'বিশ্ববিপ্লবাণী', 'বীররমণী কুন্তলা কুমারী', 'সরলাদাস মহাভারত' তাঁর কবি প্রতিভার মধ্যে পাওয়া যায়—'বাই রামানন্দ আশ্চর্য বাণী' 'সত্যধর্ম' এবং 'পঞ্চ প্রদীপ' প্রভৃতি পুস্তক-গুলি।

সরলা দেবী চৌধুরাণী

(১৮৭২—১৯৫৪)

সামাজিক সংস্কারের গোঁড়ামির মধ্যে আবদ্ধ থাকবার চেয়ে মুক্ত বিহঙ্গীর মতো দেশমাতৃকার সেবায় আত্মদান অনেক শ্রেয়। পরাধীন দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন পরাধীন ভারতমাতার বহু সন্তান। নারী-পুরুষ একসঙ্গে মিলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করতে।

ছয় বছরের সরলা; একদিন তাঁর সমবয়সী এক বন্ধু তাঁকে ভয় দেখালো, পাশ করলে তাঁকে একেবারে একা বেঁচে থাকতে হবে—এই হবে শাস্তি। শিশু সরলা সেদিন একথা শুনে ছাদে উঠে দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে কল্পনা করতে লাগলেন, যেন কোথাও কেউ নেই—আকাশে পাখী নেই, বাড়ীতে লোক নেই, মামা-মাসী, দাদা-দিদিরা নেই, দাস-দাসীরা নেই, অন্ধকার ঘরেও কেউ লুকিয়ে বেঁচে নেই, ইঁদুর-পিঁপড়েও নেই—ব্রহ্মাণ্ড একেবারে শূন্য, শুধু একা তিনি আছেন। সেইদিন সকলেই আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করছিলেন আকাশের দিকে চেয়ে থাকা শিশুটিকে। আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই শিশুমন সেদিন নিঃসঙ্গবোধ করেনি। আকাশের আলো যেন তাঁর সঙ্গী এবং স্বয়ং ঈশ্বরও যেন কোথাও আছেন, আকাশে সিঁড়ি লাগালেই তাঁকে পাওয়া যাবে। শুধু একটি বালিকার সত্তা এবং ঈশ্বরের সত্তা যেন সেদিন ব্রহ্মাণ্ডে মিলে গিয়েছিল। স্রষ্টার সঙ্গে কেমন একটা একাত্মবোধের অনুভূতি এক মুহূর্তের জন্য তাঁর মনে উদয় হোলো। নিঃসঙ্গতার ভয় তাঁর চেতনার দিগন্তরেখায় বিলীন হয়ে গেল, হাসি মুখখানি তাঁর নির্ভীক সতেজ হয়ে উঠল।

সেদিনের সেই শিশু সরলা পরবর্তী জীবনে লিখেছিলেন,—"সেদিন

আমার মনের সেই অবলম্বন কোথা হতে এসেছিল তাই ভাবি। বোধহয় তাহা সহজাত হবে, শিক্ষালব্ধ নয়।" এই সহজাত স্বাবলম্বন ও তেজস্বীতা সমস্ত জীবন তাঁকে পরিচালিত করেছে। আর সেই জন্যই সেই শিশু সরলা পরিণত বয়সে হয়েছিলেন দেশবাসীর সবার প্রিয় দেশপ্রেমিক সরলা দেবী চৌধুরাণী, যিনি দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী সরলা দেবী চৌধুরাণী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৭২ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে। পিতা জানকীনাথ ঘোষাল এবং মাতা স্বর্ণকুমারী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন সরলা দেবী। জানকীনাথ ছিলেন নদীয়ার জয়রামপুরের ঘোষাল বংশের সন্তান।

সরলার পিতা জানকীনাথ বহুকাল লণ্ডনে ছিলেন, তাই জন্ম থেকেই, এমন কি শৈশবের এবং কৈশোরের বেশীর ভাগ সময়ই সরলা দেবী কাটিয়েছেন ঠাকুরবাড়ীর পরিবেশের মধ্যে। ঠাকুরবাড়ীর পরিবেশের সংগে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন; আর সেই কারণেই গান, সাহিত্য, চিত্রকলা, দেশপ্রেমিকতা প্রভৃতির প্রভাব ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে পড়েছিল এবং তিনি প্রভাবিতও হয়েছিলেন, যার প্রকাশ দেখা গিয়েছে তাঁর পরবর্তী জীবনে।

তদানীন্তন সময়ে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগমন ঘটত এই ঠাকুরবাড়ীতে। এছাড়া জানকীনাথের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তিদের আগমন ঘটত। সহজাত শিল্পকলা চর্চার পাশাপাশি স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপারেও ঠাকুর পরিবারের যথেষ্ট উদ্দীপনা ছিল। এরকম পরিবেশে মানুষ হবার ফলে সরলাদেবীর মধ্যে এ ধরনের আদর্শ দানা বেঁধে উঠেছিল ধীরে ধীরে। বিদ্যালয় জীবনে তিনি কবি কামিনী রায় (সেন) এবং সমাজসেবী লেডি অবলা বোসের সংগে পরিচিত হন। তাঁরা সকলেই সরলাদেবীর বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

ঠাকুরবাড়ীর প্রথা অনুযায়ী সরলাদেবী ঠাকুরবাড়ীর ছেলেমেয়েদের মতো তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার কাজ গৃহশিক্ষকের সাহায্যে সমাপ্ত করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বেথুন স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে তেরো বছর বয়সে, ১৮৮৬ সালে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। এরপর তিনি বেথুন কলেজে ইংরাজীতে অনার্সসহ বি. এ. পাশ করেন। সংস্কৃতে এম. এ. পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুতি নিয়েও পরীক্ষা দিলেন না, কিন্তু এর মধ্যেই তিনি ফরাসী, পারসী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করলেন।

সাধারণ নিয়মের সঙ্গে সমতা রেখে তদানীন্তন নারী-সমাজের মতো তিনি বিবাহিত জীবনে প্রবেশ না করে গানের চর্চা করতে লাগলেন এবং শীঘ্রই একজন সুগায়িকা হিসাবে খ্যাতিলাভ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে-মাতরম্' গানের প্রথম সুর সরলাদেবীরই দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ এই গানটির দু'লাইনের সুর নিজে বসিয়েছিলেন এবং তাঁরই অনুরোধে সরলাদেবী পুরো গানটিতে সুর দেন। ১৯০৫ সালে ডিসেম্বর মাসে বেনারস কংগ্রেস অধিবেশনের মঞ্চে সভাপতি গোখলে সরলাদেবীকে 'বন্দে-মাতরম্' গানটি গাইতে অনুরোধ করেন। সরলাদেবী 'সপ্তকোটি' কথাটিকে চট্ করে 'ত্রিংশকোটি' করে দিয়ে তাঁর সুকণ্ঠ দ্বারা গানটি গেয়েছিলেন; এগান শুনে ভারতের দেশ-দেশান্তর থেকে আগত স্বদেশভক্তগণ মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

বহু স্বদেশী গান তিনি রচনা করেন, পরে সেগুলি 'শতগান' নাম দিয়ে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে একশতটি গান ছিল এবং এগুলির মধ্যে 'হিন্দুস্থান' এবং 'নবভারতজননী' গান দু'টির ভাষার এবং ভাবের সৌন্দর্য ও সতত্তা দিয়ে আকর্ষণ করেছে বহু গায়ক এবং শ্রোতাকে।

সরলাদেবী ছিলেন জাতশিক্ষিকা, বহু কিশোরী ও যুবতী মেয়েকে তিনি গান শেখাতেন। মহীশূরের মহারাণী বিদ্যালয়ের তিনি সেক্রেটারী ছিলেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতাও করেন। ১৯০৫ সালে লাহোরের বাসিন্দা এক পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ রামভজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। রামভজ পেশাগত দিক দিয়ে ছিলেন একজন আইনজীবী, তদানীন্তন আর্যসমাজ আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন। 'হিন্দুস্থান' নামক তদানীন্তন একটি উর্দু পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রামভজর কার্যকলাপ ব্রিটিশ সরকারের কুদৃষ্টিতে পড়লে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

রামভজ গ্রেপ্তার হবার পর সরলাদেবীর উপর বর্ধিত দায়িত্ব হিসাবে 'হিন্দুস্থান' পত্রিকার দায়িত্বভার পড়ল। তিনি এর ইংরাজী অনুবাদ করে প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁর এই ইংরাজী পত্রিকা তদানীন্তন ইংরাজদের মধ্যে বিশেষ করে রামজয় ম্যাকডোনাল্ডের কাছ থেকেও প্রশংসা অর্জন করেছিল। সরলাদেবীর একটি মাত্র পুত্র ছিল। সাংসারিক জীবনের সঙ্গেই সরলাদেবী স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে লাহোরের গ্রামে গ্রামে কাজ করেছেন এবং অগ্রণী মহিলাদের বিভিন্ন পরিকল্পনা করতেন, যার প্রকাশ ঘটেছিল

১৯১০ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে। স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়াসে তিনি 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' স্থাপন করেন। এর শাখা লাহোর, অমৃতসর, দিল্লী, করাচী, হায়দ্রাবাদ, কানপুর, বাঁকীপুর, হাজারীবাগ, মেদিনীপুর, কলিকাতা এবং আরো কয়েকটি স্থানে স্থাপিত হয়।

১৯২৩ সালের ৬ই আগস্ট রামভজ দত্ত চৌধুরীর মৃত্যু হয়, সরলা স্বামীহারা হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা তাতে এতটুকুও ব্যাহত হয়নি। ১৯২৫ সালে নিখিল ভারত সামাজিক মহাসমিতির সভানেত্রীরূপে দেশ তাঁকে পেয়েছে। বীরভূম, লক্ষ্ণৌ শহরের বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনও তাঁকে পৌরহিত্য করতে দেখা গিয়েছে। ১৯৩০ সালে তিনি কলকাতায় 'ভারত স্ত্রী-শিক্ষাসদন' নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ধারাবাহিকতা বজায় না রাখতে পারলেও মোটামুটিভাবে ১৩০২ থেকে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তিনি 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের পরেও সম্পাদিকা না থেকেও 'ভারতী'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন বহুদিন।

১৯৩৫ সাল থেকে তিনি শিক্ষকতা কার্য থেকে অবসর নিলেন এবং আধ্যাত্মিকতার পথ বেছে নিলেন। শৈশবে তিনি যেমন তাঁর মাতা স্বর্ণকুমারী দেবীর আদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন তেমনি পরিণত বয়সে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। শেষ জীবনে তিনি অবশ্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে তাঁর গুরু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে তিনি কঠোর কার্যের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কৈশোরে তাঁর দেশপ্রেমিকতা দেশের যুবশক্তিকে উৎসাহ করবার কাজে সাহায্য করেছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী সামাজিক ও ধর্মগত ব্যাপারে ছিল দরাজ, এ প্রভাব সরলা দেবীর উপর পড়েছিল এবং তা তিনি গ্রহণও করেছিলেন।

শরীরচর্চার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন এবং এ ব্যাপারে তিনি 'বৃহষ্টমী উৎসব' অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। ১৯০৩ সালে কংগ্রেসে থাকাকালীন তিনি ভারতীয় খেলাধুলার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। যুবমনে উৎসাহ সঞ্চার করবার ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। এই জন্য তিনি 'উদয়াদিত্য উৎসবে'র আয়োজন করেন—এই উৎসবের বিষয় ছিল স্টেজের উপর একখানি তরবারি রেখে সভাসীনেরা বীর উদয়াদিত্যকে স্মরণ করে তাতে দেবে পুষ্পাঞ্জলী, যা যুবমনে উৎসাহের একটা প্রবল জোয়ারের মতো ধাক্কা দিয়েছিল। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে

তারা কাগজে লিখল—"সরলাদেবীর সঙ্গে আমরা দৌড়ে দৌড়ে হাঁপিয়ে পড়েছি।"

স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার প্রচার করবার জন্য ১৯০৪ সালে তিনি 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' খুলেছিলেন, এটি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগ্রহ করা, শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য একটি স্বদেশী বস্ত্র ও জিনিসের দোকান। এই ভাণ্ডারের জিনিস বোম্বাই কংগ্রেসে পাঠান হয়। তাঁর এ প্রচেষ্টার জন্য তিনি সেখান থেকে পুরস্কারস্বরূপ স্বর্ণপদক পান। ঐশ্বর্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেও স্বদেশী চিন্তা এবং গান্ধীজীর অহিংস-অসহযোগ এবং খাদি আন্দোলনকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন মনেপ্রাণে।

তদানীন্তন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতা লালা লাজপত রাও, বালগঙ্গাধর তিলক, গোখলে এবং মহাত্মাগান্ধীর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর মায়ের সাহচর্য তাঁকে সাহিত্যচিন্তায় সাহায্য করেছে। সরলাদেবী 'বঙ্গের বীর' সিরিজের ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৫৪ সালে সরলাদেবীর দেহাবসান ঘটে। প্রতিভাসম্পন্ন এই মহীয়সী নারীকে পেয়ে দেশ গৌরবান্বিত।

সুচেতা কৃপালিনী

(১৯০৪—   )

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ভারতের মাটিকে করেছিল প্রাণময়। এ আন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়েছিল বহু যুবক-যুবতীর আত্মবিশ্বাস। ভারতের আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হয়েছিল স্বাধীনতা মন্ত্র। যুবক-যুবতী যৌথ কণ্ঠে ভারতের আকাশ-বাতাসকে করেছিল মুখরিত। তাই-তো আমরা আজ স্বাধীনতার উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হতে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ভারতমাতাকে।

স্বাধীনতার আলো জেবলে দিতে এগিয়ে এসেছিলেন যেসমস্ত যুবক-যুবতী তাঁদের মধ্যে এক অতি পরিচিত নাম সুচেতা কৃপালিনী। বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সুচেতা কৃপালিনী ছিলেন সব কিশোরীদের সুচেতা দিদি, যিনি নিজের জীবনকে পূর্ণভাবে সমর্পণ করেছিলেন এ দেশের মাটিকে শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দেশমাতৃকাকে বন্ধন মুক্ত করবার কাজে। ১৯০৪ সালের ২৫-শে জুন পাঞ্জাবের আমবালা নামক স্থানে এক মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে সুচেতা কৃপালিনী জন্মেছিলেন। তাঁর পিতা ডাক্তার সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার ছিলেন পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত মেডিকেল সার্ভিসের একজন মেডিকেল অফিসার। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের; সেই কারণে তিনি প্রগতিশীল এবং কুসংস্কারমুক্ত ছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিল জাতীয়তাবোধ। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং অনুরাগী ছিলেন। তাঁর বাড়ীতে সমস্ত সংগ্রামীদের ছিল অবাধ প্রবেশাধিকার। তাঁর এই জাতীয়তাবোধ সর্বসমক্ষে প্রচারিত হয়েছিল ফলে তৎকালীন ইংরেজ তা সমর্থন করতে পারেনি।

কিন্তু তিনি সে ব্যাপারে গ্রাহ্য করতেন না। এ-রকম পিতার কাছ থেকেই প্রথম হাতে খড়ি হয়েছিল সুচেতার; জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে

ওয়াকিবহাল হবার শিক্ষাগুরু হিসাবে তাঁর পিতাই তাঁকে শিক্ষা দেন এবং প্রেরণার উৎস হন। পিতার বদলী চাকরী ; সেই কারণে সুচেতাকে বিভিন্ন স্থানে পড়াশুনা করতে হয়েছিল। বিদ্যালয়ের শিক্ষাই তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল দশটি বিভিন্নস্থানে—সিমলার লরেটো স্কুলেও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। দিল্লীর 'কুইন মেরি' বিদ্যালয় থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেট পরীক্ষায় পাশ করেন। লাহোরের সরকারী মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বি. এ. (স্নাতক) পাশ করেন। এরপর দিল্লীর সেন্ট স্টিপেনস্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইতিহাস এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এম. এ. পাশ করবার পর কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। তাঁর কর্ম-জীবন শুরু হয় শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে। শিক্ষকতার জীবনেও তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। প্রাইমারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লাহোরের 'স্যার গঙ্গারাম' উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাইমারী বিভাগে শিক্ষকতা করেন বেশ কিছু দিন। তবে প্রাইমারী বিভাগে কিছুদিন শিক্ষকতা করবার পর তিনি উপলব্ধি করলেন যে, উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের অপেক্ষা শিশুদের শিক্ষাদান বেশী অসুবিধাজনক। সেইজন্য প্রাইমারী বিভাগের শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে তিনি কিছুদিন উচ্চবিদ্যালয়ে এবং তারপরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করেন। তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন বিশের দশকের শেষের দিক থেকে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। ইতিমধ্যে তিনি সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩৪ সালে বিহারের ভূমিকম্পে তাঁকে বিহারের গ্রামে গ্রামে মাসের পর মাস রিলিফের কাজ করতে দেখা গিয়েছে। ১৯৩৬ সালে আচার্য জে. বি. কৃপালিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। আচার্য কৃপালিনী ছিলেন সেই সময় নিখিল ভারত কংগ্রেসের সম্পাদক। বেনারস হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করাকালীন তিনি প্রথম আচার্য কৃপালিনীর সঙ্গে ১৯২৯ সালে পরিচিত হন। সেই সময় আচার্য কৃপালিনী বেনারসে গান্ধী-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সুচেতার ভ্রাতা ধীরেন্দ্র নাথ মজুমদারের মাধ্যমেই সুচেতার সঙ্গে আচার্য কৃপালিনীর পরিচয় ঘটে। ধীরেন্দ্র মজুমদার ছিলেন আচার্য কৃপালিনীর খুবই ভক্ত, ভ্রাতার মাধ্যমে পরিচয় হবার পর সুচেতা এবং আচার্য কৃপালিনী ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হতে থাকেন।

১৯৩৬ সালে এপ্রিল মাসে উভয়েরই বাড়ীর অমতে তাঁরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। জওহরলাল নেহেরুর মা আচার্য কৃপালিনীকে নিজের পুত্রের মতো দেখতেন। তাই বেনারসে আচার্য কৃপালিনী ও সুচেতার বিবাহের পর এলাহাবাদের আনন্দভবনে নেহেরুর বাড়ীতে তাঁদের আবার বিবাহোৎসব হয়েছিল। আচার্য এবং সুচেতার বিবাহিত জীবন খুবই সুখের ছিল; উভয়ের মধ্যে মধুর সম্পর্ককে বহন করে উভয়েই কাটিয়েছিলেন তাঁদের চল্লিশ বছরের জীবন। স্বাধীনতার পর যদিও তাঁদের উভয়ের মধ্যে রাজনীতিগত দিক দিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল কিন্তু এর ফলে তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো পারিবারিক কিম্বা মানসিক দিক দিয়ে সম্পর্কের তিক্ততা আসেনি।

জীবনের প্রারম্ভ থেকেই সুচেতা রাশিয়ার বিপ্লবের এবং ভারতের চরমপন্থী রাজনৈতিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছে ভীষণভাবে। তবে ১৯৩৫ সাল থেকে গান্ধীর আদর্শ দ্বারা তিনি ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। চিরকালই তিনি সেই থেকে গান্ধীর গোঁড়া সমর্থক হিসাবে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিটি কাজে মতবাদ প্রকাশ করেছেন। প্রগতিশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি, স্বভাববশতঃই সেই কারণে জাতি বৈষম্যের বিরোধিতা করেছেন সব সময়ই। তিনি নারী-পুরুষ সমানাধিকার, বিধবা-বিবাহ, অন্যান্য সংস্কারমুক্ত সামাজিক রীতি-নীতির পক্ষে যে সমস্ত কার্যসূচী পালন করা হয়েছে, সেখানেই আত্মো-নিয়োগ করেছেন। ধর্মের দিক দিয়ে সুচেতা ধর্মের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের, রীতি-নীতির বিরোধিতা করেন; কিন্তু ঐশ্বরিকবাদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর বিশ্বাস। প্রতিদিন তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে গীতা পাঠ করতেন যা তাঁকে ঐশ্বরিক শক্তি উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছিল।

১৯৩৯ সালেই তিনি বেনারস ছেড়ে এলাহাবাদে আসেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। এর আগে তিনি বিহারের ভূমিকম্পের ত্রাণকার্যের সময় ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে কাজ করেন। এই সময় থেকেই স্বাধীনতা কংগ্রেসে তিনি সক্রিয়ভাবেই কাজ করতে থাকেন। ১৯৩৯ সালে এলাহাবাদের কংগ্রেস দপ্তরে কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে নিখিল ভারত কংগ্রেসের মহিলা সাব-কমিটির সম্পাদিকা নিযুক্ত হন। একই সঙ্গে কংগ্রেসের বৈদেশিক বিভাগের সম্পাদিকার কাজ করতে থাকেন। এই পদের দায়িত্বে তিনি ছিলেন প্রায় বছর দেড়েক। ১৯৪০

সালে গান্ধীজীর আহবানে দেশের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বরা এগিয়ে এসেছিলেন পরাধীন ভারতের শৃংখলমুক্তির কাজে। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জোয়ারে তখন দেশ প্লাবিত। সুচেতাও এ আন্দোলনের জোয়ারে গা ভাসালেন। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার জন্য গেলেন ফৈজাবাদে। আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তার যথাযথ মূল্য দিতে হয়েছিল অনেককেই। সুচেতাকেও দুই বছরের জন্য কারাবরণ করতে হয়, তাঁকে প্রথমে ফৈজাবাদ ও পরে লক্ষ্ণৌ জেলে রাখা হয়।

১৯৪২ সালে গান্ধীজীর ভারত-ছাড় (Quit India) আন্দোলন আরম্ভ হয়। এ আন্দোলনেও সুচেতা নিয়েছিলেন অগ্রণী ভূমিকা। এই সময় তাঁকে জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া, অরুণা আসফ আলি প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গুপ্ত আন্দোলনের কাজে চলে যেতে হয় নির্দিষ্ট স্থানে। ব্রিটিশ-বিরোধী এই আন্দোলনে তিনি বোম্বে, কোলকাতা, দিল্লী এবং অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে সক্রিয় সংগঠক হিসাবে কাজ করেন, তবে আন্দোলন পরিচালনা করবার সময় সবসময়ই তাঁকে পুলিসের চোখ এড়িয়ে কাজ করতে হয়েছে। ১৯৪৪ সালে তিনি পাটনাতে গ্রেপ্তার হন। বছরখানেক জেলে থাকবার পর মুক্তি পান। ১৯৪৫ সালে জেল থেকে মুক্ত হবার পর তিনি গান্ধীজীর সহধর্মিণীর পরিচালিত কস্তুরবা ট্রাস্টের সম্পাদিকা নিযুক্ত হন। এই সময় থেকেই তিনি রাজনৈতিক কাজের পাশাপাশি সমাজসেবামূলক বিবিধ কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন।

১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে দাঙ্গা শুরু হয়, একতরফা আক্রমণ, সংখ্যালঘুদের উপর সংখ্যাগুরুদের আক্রমণ। সেখানকার সংখ্যালঘুদের বাড়ীঘর পেট্রলের আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তাদের লাঞ্ছিত ও ধর্মান্তরিত করা হয়। হতাহতের সংখ্যাও ছিল আতংকজনক। দাঙ্গার খবর শুনে সুচেতা ছুটে যান নোয়াখালিতে, পাশে দাঁড়ান নোয়াখালির দাংগাপীড়িত শিশু-নারীর। নারীরা অসহায়, তাদের এ-অবস্থার পাশে তিনি ছিলেন সর্বদা। যখনই খবর পেয়েছেন, কোনো বাড়ীতে অপহৃতা নারীকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, সামান্য দুই-একজন জনসেবক কর্মী নিয়ে, বহু লোকের বাধা সত্ত্বেও বাড়ীতে ঢুকে পড়েছেন, দুঃস্থা নারীর হাত ধরে টেনে নিয়ে এসেছেন। কখনো কোমর অবধি জল ভেঙে কখনও বা একাকী চলে গিয়েছেন অজানা গ্রামের অভ্যন্তরে অসহায় নারী ও শিশুদের প্রেরণা দিতে, তাদের মনে সাহস সঞ্চার করতে।

নোয়াখালির দাঙ্গাপীড়িত ভীত, আর্ত-নারী বিনাবাক্যে নিঃশব্দে শুধু দূর থেকে তাঁকে দেখেই তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে চলে এসেছিল দলে দলে নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের আশায়। তিনিও তাদের বিভিন্ন ক্যাম্পে এনে আশ্রয় ও খাদ্য দিয়েছেন। ত্রাণকার্যের কাজ শেষ করে ফিরবার কিছুদিন পরেই আবার তাঁকে যেতে হয়েছিল মহাত্মাগান্ধীর সঙ্গে। গান্ধীর সঙ্গে তিনি নোয়খালীতে যান প্রেম ও শান্তির বাণী প্রচার করতে। বাংলা কংগ্রেসের এবং বাইরেরও অনেক মহিলা ও পুরুষ কর্মী নিয়ে সুচেতা নোয়াখালীর গ্রামে গ্রামে শিবির স্থাপন করলেন,—এগিয়ে গেলেন গ্রামের লোকের মনে সাহস ও শান্তি ফিরিয়ে আনবার কাজে। একদিকে রিলিফের কাজ চলছে, অন্যদিকে তাঁরই যৌথ পরিচালনায় শান্তি প্রতিষ্ঠা আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা ও পুনর্বাসনের কাজ, এসব করে চলছিলেন তিনি অক্লান্তভাবেই মুখে হাসি নিয়ে।

১৯৪৬ সালেই তিনি উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার পক্ষে রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র গঠনের কাজে পরিষদের নির্বাচনে নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতালাভ করে। স্বাধীনতালাভের পর তিনি কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির সদস্য হন। বহু বছর তিনি এই কমিটির সদস্য থাকেন। ১৯৫৯ সালে কংগ্রেসের সম্পাদিকা হন। ১৯৬২ সালে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার নির্বাচনে নির্বাচিত হন এবং শ্রম বিভাগের মন্ত্রী হন। ১৯৬৩ সালে অক্টোবর মাসে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সি. বি. গুপ্তা পদত্যাগ করলে সুচেতা মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি এপদে বহাল থাকেন।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সুচেতা কৃপালিনী ক্রমশঃ বেশী করে আত্মনিয়োগ করতে থাকেন সমাজসেবামূলক কাজে। অবশ্য স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময় থেকেই তিনি নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন সমাজসেবার কাজে। ১৯৪৭ সালের প্রথম ভাগেই নোয়াখালির দাঙ্গার পর যখন পাঞ্জাবে দাঙ্গা হয়, সুচেতা সেখানে ছুটে যান আর্তের সেবার জন্য। ভারত বিভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে শরণার্থীরা যখন দিল্লী, পূর্ব পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে আসতে থাকে তখন সুচেতা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাদের সেবায় নিজেকে ডুবিয়ে দেন। এছাড়া স্বাধীনতার পর তিব্বতে চীনের আক্রমণের ফলে তিব্বতীরা ভারতে আসতে থাকলে তিনি সেখানে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় তিব্বত ত্রাণ কমিটি গঠিত হয়।

এরপর দিল্লীর মহিলা, শিশু ও হরিজনদের নিয়ে 'লোক কল্যাণ সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। ধীরে ধীরে এভাবেই সুচেতা সমাজ-সেবার কাজে বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত করতে থাবেন। সমাজসেবার কাজে ভারতের হয়ে তিনি বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৪৫ সালে বিশ্বের শান্তি রক্ষা কল্পে গঠিত হয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। ১৯৪৯ সালে সুচেতা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সময় তিনি ইউরোপ এবং আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন। ১৯৫২ সালে জার্মানীতে যে শান্তি সম্মেলন হয় সেখানে তিনি ভারতের পক্ষে যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে ভারতের সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য রাশিয়া এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যান।

সমাজের আর্তমানুষের সেবায় স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের বেশির ভাগ সময়ই অতিবাহিত করলেও, রাজনৈতিক জীবন থেকে সুচেতা কখনই সম্পূর্ণভাবে বিছিন্ন হয়ে থাকেননি। তিনি ছিলেন মহাত্মাগান্ধীর এক জন শৃঙ্খলাবদ্ধ অনুসরণকারী। শুধু কথায় নয়, গান্ধীর আদর্শকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন আন্তরিকভাবে এবং তাঁর নিস্তব্ধ কর্মকাণ্ডের মধ্যে তার প্রতিফলনও ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। কুটীর শিল্পের প্রসার এবং কেন্দ্রীয় কিছু স্থানে বড় শিল্প স্থাপনের পক্ষে তিনি তাঁর মত পোষণ করেছেন এবং এক্ষেত্রে তাঁর কিছু প্রচেষ্টাও যে ছিল না তা নয়; তবে তা পুরো না হলেও অংশিকভাবে কার্যকরী হয়েছিল। বুনিয়াদী শিক্ষার পক্ষেও তাঁর মত ছিল এবং এ-ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টাও ছিল যথেষ্ট।

১৯৭১ সালে সুচেতা কৃপালিনী তাঁর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তবে রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করলেও সমাজসেবার কাজ তিনি চালিয়ে যান পুরোদমেই। ভারতমাতার স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনে যে সমস্ত ব্যক্তিত্ব এবং প্রভাবশালী পুরুষ এবং মহিলা আত্মোৎসর্গ করেছেন সুচেতা কৃপালিনী হলেন তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর সমগ্রজীবন পর্যালোচনার দ্বারা পরিশিষ্ট সিদ্ধান্ত হিসেবে একটি কথাই পাওয়া যায়—শান্তির সংগ্রামের প্রতীক এই সুচেতা কৃপালিনী ভারতবাসীর স্মৃতির পাতায় থাকবেন অনন্তকাল।

সুভদ্রা কুমারী চৌহান

(১৯০৪—১৯৪৮)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কাল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েকটি দশক এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন-চারটি দশক। এ আন্দোলনের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল ভারতের প্রতিটি প্রান্তে, নির্দিষ্ট সময়কালকে সামনে রেখেই। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে ছিলেন সর্বসাধারণের সঙ্গে বুদ্ধিজীবী-সাহিত্যিক যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সংগ্রামের ময়দানে নেতৃত্ব পর্যন্ত দিয়েছিলেন। হিন্দি সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক সুভদ্রাকুমারী চৌহানের পরিচয় আমরা বিভিন্ন সময়ে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পেয়েছি; কিন্তু এর পাশাপাশি যে তিনি আরো একটি বিরাট কর্মকাণ্ডের একজন সক্রিয় অংশীদার ছিলেন সে খবর বোধহয় আমাদের ততটা জানা নেই।

১৯০৪ সালে নাগপঞ্চমীর দিনে এলাহাবাদের নিহালপুর গ্রামে (বর্তমানে এই স্থানটি মিউনিসিপ্যাল করপোরেশানর একটি ওয়ার্ড) সুভদ্রা কুমারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ঠাকুর রামনাথ সিংহ ছিলেন একজন দৃঢ় শৃঙ্খলাপূর্ণ স্বভাবের মানুষ। সুভদ্রা কুমারীর ছিল তাঁকে নিয়ে তিন বোন এবং দুই ভাই। বড় ভাই ঠাকুর রাজপ্রসাদ সিংহ পুলিশ সাব-ইন্‌সপেক্টরের পদে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি তাঁর চাকুরী থেকে ইস্তফা দেন। দ্বিতীয় ভ্রাতা ঠাকুর রাজবাহাদুর সিংহ ছিলেন আলিগড় রাজ্যের সেশন কোর্টের সেশন-জজ। পরবর্তীসময়ে তিনি এই পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে উত্তরপ্রদেশের বন্দাতে ব্যারীস্টারী করতেন। সুভদ্রা কুমারী ছিলেন এক মধ্যবিত্ত গোঁড়া রাজপুত পরিবারের মেয়ে। স্বভাবতই এই পরিবারটি প্রচণ্ড রকমের পর্দানসীন

পরিবার ছিল ; এঁদের পরিবারের মধ্যে অস্পৃশ্যতার ব্যবহার, সঙ্গে পর্দাপ্রথাও বেশী রকমের প্রচলন ছিল।

তবে সুভদ্রা শৈশবজীবন থেকেই কিছুটা অনুকূল পরিবেশ পেয়েছিলেন : প্রধানত, তাঁর ভ্রাতা রাজবাহাদুরের চেষ্টাতেই সুভদ্রার এলাহাবাদের ক্রশথওয়েট গার্লস স্কুলে শৈশবের শিক্ষা শুরু হয়েছিল। তাঁর এই ভ্রাতাই তাঁদের পরিবারের গোঁড়ামিকে কিছুটা ভাঙতে সক্ষম হয়েছিলেন, তিনি তাঁদের পরিবারের প্রচলিত প্রথাকে ভেঙে ফেলে বোনদের সকলকে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেন। ১৯১৯ সালে পনেরো বছর বয়সে সুভদ্রাকুমারী সরকারী বৃত্তি সহযোগে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় কান্দোয়াতে বসবাসকারী ঠাকুর লক্ষ্মণ সিংহ চৌহানের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ঠাকুর লক্ষ্মণ সিংহ সেই সময় ছিলেন আইনের ছাত্র এবং পরবর্তী সময়ে তিনি জব্বলপুরে আইন ব্যবসার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হন। বিবাহের পর সুভদ্রা কুমারী বেনারসের থিওসফিক্যাল স্কুলে ভর্তি হন, কিন্তু বেশীদিন পড়াশুনা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হোলো না। তাঁর স্বামী ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতে সুভদ্রা কুমারী পড়া ছেড়ে দিয়ে জব্বলপুরে এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঠাকুর লক্ষ্মণ সিংহ তখন একটি বড় ধর্মঘট সংগঠিত করছিলেন। এই সময় থেকেই স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে নেমে পড়লেন স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে। তাঁরা সংগ্রামের প্রথম সারিতে থেকেই কাজ করতে লাগলেন।

রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে সুভদ্রা কুমারী যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরা হলেন,—পণ্ডিত মাখনলাল চতুর্বেদী, পণ্ডিত সুন্দরলাল তাপস্বী, ভাগোয়ানডিন প্রমুখ। ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে যখন তাঁর বয়স সম্ভবত ঊনিশ বছর, সেই সময়ই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সত্যিকারের প্রথম পরীক্ষার সময় ছিল। কংগ্রেস কর্মীরা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জব্বলপুর মিউনিসিপ্যালিটির অফিস বাড়ীতে তেরংগা পতাকা উত্তোলন করলেন। এর ফলে, সরকারী পক্ষের আদেশ অনুযায়ী শুধুমাত্র পতাকা নামিয়েই ফেলা হয়েছিল তা নয়, অতি মাত্রায় উৎসাহ নিয়ে সরকারের পুলিশবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কংগ্রেসকর্মীদের উপর। সংগ্রামী পতাকার এ ধরনের অবমাননা করা মানে জাতির অবমাননা করা ; তাই অত্যন্ত উত্তেজিত সুভদ্রা সরকারী আদেশ অগ্রাহ্য করেই পতাকা নিয়ে কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে একটি শোভাযাত্রা বের করলেন।

শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুভদ্রা। খুব শীঘ্রই এই প্রতিবাদ শোভাযাত্রা সর্বভারতীয় আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সত্যাগ্রহের কেন্দ্রস্থল পরিবর্তন করে নিয়ে যাওয়া হোলো নাগপুরে, ভারতের সমস্ত প্রান্ত থেকে সত্যাগ্রহীরা আসতে লাগলেন। সুভদ্রাকুমারী এবং তাঁর স্বামী ঠাকুর লক্ষ্মণ সিংহ একদল সত্যাগ্রহীকে জব্বলপুর থেকে পরিচালিত করে নিয়ে এলেন গন্তব্যস্থলে। সুভদ্রাই দেশের মহিলা সত্যাগ্রহীদের দলের মধ্যে প্রথম সত্যাগ্রহী। তাঁকে প্রথমে সত্যাগ্রহী হিসাবে অনুমোদন দেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি উঠল, কিন্তু এরকম একজন রাজপুত রমণীকে আন্দোলন থেকে বিরত করানো খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে, কারণ তাঁর স্বাধীনতায় উৎসর্গীকৃত জীবনে কোনো খাদ ছিল না। আন্দোলনে অংশগ্রহণের ফলে তাঁকে গ্রেপ্তার হোতে হোলো। তাঁর গ্রেপ্তারের পর সি. রাজাগোপালাচারী তাঁর উদ্দেশ্যে যে বিপুল জনসমাবেশ ঘটিয়ে নাগপুরে জনসভা করেছিলেন, সেখানে তিনি তাঁর সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন সোচ্চার কণ্ঠে।

মহাকোশল অঞ্চলের অগ্রণী নেতৃত্বের মধ্যে সুভদ্রাকুমারী নিজেকে যেভাবে স্বাধীনতার কাজে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন তা উল্লেখের দাবী রাখে। তিরিশ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯৩৪ সালে এম. কে. প্রদেশে কংগ্রেস মহিলা সম্মেলনের তিনি ছিলেন সভাপতি। আইন অমান্য আন্দোলনেও ছিল তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। এ আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি প্রথম তাঁর স্বামীর সঙ্গে গ্রেপ্তার হন, কিন্তু তখন তাঁর কোলে ছিল দুগ্ধপোষ্য শিশু এবং সেইকারণেই তিনি গ্রেপ্তারের অনুমোদন পেলেন না, তাঁর স্বামীকেই শুধু গ্রেপ্তার করা হোলো। কিন্তু ১৯৪০ এবং ১৯৪২ সালে তাঁকে শিশু কোলে নিয়েই জেলে যেতে হয়েছিল, কারণ আন্দোলন তখনও চলছে এবং এতে তাঁরও অংশগ্রহণ ছিল অব্যাহত। জেলে গিয়ে তিনি ভীষণ ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরপর দু'বার অসুস্থ হওয়ার জন্য, বস্তুত পক্ষে দ্বিতীয় বার মৃত্যুর মুখোমুখি হবার জন্য, তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

জেল থেকে ছাড়া পাবার পর সুচিকিৎসার ফলে সৌভাগ্যবশতঃ তিনি আরোগ্য লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে এবং ১৯৪৬ সালে তিনি যথাক্রমে কেন্দ্রীয় পরিষদ এবং বিধান সভায় নির্বাচিত হন। সুভদ্রাকুমারী ছিলেন জন্ম থেকেই কবি এবং ছোট গল্প লেখিকা। ১৯১৩ সালে যখন তাঁর বয়স মাত্র নয় বছর, তখন 'মার ওয়াদা' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা

প্রকাশিত হয়। অল্প বয়সেই তাঁর কবি হিসাবে স্বীকৃতি হয়েছিল, যখন তিনি কিছু বিখ্যাত কবির কবিতা সংগ্রহ করে 'কবিতা কৌমুদী' প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ছিল সংগ্রাম; তিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে জনসাধারণের মনে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চিন্তা উজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে সমস্ত দেশপ্রেমিক লেখকদের সৃষ্টির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন, তাঁরা হলেন ;— মাখনলাল চতুর্বেদী, বালকৃষ্ণ শর্মা (নবীন), মুন্সী প্রেমচাঁদ। তাঁর কবিতাগুলি ছিল জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করবার ব্যাপক প্রতিমূর্তি এবং তা খুব শীঘ্রই সমস্ত দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। উত্তেজনাপূর্ণ এবং নতুন জাতীয়তাবাদ জাগানোর প্রতীক হিসাবে তাঁর সৃষ্টি জনমানসে সাড়া জাগিয়েছিল এবং তার প্রতিফলনও ঘটেছিল ব্যাপকভাবে।

তাঁর বিখ্যাত কবিতা সংগ্রহের মধ্যে, মুকুল (১৯৩০)-এই সংগ্রহের জন্য তিনি সর্বভারতীয় হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে 'শেখসরিয়া' পুরস্কারের সম্মান অর্জন করেছিলেন। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত 'ভিখারী মতি' পুস্তকের জন্য ১৯৩৩ সালে তিনি আবার 'শেখসরিয়া' পুরস্কার পান। 'ভিখারীমতি' পুস্তকটি ছোট গল্পের একত্র সংকলিত পুস্তক। এই পুস্তকখানির অনুসরণে ১৯৩৪ সালে 'উন্মাদিনী' এবং ১৯৪৬ সালে 'সিধেসাদেচিত্র' দু'খানি ছোট গল্পের পুস্তক প্রকাশিত হয়। ছোটদের তিনি খুবই ভালবাসতেন। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত সময়কালে তিনি ছোটদের জন্য বেশ কিছু কাব্য লিখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে এই কাব্যগুলিই 'সভা-কেখেল' এই নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি দু'খানি কবিতার পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করতেন, এগুলি হোলো 'বিবেকনাত্মকগল্প-বিহার' এবং 'ত্রিধারা'। কাব্য রচনার ক্ষেত্রে সুভদ্রাকুমারীর নাম অবিস্মরণীয়। তাঁর রচিত 'ঝাঁন্সী রাণী' কাব্য গাথা বিখ্যাত ; এ কাব্যের মধ্যে 'খুব লারি মারদানি ওহো টু ঝাঁন্সীওয়ালী রানী দি'—লাইনটি দেশের পাঠককুলের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করেছিল।

তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক। প্রজ্জলিত দেশপ্রেমিকতা, নারীদের সমানাধিকারের প্রশ্নে, অন্যায় কুসংস্কারপূর্ণ সামাজিক বাধা অপসারণ, এ সমস্ত কাজেই তাঁকে দেখা গিয়েছে তাঁর দেহ-মনকে উৎসর্গ করতে। সাদাসিধে জীবন যাপনে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন : ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি কখনও পায়ে চটি পড়েননি, খালি পায়ে পথে হেঁটে-

ছেন। হরিজন এবং সমাজের অবহেলিত মানুষজনের প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল। তাঁর বহু কবিতার মধ্যে তিনি এর প্রকাশও ঘটিয়েছেন। তিনি সবসময়ই মেথরদের কলোনীতে যেতেন, তাঁদের অবস্থার খোঁজখবর নিতেন। ১৯৪৫ সালে একবার যখন একজন ঝাড়ুদার রাজনৈতিক কাজে গ্রেপ্তার হয়, তখন তিনি তার মেয়েকে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা পর্যন্ত করেছিলেন। পণপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি সবসময়ই সোচ্চার কণ্ঠ ধ্বনিত করেছেন। অসবর্ণ বিবাহের ক্ষেত্রেও তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না ; তিনি তাঁর মেয়েদের অসবর্ণ বিবাহ দেন।

গান্ধীজীর রাষ্ট্রনীতি শিক্ষা থেকে নিরপেক্ষ ভূমিকায় থাকাকেই তিনি মেনে নিয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমান একতার জন্য তিনি চেষ্টা করে গিয়েছেন তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই। ১৯৪৬-৪৭ সালে জব্বলপুরে যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, তখন তিনি দিনের পর দিন মুসলমান এলাকায় কাটিয়েছেন, তাদের উদ্ধারের কাজে সময় অতিবাহিত করেছেন। ১৯৪৮ সালে ১০-ই ফেব্রুয়ারী বসন্ত পঞ্চমীর দিনে সুভদ্রা কুমারী যখন নাগপুর থেকে জব্বলপুর যাচ্ছিলেন তখন গাড়ীর দুর্ঘটনায় এই প্রজ্বলিত প্রদীপটি নিভে গিয়েছিল ; শেষ নিঃশ্বাস পড়ল সুভদ্রা কুমারীর, মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে।

সুহাসিনী গাঙ্গুলী

(১৯০৯—১৯৬৫)

স্বাধীনতালাভের পূর্বে দুই বাংলার মানুষের মধ্যে যে দৃঢ় বন্ধন পরিলক্ষিত হোতো, আজ স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সে বন্ধনে শিথিলতার আভাস স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই ভারতেরই অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ আলাদা হয়ে গেল পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ অধুনা বাংলাদেশ থেকে। দুই বাংলার সংগ্রামী বন্ধুদের মধ্যে বন্ধনের ক্ষেত্রে আপাতত যে ফাটল দৃষ্টিগোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেক বেশী আহত হয়েছিল তাঁরা মনের দিক থেকে। ওপার বাংলার, অধুনা বাংলাদেশের একজন সংগ্রামী মহিলার প্রসঙ্গ নিয়েই আমাদের বর্তমান আলোচনা। ইনি হলেন পূর্ববর্তী পূর্ববাংলার খুলনা জেলাবাসী সুহাসিণী গাঙ্গুলী, পরাধীন ভারত মাতার স্বাধীনতালাভের সংগ্রামে যাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

১৯০৯ সালে পূর্ব বাংলার খুলনা জেলায় সুহাসিণী গাঙ্গুলী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা অবনীশচন্দ্র ছিলেন স্থানীয় জেলা কালেক্টরেটের কর্মচারী ; মাতা সরলা সুন্দরী। তিনি ছিলেন মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত। শৈশব শিক্ষা সম্পন্ন হবার পর সুহাসিণীর কৈশরের শিক্ষাগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয় ঢাকাতে ; ঢাকাতে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়বার পর তিনি কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে তিনি একটি স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নেন ; এই স্কুলটি ছিল বোবা কালাদের পাঠের জন্য। এই স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করতে করতেই তিনি একটি সাঁতার শিখবার ক্লাবে ভর্তি হলেন ; সাঁতারের ক্লাবটি ছিল 'ছাত্রীসংঘ' নামক একটি সংস্থার দ্বারা পরিচালিত, যেটি শুধুমাত্র মহিলাদের শিক্ষা দেবার জন্যই একটি সংস্থা। মন্দিরা দেবী ছিলেন তাঁদের শিক্ষয়িত্রী। সাঁতারের জন্য নির্ধারিত মন্দিরা দেবীর শিক্ষকতায় যে সব শিক্ষার্থী ছিল,

তাঁরা যে লেক বা জলাশয়টি ব্যবহার করতো সেটির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন কমলা দাশগুপ্তা। ইনি 'যুগান্তর' নামক রাজনৈতিক বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কমলা দাশগুপ্তা সুহাসিণীর চালচলন লক্ষ্য করবার পর তাঁকে তাঁদের দলভুক্ত করবার জন্য মনস্থ করলেন। তিনি ধীরে ধীরে সুহাসিনীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন এবং খুব শীঘ্রই সুহাসিনী তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত হন। প্রাথমিক পরীক্ষা করবার পর কমলা দাশগুপ্তা সুহাসিনীকে দলের নেতৃত্ব রাখাল দাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

রাখাল দাসের সঙ্গে পরিচয় হবার পর সুহাসিনী ধীরে ধীরে এই বিপ্লবী দল অর্থাৎ 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩০ সালে বিপ্লবী সূর্য সেন যিনি মাষ্টারদা নামে পরিচিত, তাঁর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়। এরপরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত দলের দুই নেতা গনেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং মূল বিপ্লবী দল থেকে আলাদা হয়ে গেলেন; এঁদের দু'জনের সাহায্যকারী হিসাবে আরো দু'জন যথাক্রমে জীবন মোহন ঘোষাল এবং অনন্ত গুপ্ত দল ছেড়ে গেলেন। ঘটনার সময় পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ করবার পর তাঁরা কলকাতায় চলে এলেন।

ইতিমধ্যে সরকার পক্ষ থেকে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ এবং গতিবিধি লক্ষ্য রাখবার জন্য কিছু লোক নিয়োগ করা হোলো অর্থাৎ যারা ছিলেন পুলিসের গুপ্তচর। এরফলে বিপ্লবী নেতারা, এমনকি সূর্য সেন পর্যন্ত সতর্ক হয়ে গেলেন। এদিকে দলের মধ্যে নেতৃত্বের শৃংখলার অভাব কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করতে লাগল। তখনও পর্যন্ত গনেশ ঘোষ 'যুগান্তর' দলের নেতা ভূপেন্দ্র কুমার দত্তের সঙ্গে একটা গোপন আশ্রয় স্থল খুঁজছেন, অনন্ত সিং এবং অন্য দুজন ও তাঁর সঙ্গে আছেন। কলকাতায় পুলিসের কার্যবিধি প্রচণ্ড সর্তকতামূলক হয়ে উঠল; এজন্য ভূপেন্দ্র কুমার তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মী বসন্ত কুমার ব্যানার্জীকে অনুরোধ করলেন, চন্দননগরে একটু থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে। বসন্তকুমার চন্দননগরের বাসিন্দা। স্থানীয় লোকদের কৌতুহল এড়াবার জন্য বসন্তকুমার এক বিশ্বাসী দাম্পত্য স্বামী-স্ত্রীর পরিবার খুঁজছিলেন। একজন বিশ্বাসী দাম্পত্য পরিবার পাওয়া খুব সহজ হোলো না; অবশেষে একটা সমাধানের পথ মিলল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলের একজন কর্মী শশধর আচার্য্য, তিনি দলেরও কর্মী, মিথ্যা পরিচয় নিয়ে একটি বাড়ীভাড়া করলেন। রাখালের সাহায্য

নিয়ে সুহাসিনীকে পাওয়া গেল। তদানীন্তন সময়কার হিন্দু সমাজের সংস্কারকে উপেক্ষা করে সুহাসিনী সেদিন শশধর আচার্য্যর স্ত্রী হয়ে কাজ করতে রাজী হয়ে গেলেন।

বসন্তকুমারের এখানে আসবার পর, খুব শীঘ্রই চেষ্টা করে তিনি সুহাসিনীকে কাছাকাছি একটি স্কুলে শিক্ষকতার কাজের ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু পলাতকদের তখনো খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে। হেমন্ত তফাদারও সুহাসিনীর ভাই বন্ধু পরিচয়ে তাঁদের চন্দননগরের বাসায় রয়ে গেলেন। ভূপেন্দ্রকুমার রাজনৈতিক হিসাবে ইতিমধ্যে আটক হয়েছেন। লোকনাথ বল প্রমুখ নেতারা তখনো এই দলে যোগ দেননি, পরবর্তী সময়ে অবশ্য এঁরা এ-দলে যোগ দেন। কিছু দিনের মধ্যেই অনন্ত সিং পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। ইতিমধ্যে অন্য দু'জন পলাতকের খবরও সরকারী পুলিশ সংগ্রহ করে ফেলেছিল, এই সঙ্গে তারা বিপ্লবীদের গোপন আশ্রয়স্থলটিকেও আবিস্কার করে ফেলল।

১৯৩০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর। কলকাতার পুলিশ কমিশনার দিনটিকে স্থির করলেন বিপ্লবীদের আস্তনায় হানা দেবার জন্য। দিনটিতে নির্দিষ্ট সময় থেকেই ইউরোপীয়ান পুলিশ ফায়ার শুরু করল, বিপ্লবীরাও প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে লাগলেন; বেশ কয়েকজন নিহতও হলেন পুলিশের গুলিতে। শশধর ও সুহাসিনী গ্রেপ্তার হলেন। তাঁদের হাজতে নিয়ে যাওয়া হোলো; পুলিশহাজতে সুহাসিনীকে প্রচণ্ড অত্যাচার সহ্য করতে হয়। কিন্তু প্রমাণাভাবে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারী আদালতের পক্ষ থেকে কোনো রকমের ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হোলো না, কিন্তু সন্দেহের অভিযোগ দেখিয়ে ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ছয় বছর এবং সঙ্গে ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে বাকী বিচারের সময় পর্যন্ত, সর্বসাকুল্যে প্রায় আট বছর তাঁকে বন্দীজীবন কাটাতে হোলো। ১৯৩৮ সালে রাজনৈতিক বন্দীজীবনাবস্থা থেকে মুক্তি পাবার পর তিনি আর গান্ধীজীর ভারত-ছাড় আন্দোলনের প্রতি আস্থা রাখতে পারলেন না। তিনি কমিউনিজমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেন এবং এ আদর্শকে পাথেয় করে নিলেন। এর পরবর্তী সময়েও তাঁকে তিন বছর জেল খাটতে হয়েছিল সংগ্রামের ময়দানে অংশগ্রহণের কারণে। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর তিনি কলকাতা করপোরেশনের স্কুলে শিক্ষকতার চাকরী নিলেন।

ভারতের স্বাধীনতা এলো বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে,

সুহাসিনীকেও সেই সংগ্রামের ময়দানে দেখা গিয়েছিল একজন নির্ভীক সৈনিক হিসাবে। স্বাধীনতার পর তিনি আর সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যকলাপের সংগে যুক্ত হতে পারেন নি। কিন্তু একান্ত মানসিক সাহস এবং উদ্যমের ক্ষেত্রে তাঁর কখনোই ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় নি। ১৯৬৫ সালে এক দুর্ঘটনায় তিনি ইহলোকের মায়া ছেড়ে পরলোকে পাড়ি দিলেন ; এই ভারতভূমির জন্য রেখে গেলেন শুধুমাত্র তাঁর বিপ্লবী চেতনার সাহস এবং উদ্যমের কর্মধারার কিছু অমূল্য স্মৃতি। ভারতবাসী এই মহিয়সী নারীকে স্মরণে রাখবে চিরকাল। তাঁর অংশগ্রহণ স্বাধীনতা সংগ্রামের মঞ্চকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল।

শ্রীমতী সুধাতাই যোশী

(১৯১৮—   )

বিংশ শতাব্দীর প্রথম-দ্বিতীয় দশক থেকে ভারতের আকাশে বাতাসে একটা সংগ্রামের রণধ্বনির আগমন সূচিত হয়েছিল একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। ভারতের মাটিতে এই শতাব্দীতে জন্মেছিলেন নানান দিক্‌-পালেরা; ভারতের মাটিকে তাঁরা পবিত্র করেছিলেন, ভারতের আকাশ বাতাসকে প্রাণময় করে তুলেছিলেন তাঁদের প্রতিভার আলোকে। সংস্কৃতি সাহিত্যের জাগরণের পাশাপাশি স্বাধীনতার মন্ত্র সোচ্চার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল সেদিনের সেই দিক্‌পাল, সংগ্রামী ব্যক্তিত্বদের কণ্ঠে। ভারতের প্রতিটি প্রান্তের মানুষ তখন একই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন,—ভারত মাতার পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করতে হবে। আমাদের আলোচ্য সংগ্রামের মঞ্চে এখন যাঁর আবির্ভাব হবে, তিনি হলেন সুদূর গোয়ার এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের কৃষক কন্যা। তাঁর নাম শ্রীমতী সুধাতাই যোশী।

১৯১৮ সালের ১৮-ই জানুয়ারী গোয়ার অন্তর্ভুক্ত প্রিয়ল গ্রামের এক মধ্যবিত্ত চিত্তপভন ব্রাহ্মণ পরিবারে সুধাতাই যোশী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন কৃষিজীবী ব্রাহ্মণ, পেশায় পুরোহিত। সুধাতাই কোনো স্কুলে পড়েননি; তেরো বছর বয়স পর্যন্ত তিনি তাঁর পিতার গৃহেই পিতার কাছে কিছু প্রাথমিক শিক্ষা পান। কিন্তু নিজের চেষ্টাতেই তিনি গৃহে বসে তাঁর জ্ঞান বাড়িয়ে যেতে থাকেন। তিনি রামায়ণ, মহাভারত এবং মহারাষ্ট্রীয় বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তি ও কবির রচনা পড়তে থাকেন। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ বিবাহের পরও তিনি তাঁর জ্ঞান অর্জনের কাজ চালিয়ে যান। তেরো বছর বয়সে ১৯৩১ সাল অথবা ১৯৩২ সালে (সঠিক তারিখ জানা যায়নি) মহাদেব শাস্ত্রী যোশীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

মহাদেব শাস্ত্রী যোশীর প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর সুধাতাই-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ; সেই কারণে নতুন বিবাহিত এই কিশোরীকে তাঁর সতীনের দুই মেয়ে এবং বৃদ্ধা শাশুড়ীর দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হোলো।

স্বামীর গৃহে নানান সাংসারিক দায়িত্ব থাকা স্বত্ত্বেও সুধাতাই কিন্তু তাঁর পাঠাভ্যাস থেকে বিরত হলেন না ; পিতৃগৃহের একটা ধর্মীয় পরিবেশ এবং স্বামীর গৃহে দর্শন ও সাহিত্য সংস্কৃতির আবহাওয়া বর্তমান থাকবার ফলে, এ-পরিবেশ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং এর ফলে তাঁর মনকেও সুন্দরভাবে গঠন করা তাঁর পক্ষে সহজেই সম্ভব হয়েছিল। মহাদেবশাস্ত্রী একজন সমাজ-সংস্কারক ও রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন ; তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের বাড়ীতে আসতেন, তাঁদের সঙ্গে সমাজ, রাজনীতি এবং দর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে করতে সুধাতাইও সামাজিক এবং রাজনৈতিক যে সমস্ত সমস্যাগুলি দেশের মানুষকে ঘিরে আছে, সেগুলি সম্বন্ধে ধীরে ধীরে যথেষ্ট পরিমাণে ওয়াকিবহাল এবং সচেতন হয়ে উঠতে লাগলেন। এছাড়া, স্বামীর সঙ্গও তাঁকে এসব ব্যাপারে সচেতন হতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করে।

১৯৩৫ সালে মহাদেবশাস্ত্রী যখন পুনা শহরের উন্নতির বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য পুনা শহরে যান, তখন তিনি সঙ্গে স্ত্রী সুধাতাইকে নিয়ে যান। শহরের বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানবার পর সুধাতাই তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে এখানকার সামাজিক এবং ধর্মীয় বিষয়ে যথেষ্ঠ সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করেন, এবং এ-সকল বিষয়ে একটা সমৃদ্ধশালী পরিবর্তনের কথা চিন্তা করতে লাগলেন, গোঁড়ামি থেকে ধীরে ধীরে তিনি সংস্কারবাদী হতে থাকলেন। একই সঙ্গে বহির্জগতের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করতে লাগলেন ; পারিবারিক কাজকর্ম ছাড়াও তিনি তাঁর স্বামীকে তাঁর সাহিত্যিক, সামাজিক এবং রাজ-নৈতিক বিভিন্ন কর্মসূচীতে যথা সম্ভব বেশী করে সাহায্য করতে লাগলেন। এভাবে ধীরে ধীরে কাজকর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে থাকবার ফলে এমন একটা দৃঢ়তাপূর্ণ সময় এলো যখন তিনি তাঁর ঘরসংসার থেকে সময় করে নিলেন রাজনৈতিক কাজের জন্য এবং গোয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পূর্ণ সংসারী অবস্থায় স্বল্প সময়ের জন্য হোলেও পড়াশুনা করবার অভ্যাসকে সবসময়ই বজায় রাখবার চেষ্টা করতেন তিনি।

গোয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পর্তুগীজ জেলে বন্দী থাকাকালীন তিনি কিছু ইংরেজীও শিখেছিলেন। ভারতের পর্তুগীজ উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার সংগ্রামে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, সমগ্র দেশবাসীর কাছে তার পরিচয়েই তিনি পরিচিত হয়ে আছেন। তাঁর এই স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করবার ব্যাপারে তাঁর স্বামী মহাদেব শাস্ত্রী তাঁকে প্রচণ্ড ভাবে উৎসাহ দিয়েছেন সবসময়ই। মহাদেব শাস্ত্রী ছিলেন গোয়া জাতীয় কংগ্রেসের একজন সক্রিয় সদস্য এবং তদানীন্তন রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্বে। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে ভারতের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তাঁর ডাক পড়ে; গোয়া দলবদ্ধ সত্যাগ্রহীদের মহাদেব শাস্ত্রী ছিলেন আহ্বায়ক, এই আন্দোলনের সময় সুধাতাইকে রাজনৈতিক জীবনে সেরকম সক্রিয়ভাবে দেখা যায়নি। শান্ত অথচ ঘনিষ্ঠ ভাবে সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি। এই ঘটনা তাঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্ব সম্পর্কে আরো বেশী সচেতন হতে সাহায্য করে।

মহাদেব শাস্ত্রী এই সময় 'ভারতীয়-সংস্কৃতি কোষ' (অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতির বিশ্বকোষ) লেখার কাজে যথেষ্ট ব্যস্ত ছিলেন। ঠিক এ সময়ই সুধাতাই চাইছিলেন না যে, তাঁর স্বামী এ সমস্ত কাজ ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনতার কাজে নেমে পড়েন। কিন্তু এ ব্যাপারে স্ত্রীর আপত্তি সত্ত্বেও মহাদেব শাস্ত্রী গোয়া-স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে নেমে পড়বার সিদ্ধান্ত নিলেন পাকাপাকিভাবে। তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা 'ভারতী' পত্রিকায় বিস্তৃত তথ্য সম্বলিত হয়ে প্রকাশিত হোলো এবং তিনি কাজে নেমে পড়লেন। গোয়া জাতীয় কংগ্রেস ইতিমধ্যে নিষিদ্ধরূপে ঘোষিত হয়ে গিয়েছিল, নেতৃত্বের স্বল্পতায় কারণেই সেই সংগঠনের এরূপ অবস্থা হয়েছিল। এইবার সেই কারণেই সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য প্রকাশ্য অধিবেশনে এই সংগঠনের পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হোলো সুধাতাইকে। এই গুরু দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্নও করতে লাগলেন তিনি। এর ফলস্বরূপ তাঁর উপর দৃষ্টি পড়ল পর্তুগীজ সরকারের। সাম্রাজ্যবাদী পর্তুগীজ সরকার তাঁর উপর সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করল এবং সেই সঙ্গে যতশীঘ্র সম্ভব তাঁকে গ্রেপ্তার করবার ব্যবস্থাও নিলো। এই উপলক্ষে সরকার পক্ষ থেকে একটি পুরস্কার ঘোষণা হোলো, যদি কোনো ব্যক্তি সুধাতাই যোশীর গতিবিধির তথ্য সংগ্রহ করে সরকারকে তা জানতে সাহায্য করে তবে এই আকর্ষণীয় পুরস্কারটি হবে তাঁর প্রাপ্য

যার পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকা। স্বামীর সংগে সংগে তাঁকেও শুধুমাত্র দর্শকের ভূমিকায় না থেকে কাজে নেমে পড়তে হোলো। কিন্তু এতবড় আকর্ষণীয় পুরস্কার ঘোষণা করেও কোনো ফল হোলো না, কোনো ব্যক্তি এগিয়ে এলো না তাঁর গোপন বাসের সন্ধান দিতে। পরিবর্তে যখন তিনি গোপন সীমান্ত পার হয়েছেন এবং গোয়ার মাটিতে পা দিয়েছেন, তখন গৃহস্থ অগণিত মানুষ পথে বেরিয়ে এসেছেন, তাঁকে তারা অভিনন্দন জানিয়েছেন। গ্রেপ্তার হবার অথবা পর্তুগীজ সরকার কর্তৃক চরম শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ডের ভয়াবহ শাস্তির কথা জেনেও গোয়ার একজন মানুষও ভীত হয়ে দূরে সরে দাঁড়ায় নি।

তারা নির্ভয়ে সব বিপদকে উপেক্ষা করে এগিয়ে গিয়েছে এই দেশপ্রেমিক মহিলাকে তাদের উষ্ণ অভিনন্দন জানাতে। এ প্রসংগে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। একজন বৃদ্ধার গৃহে সুধাতাই কিছু সময়ের জন্য আশ্রয় নেবার সময় বৃদ্ধা তাঁকে যথাসাধ্য সেবা করলেন, সংগে বৃদ্ধার মনের দুঃখ জানালেন সুধাতাইকে। তাঁর দুঃখ ছিল সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তিনি যোগ দিতে পারেন নি, কারণ, এ আন্দোলন চলাকালীন বৃদ্ধার কন্যার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, কন্যার পরিচর্যার কাজে আটকে থাকবার জন্য তাঁর আর আন্দোলনে অংশ নেওয়া সম্ভব হয় নি। এজন্য তিনি খুবই দুঃখিত। ঘটনাটি উল্লেখ করবার উদ্দেশ্য হোলো, এ ধরনের বহু ঘটনার উল্লেখ আছে যা প্রমাণ করতে সাহায্য করে স্বাধীনতা-সংগ্রাম আন্দোলনে সম্পূর্ণ সমর্থন এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যাপারে গোয়ার প্রতিটি মানুষ কতো আগ্রহী ছিল, এমন কি সংসারের কর্মব্যস্ততার থেকে অবসর নেবার যার সময় হয়েছে এমন একজন বৃদ্ধাও অন্তরে উপলব্ধি করতে পেরেছেন সংগ্রামের মূল্য। নিজেকে এই পবিত্র সংগ্রাম আন্দোলনের একজন সক্রিয় অংশীদার হিসাবে কাজে লাগাতে না পেরে তিনি যে কত দুঃখিত তাও তিনি প্রকাশ করতে ভোলেন নি। আর সেই কারণেই সুধাতাই যোশীকে শুধুমাত্র দর্শকের ভূমিকায় সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বসে থাকা সম্ভব হয় নি, তিনিও তাই স্বামীর সংগে সংগে এগিয়ে এসেছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশীদারের দায়িত্ব নিতে।

সীমান্ত থেকে সুধাতাই মাপসায় রওনা হলেন, ১৯৫৫ সালের ৫ই এপ্রিল তিনি মাপসায় পৌঁছোলেন। পরের দিন অর্থাৎ ৬ই এপ্রিল গোয়া সত্যাগ্রহীদের নিয়ে রওনা হলেন পর্তুগীজ সামরিক পুলিস বাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত পাবলিক স্কোয়ারের দিকে পর্তুগীজ উপনিবেশকতা—

বাদের নিন্দা করে। স্বাধীনতার সমর্থনে বক্তব্যপূর্ণ পোস্টার নিয়ে তাঁদের শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল। দাবী সম্বলিত পোস্টারে তাদের জোরালো দাবীর আরো যে বিষয়টি শোভা পাচ্ছিল তা হোলো, পর্তুগীজকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, গোয়া ১৫৮০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্পেনের ক্রীতদাসত্ব বরণ করেছে, কিন্তু তারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে, নিজেদের স্বাধীনতার জন্য তারা জীবন দিয়েছে, তাই আজও তারা চুপ করে থাকবে না। পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে নিজেদের দাবী সম্বলিত স্লোগানে মুখর সত্যাগ্রহীদের এই শোভাযাত্রাটি যখন সুধাতাই যোশীর নেতৃত্বে এগিয়ে আসছিল তখনই সহকর্মীদের সঙ্গে তিনিও পুলিশের সামনে আসামাত্র গ্রেপ্তার হলেন।

কারাবরণ করে জেলের বন্দী-জীবনের মধ্যে এসে পড়লেন তিনি; জেলের ভিতরে এসেও কিন্তু তিনি অন্যায়ের পক্ষ সমর্থনে চুপ করে থাকতে পারেন নি। জেলের ভিতরে তাঁর নিজের এবং অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে অবিচার ও অমানবিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেল-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তিনি মতামত প্রকাশ করেন জেলের ভিতরে এ নিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেল; কিন্তু সেরকম কোনো সুফল পাওয়া গেল না, সুধাতাই কিন্তু জেল-কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সুস্থ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। গান্ধীজীর অহিংসনীতির আদর্শ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, সেই জন্য সামরিক স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন তিনি। সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হবার দশ দিন আগে থেকেই তিনি আর একজন সত্যাগ্রহী সিন্ধুতাই দেশপাণ্ডের সঙ্গে অনশন করতে থাকেন; সময়টা ছিল ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাস। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তের পর প্রত্যেক বন্দীকে পুলিশের জিম্মা থেকে বিচার বিভাগের তত্ত্বাবধানে নিয়ে যেতে হবে, কারাবন্দীদের মূলতঃ এই দাবীর স্বপক্ষেই ছিল এ অনশন।

গোয়ার আইনব্যবস্থা অনুযায়ী সেই সময়কার রেওয়াজ ছিল, রাজনৈতিক বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা শেষ হবার পরও তাঁদের পুলিশের জিম্মায় রাখা হোতো। এর ফলে, বন্দীদের উপর পুলিশের অন্যায় অত্যাচার হোতো; পর্তুগীজ পুলিশ মহিলা সত্যাগ্রহীদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার করত। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনিত হোলো সুধাতাই যোশীর কণ্ঠে। এক জেল থেকে অন্য জেলে যাবার সময় তিনি জেলের অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য বন্দীদের

মনে প্রেরণার সঞ্চার করেছেন, একই সঙ্গে বহু বন্দীর মনের হতাশা ও কষ্টের উপশম করবার জন্য তিনি তাঁদের সঙ্গে সুযোগমত আলোচনা করেছেন ; এর ফলে এইসব বন্দীদের মনে নতুন উদ্যোগ জাগাবার চেষ্টা করে তিনি এতটুকু ব্যর্থ না হয়ে বরং সফলতাই লাভ করেছেন।

কিন্তু কারাগারের বন্দীজীবন তাঁর সহ্য হোলো না, তিনি অনবরত অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকলেন ; তাঁর শরীর ভেঙে পড়তে লাগল। এই কারণে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে, সঙ্গে বহু স্বাধীনতা-প্রেমী মানুষের কাছ থেকে অনবরত চাপ আসতে থাকে সুধাতাই-এর মুক্তির দাবীর। এত মানুষের ভালোবাসার আকর্ষণ উপেক্ষা করা পর্তুগীজ সরকারের পক্ষে সম্ভব হোলো না ; অবশেষে ১৯৫৯ সালের ১৮ই মে সুধাতাই-এর মুক্তি হোলো। কারাজীবন থেকে মুক্ত হয়ে পুণাতে যখন তিনি পৌঁছলেন, তখন অগণিত মানুষ এগিয়ে এসেছিল তাঁকে তাদের হৃদয়ের অভিনন্দন জানাতে। যেখানেই তিনি গিয়েছেন, সেখানেই পেয়েছেন তাঁর প্রাপ্য অভিনন্দন। গোয়া-স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর সংগ্রামী ভূমিকার উল্লেখ করে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু তাঁর প্রশংসা করেন এবং তাঁর অসীম দেশপ্রেমিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সক্রিয় অংশগ্রহণের পাশাপাশি তিনি তাঁর স্বামীর পাশে থেকে তাঁর পুস্তক প্রকাশনার কাজে সাহায্য করেছেন সব সময়ই। তাঁর স্বামীর এই গ্রন্থগুলির বেশীর ভাগই প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে। স্বাধীনতার পর তিনি আর সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন নি, স্বামীর সঙ্গেই 'ভারতীয় সংস্কৃতি কোষ' প্রকাশনার কাজে যুক্ত হন। এরই পাশাপাশি নিজের সাধ্যমত গ্রামের মানুষদের সাহায্য করে চলেন। বর্তমানে তাঁর নিবাস পুণার কাছে ধায়ারী গ্রাম।

সুব্বামা ডুভ্‌ভুরী

(১৮৮৭—১৯৬৪)

অন্ধ্রপ্রদেশের মহিলা রাজনৈতিক নেত্রী এবং সমাজ সংস্কারকদের মধ্যে যাঁর নাম সর্বপ্রথমেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তিনি হলেন সুব্বামা ডুভ্‌ভুরী ; জন্মেছিলেন ১৮৮৭ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব-গোদাবরী জেলার কাদিয়াম গ্রামে। তাঁদের পরিবার ছিল মাল্লাডি সুব্বাভাদানুলুর 'বৈদিক' সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ; তিনি এই সম্প্রদায়ের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা-মাতার বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। তবে একথা ঠিক যে, তাঁদের পরিবার ছিল অত্যন্ত রক্ষনশীল পরিবার ; সেই কারণেই, স্কুল-কলেজের-শিক্ষা তো নয়, এমন কি গৃহ শিক্ষা বলতেও যা বোঝায় তাও তাঁর হয়নি।

এগারো-বারো বৎসর বয়সে সামাজিক প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তাঁর বিবাহ হয় ডুভ্‌ভুরী ভেনকায়্যা নামক এক ব্যক্তির সংগে। বিবাহ জীবনে নেমে আসে চরম দারিদ্র্য ; বস্তুত পক্ষে তাঁর স্বামী ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র, বলতে গেলে তাঁদেরকে ভিক্ষার দানের উপর বেঁচে থাকতে হোতো। বিবাহের দশ বছর সময়কাল অতিবাহিত হবার সংগে সংগেই সুব্বমা সন্তানহীন অবস্থায় স্বামীহীন হয়ে পড়েন। একজন দরিদ্র, সন্তানহীন, বিধবা, স্বজনহীন, অপরূপ দৈহিক সৌন্দর্য্যের অধিকারিনী এই মহিলা একেবারে সহায় সম্বলহীন হয়ে বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়লেন। এই অবস্থায় অভিভাবকহীন হয়ে জীবন কাটানো খুবই বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য তিনি এইসব বাধা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন খুব সহজেই।

তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগে যুক্ত হয়ে পড়লেন, ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আসন লাভে সক্ষম হয়েছিলেন সুব্বামা

ডুভ্‌ভুরী। সৌভাগ্য বশত তিনি একজন ভাল গুরুর সন্ধান পেয়েছিলেন যিনি তাঁর কাদিমামা গ্রামেই খুব ঘনিষ্ঠ লোক ছিলেন, নাম তিরুপতি শাস্ত্রী। তিরুপতি শাস্ত্রী ছিলেন অন্ধ্রের কবিদের মধ্যে একজন জনপ্রিয় এবং খ্যাতনামা কবি। ইনি সুব্বামাকে রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন: বলতে গেলে তাঁর হাতেই সুব্বামার হাতে খড়ি হয়। তিরুপতি শাস্ত্রী পড়াশুনার সংগে সংগে তাঁকে রামায়ণ থেকে গান গাইতে শেখাতেন। অতীত দিনের পৌরাণিক পদ্যগুলিকেও সুব্বামা শিখেছিলেন তিরুপতির সাহায্যেই। ধীরে ধীরে তাঁকে জনবক্তা তৈরী করতে থাকেন তিরুপতি শাস্ত্রী।

রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবার যাঁদের প্রভাব তাঁকে প্রভাবিত করেছিল তাঁরা হলেন, সর্ব প্রথম নামের অধিকারী তিরুপতি ভেংকট শাস্ত্রী, এরপর গান্ধীজী। জাতির জন্য গান্ধীজীর যে আহ্বান ছিল তা তাঁকে রাজনৈতিক কর্মধারার মধ্যে টেনে নিয়ে আসে। 'মানুষের সেবাই মানে ভগবানের সেবা'—এ অনুভূতি তাঁর মনে এলো। এরই পাশাপাশি বুলুসু শ্যামবামূর্তির দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত এবং উৎসাহী হন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করলেন এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সংগ্রাম আন্দোলনের ময়দানের কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যান। লবণ সত্যাগ্রহ এবং ভারত ছাড় আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই তিনটি বিশাল কর্ম ধারাতেই (অসহযোগ, লবণ সত্যাগ্রহ, ভারত-ছাড় আন্দোলন) সমগ্র অন্ধ্রঅঞ্চলে, বিশেষ করে সারকার জেলায় তাঁর কর্মধারার প্রভাব পড়েছিল। এই সমস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করে শত শত বক্তৃতা করেন; তাঁর সংগে সর্বক্ষণের আন্দোলনের যে সকল সহকর্মীরা ছিলেন তাঁরা হলেন কানাকাম্মা; উন্নাভা লক্ষ্মীবায়াম্মা প্রমুখ।

ব্রিটিশ রাষ্ট্রশাসনের প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁর কণ্ঠ যেভাবে সোচ্চার হয়েছিল, সে প্রতিবাদের ভাষা এবং প্রতিটি অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের বিশেষ করে তাঁর কর্মধারা প্রবাহিত অঞ্চলগুলিতে; তাঁর প্রদেয় বক্তব্য জনসাধারণের মনে ব্রিটিশের প্রতি বিদ্বেষ এবং বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়েছিল ভীষণ ভাবেই। তাঁর এই সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনি একদিকে যেমন অনেক রাজনৈতিক কর্মীকে জড়ো করতে পেরেছিল,

অগণিত মানুষকে স্বাধীনতার কথা ভাবতে সাহায্য করেছিল ; তেমনি অন্যদিকে এর জন্য তাঁকে পুলিসের হাতে লাঞ্ছনা ও সহ্য করতে হয়েছিল অনেক। ১৯২১ সালে নেলোরে তিনি যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাঁর জন্য তাঁকে একবছরের জন্য কারাবরণ করতে হয়েছিল।

১৯৩১ সালে ১০-ই মে, সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পেড়াপুরমের মিশন স্কুলের তিন হাজার জন বালককে একসংগে জড়ো করলে, তাঁকে আবার একবছরের জন্য কারাবরণ করতে হয়। ভরত ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবার জন্যও তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছিল, মেয়াদ ছিল এক বছর। কংগ্রেস আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবার সংগে সংগে সুব্বামা ১৯২২ সালে মহিলাদের প্রাদেশিক কংগ্রেস শাখা শুরু করেন। এই শাখার প্রথম সম্মেলন হয় কাকিনাড়াতে। এই সম্মেলনে তিনি তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে ছাড়াও মহিলাদের খদ্দর তৈরী করতে এবং বিদেশী বস্ত্র পরিত্যাগ করে দেশী বস্ত্র খদ্দর পরিধান করতে উৎসাহিত করেন। এই বছরেই অর্থাৎ ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে শহরে পাঁচটি তাঁত বসানো হোলো এবং বিনে পয়সায় চরকা বণ্টন করা হোলো। এ কাজে সুব্বামার উদ্যম ছিল অত্যন্ত আশাজনক। ১৯২৫ সালে ২৬-মে, পালিভেলাতে এই শাখায় দ্বিতীয় সম্মেলন হয় ; এই স্থানটি পূর্ব গোদাবরী জেলায়। এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সুব্বামা। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সংগে কমিটির সদস্যা হিসাবে তিনি একটানা চৌদ্দ বছর কাজ করে যান। এই সময়কাল ধরে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির (A.I.C.C.) সমস্ত সম্মেলন গুলিতে তিনি অংগ্রহণ করেছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের সম্মেলন গুলিতেও তাঁর অংশগ্রহণ থাকত। মাদ্রাজ থেকে অন্ধ্রকে আলাদা করবার দাবীর কার্যকরী রূপদানের জন্য গঠিত 'অন্ধ্র মহাসভা' নামক সংস্থাটির তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় সদস্য।

সমস্ত নারী কল্যাণ কাজে এবং জনসাধারণের কাজের মধ্যে নারীদের অংশগ্রহণ করবার ব্যাপারে তাঁর প্রভূত উদ্যম এবং প্রচেষ্টা ছিল। ১৯২৪ সালে তিনি স্ত্রীশিক্ষা প্রসার কল্পে 'সনাতন স্ত্রী বিদ্যালয়' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন ; এই বিদ্যালয়টি রাজমুন্দ্রি নামক স্থানে অবস্থিত। বিধবাদের শিক্ষাগ্রহণের জন্য এ বিদ্যালয়ে আসন সংরক্ষিত ছিল। জাতীয় শিক্ষা এবং কুটীর শিল্পের উন্নতির সপক্ষে তাঁর দৃঢ় মতামত সর্বদাই প্রকাশ পেয়েছে। গোদাবরীতে বন্যা হবার ফলে দুর্গত

মানুষজনের ত্রাণ কার্যের ব্যাপারে তাঁর অংশগ্রহণ ছিল সক্রিয় ভাবে।

বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতার মুখ দেখতে পেলো ; ভারত মাতা হলেন পরাধীনতার শৃংখলমুক্ত। স্বাধীনতার পর কিন্তু সুব্বামা আর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনকে ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি অবসর নিলেন। ১৯৬৪ সালের ২৯-শে মে পর্যন্ত ভারত সরকারের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক সংগ্রামের অংশীদার হিসাবে মাসিক একশত টাকা করে অবসর ভাতা পেয়েছিলেন ; এই বছরের এই দিনটিতেই তিনি ভারত ভূমির জাগতিক মায়ামুক্ত হয়ে এক অচেনা লোকে পাড়ি দিলেন, মৃত্যু তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করল। ১৯২৬ সালে গোদাবরী জেলার জনগণের কাছ যে পরিচয় ভূষিত হন তা হোলো, 'দেশ বান্ধবী' অর্থাৎ দেশের বন্ধু। তিনি ছিলেন কর্মজীবনে পরিশ্রমী, সুবক্তা, মার্জিত স্বভাবের। জাতিগত প্রথা, অস্পৃশ্যতা, নারী অধিকার প্রভৃতি সামাজিক সংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করবার জন্য তিনি সোচ্চার কণ্ঠে জনগণের কাছে তাঁর বক্তব্য পৌঁছে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং জনমত সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তারই পক্ষে। জনজীবনের কর্মধারায় তাঁকে সবসময়ই দেখা গিয়েছে সাহসিকতার সংগে, সহজ এবং স্পষ্টবাদিতার সংগে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে, যেখানে তিনি সাফল্যলাভ করেছেন সর্বদাই।

সুনীতি চৌধুরী (ঘোষ)

(১৯১৭—   )

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে কয়েকজন কিশোরীকে দেশ-মাতৃকার সম্মান বাঁচাবার জন্য জীবন দিতে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের শাস্তি বহন করে নিতে দেখা গিয়েছে, সুনীতি চৌধুরী ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সৈনিকদের তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত না করলে বোধ হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলার ইব্রাহিম গ্রামে এক হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯১৭ সালের ২২শে মে, সুনীতি চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা উমাচরণ চৌধুরী সরকারী দপ্তরের দায়িত্ব পূর্ণ পদে চাকুরী করতেন। মাতা সুরসুন্দরী দেবী ছিলেন একজন বিদুষী মহিলা; সুনীতির দৃঢ় চরিত্র গঠনে তাঁর সুগভীর প্রভাব ছিল। সুনীতি যখন কুমিল্লা গার্লস স্কুলের ছাত্রী, তখন তাঁর দুই বড় ভাই ছিলেন কলেজের ছাত্র। তাঁরা বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া জেলার এবং বাড়ীর রাজনৈতিক পরিবেশ তাঁর বিপ্লবী চেতনাকে বাড়িয়ে তুলেছিল। তদানীন্তন সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং কুমিল্লার বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল।

তাঁর সহপাঠী ছিলেন প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম; ইনি 'যুগান্তর' নামে বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। সুনীতির তেজস্বিতা প্রফুল্লকে আকৃষ্ট করেছিল এবং প্রফুল্লর চেষ্টাতেই সুনীতি 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩১ সালের প্রথমার্ধে কুমিল্লাতে একটি ছাত্র কনফারেন্স

অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ই কিশোরীদের নিয়ে একটি ছাত্রীসংঘ গড়ে ওঠে ; এদের ক্যাপ্টেন ছিলেন সুনীতি। ছাত্রীদের মধ্যে সুশৃঙ্খলা ও নিয়মানুগতা বজায় রাখবার ক্ষেত্রে সুনীতির পরিচালন দক্ষতা সেদিন সেই জেলার বহু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আকর্ষণ করেছিল।

কুমিল্লা জেলার কাছাকাছি পাহাড়ে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, বন্দুক ছোড়া, প্রভৃতি বিষয়ে গোপনে সুনীতি প্রশিক্ষণ নিতেন, খুব শীঘ্রই তিনি ও তাঁর সহপাঠিনী শান্তি ঘোষ পরস্পর সহযোগী হয়ে উঠলেন। শান্তি ও সুনীতি ক্রমশঃ বিপ্লবী কাজের শিক্ষায় পারদর্শিতা অর্জন করলেন। অবশেষে দলের নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শান্তি ও সুনীতির উপর গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হোলো। তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, শান্তি ও সুনীতি কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ষ্টিভেনকে গুলী করে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে চরম আঘাত হানবেন। একাজে সাহায্য করবার জন্য বিপ্লবী দলের কিছু কর্মী থাকবেন আত্মগোপন করে।

১৯৩১ সালের ১৪-ই ডিসেম্বর দিন নির্ধারিত হোলো, শান্তি ও সুনীতিকে নিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ী ঢুকলো জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠিতে। গাড়ী থেকে নেমে শান্তি ও সুনীতি চাপরাসীর হাতে ইন্টারভিউ কার্ড পাঠালেন। মিঃ ষ্টিভেন্স তখন তাঁর বাংলোতে একটা সুইমিং ক্লাবের পারমিশনের জন্য দরখাস্ত দেখছিলেন। কার্ড পেয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্স বেরিয়ে এলেন। দায়িত্ব পালনের সুযোগ সমাগত দেখে তাঁরা গুলি ছুঁড়লেন। সুনীতির প্রথম গুলীতেই ম্যাজিস্ট্রেটের প্রাণহীন দেহ ভূলুণ্ঠিত হোলো। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরটাতে চললো ছুটোছুটি দাপাদাপি এবং বিকট চীৎকার। সুনীতিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে দু'জন লোক জাপটে ধরেছে রিভালবারটা কেড়ে নিতে। চাপরাসীরা অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করতে লাগল, সঙ্গে কিল, চড়, লাথি ঘুষিও চলল নির্মম ভাবে এই দুই কিশোরীর উপর।

পুলিস লাইনের পাগলা ঘণ্টা বেজে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে পুলিস এসে সব ঘিরে ফেললো, শান্তি ও সুনীতির হাত পেছনে বেঁধে দিয়ে পুলিস তাঁদের বেদম প্রহার করতে লাগল। এমন সময় ডি. আই. বি. ইন্সপেক্টর এসে প্রহারের হাত থেকে উদ্ধার করে তাঁদের দু'জনকে দু'জায়গায় সরিয়ে দিল। জেরা চলল আলাদা আলাদাভাবে। কিন্তু গুপ্তকথা পুলিস কিছুতেই আদায় করতে পারেনি। এরপর তাঁদের নিয়ে যাওয়া হোলো কুমিল্লা জেলে। কয়েকদিন পরেই তাঁদের নিয়ে আসা হোলো

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। মামলা শুরু হোলো ১৯৩২ সালের ১৮-ই জানুয়ারী। শান্তি ও সুনীতি কিন্তু জেলে গিয়ে নিজেদের মানসিক বলকে এতটুকু নষ্ট হতে দেয়নি। মামলা চলবার সময় তাঁরা তাঁদের হাসি, উচ্ছ্বাস ও তেজস্বিতায় সমস্ত কোর্টকে মুগ্ধ করে রাখতেন। তাঁদের তেজস্বিতার একটা ছোট্ট অথচ দৃঢ় উদাহরণ রাখছি, মামলার দ্বিতীয় দিনে তাঁদের বসতে চেয়ার দেওয়া হয়নি দেখে তাঁরা পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং এই ঘটনার পর থেকে প্রতিদিন তাঁদের চেয়ার দেওয়া হোতো। নয়দিন মামলা চলবার পর, দশদিনের দিন অর্থাৎ ২৭-শে জানুয়ারী তাঁদের বিচার হোলো।

বিচারে দণ্ডাদেশ হিসাবে তাঁদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ বেড়িয়ে এলো। বিচারে যা রায় বেড়িয়ে এসেছিল তা তাঁদের কাছে আশানুরূপ হয়নি, এতে তাঁরা নিরাশা বোধই করছিলেন, কারণ তাঁদের আশা ছিল ফাঁসীর আদেশ হবে কিন্তু তাঁরা ছিলেন কিশোরী, সুনীতি ছিলেন চৌদ্দ বছরের এবং শান্তি পনেরো বছরের কিশোরী; তাই তাঁদের জন্য এ দণ্ডাদেশ সাব্যস্ত হয়েছিল। নিরাশ হলেও, এ দণ্ডাদেশ মেনে নিতে হোলো, তাঁরা দু'জনই সেদিন সাহসের সঙ্গে কাজী নজরুলের "কারার এ লৌহকপাট" গানটি উচ্চকণ্ঠে গাইতে গাইতে কারাগৃহে ঢুকলেন। এই দুই কিশোরীর সেদিনের সেই দেশ মাতৃকার প্রতি অসীম শ্রদ্ধার পরিচয় কারাগৃহের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

সুনীতিকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী করা হোলো। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী অবস্থায় বন্দীজীবনে তাঁর উপর নেমে এসেছিল অপমানকর অন্তহীন উৎপীড়ন। ওদিকে সুনীতিদের বাড়ীটাকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁদের পরিবারকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হোলো। তাঁর বাবার পেনসন বন্ধ করে দেওয়া হোলো। তাঁর দুই দাদাকে গ্রেপ্তার ও বন্দী করা হোলো। পিতা-মাতা ছোট ছোট সন্তানদের নিয়ে উপবাসের মুখে পড়ে গেলেন। আত্মীয়-স্বজনেরা সাহায্য করতে গেলে পুলিস তাঁদের উপরও নির্যাতন করতে লাগল। তাই তাঁরাও সাহায্য করা বন্ধ করে দিতে লাগলেন। আর্থিক সঙ্গতির চেষ্টা করতে গিয়ে সুনীতির ছোট ভাইকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হোতো, এর ফলে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অপুষ্টি তাঁকে ঘিরে ফেলতে লাগল এবং যক্ষ্মারোগে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হোলো।

এর উপর বাড়ীর চলছিল পুলিসের অত্যাচার। বাড়ীর এই নিদারুণ

দুঃখের কথা জেলে বসেই সুনীতি সবই জানলেন, কিন্তু দুঃখের বজ্রাঘাতে মাথা নত করবার মেয়ে তিনি নন। তাই ভারতের এই উজ্জ্বল রত্ন সেদিন তৃতীয় শ্রেণী কয়েদীরূপে বাংলার কারাগারে সকলের অজ্ঞাতে ভস্মে আচ্ছাদিত রইলেন। কারাপ্রাচীরের দুর্ভেদ্য লৌহ-কপাটে বন্দী এই কিশোরীকে সেদিন কাটিয়ে দিতে হয়েছিল কৈশোরের শেষ এবং যৌবনের বেশ কয়েকটি বছর। সাত-সাতটা শীত ও বসন্ত কেটে গেল। ১৯৩৯ সালে যখন গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হোলো, তখন তাঁদের সঙ্গে সুনীতিরাও মুক্তি পেলেন।

মুক্তির পর সুনীতিকে দাঁড়াতে হোলো এক ভয়াবহ সংগ্রামের মুখোমুখি ; সব কাটিয়েও উঠলেন তিনি। ম্যাট্রিক, আই. এস. সি., এম. বি. পাশ করলেন। ডাক্তার হয়ে দুস্থ ও পীড়িত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯৪৭ সালে শ্রমিকনেতা চব্বিশ পরগণার প্রদ্যোৎ কুমার ঘোষের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বর্তমানে যদিও তিনি এক কন্যা নিয়ে সুখে সংসারজীবন অতিবাহিত করছেন, কিন্তু তাঁর হৃদয়ের প্রতিটি কোষের অনুভূতি ছড়িয়ে আছে দেশের কোটি কোটি দরিদ্র ভারতবাসীর প্রতি, যাদের তিনি আজও সাধ্যমত সেবা করে যাচ্ছেন।

সরোজিনী নাইডু

(১৮৭৯—১৯৪৯)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল বিংশ শতাব্দীর একেবারে জন্মলগ্ন থেকে। মহাত্মাজীর নেতৃত্বে 'অসহযোগ আন্দোলনে' সেদিন সারা দিয়েছেন ভারতের অগণিত মানুষ; এ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিতেও এগিয়ে এসেছেন পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। ব্রিটিশ কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন শত শত নর-নারী। সেই সময় একদিন এক ভদ্রলোক ব্রিটিশ কারাগারে আবদ্ধ নর-নারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। বন্দী নারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সময় ভদ্রলোক জেল কর্তৃপক্ষের মহিলা প্রতিনিধিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আপনাদের জেলে দেখছি জগতের সবচেয়ে সুগন্ধি ফুল ফুটেছে", জেল কর্তৃপক্ষের সেই প্রতিনিধি তখন সামনের পুষ্পোদ্যানের দিকে চেয়ে ভদ্রলোককে বললেন, 'আপনি কোন্ ফুলটির কথা বলছেন'। ভদ্রলোক পুষ্পোদ্যান থেকে মুখ ফিরিয়ে বন্দিনী দুই নারীর দিকে অঙ্গুলী সংকেত করে উত্তর দিলেন, 'আমি এই ফুলগুলির কথা বলছি,' —বন্দী কারাগারে সেদিনের সেই পুষ্প দু'টির মধ্যে একজন হলেন সরোজিনী নাইডু।

ভারতের পুষ্পোদ্যানে যে ফুলের মরসুম লেগেছিল, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তারই মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ফুল। বাংলার এফুল কিন্তু বাংলার পুষ্পোদ্যানে ফোর্টেনি। ১৮৭৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী নিজাম রাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদ শহরে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়; মাতার নাম শ্রীমতী বরদাসুন্দরী দেবী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত প্রবাসী বাঙালী স্বদেশ থেকে বাইরে গিয়ে নিজের প্রতিভার বলে অন্যান্য প্রদেশে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁদের

মধ্যে অন্যতম। বাংলার বাইরে তাঁর প্রতিভার বিকাশ হয় বলে, তাঁর সম্বন্ধে বাঙালী বিশেষ কিছু জানে না, কিন্তু তাঁর ন্যায় প্রতিভা যুগ-বিরল।

কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য পিতা অঘোরনাথ শৈশব থেকেই সরোজিনীর জন্য একজন ইংরাজ ও একজন ফরাসী শিক্ষয়িত্রী রাখেন। বাড়ীতে উর্দুতেই কথা বলতে শেখেন সরোজিনী এবং বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় ভাগ হিসাবে ফারসী গ্রহণ করেন। বারো বছর বয়সে সরোজিনী বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই সময়েই তিনি ইংরাজী, ফরাসী, ফার্সী ও উর্দু সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হতে থাকেন এবং চৌদ্দ বছর বয়সের মধ্যেই সমস্ত ইংরেজ কবিদের কাব্য পড়ে শেষ করেন। ইংরেজ কবিগণের কাব্য এই কিশোরীর চিত্তে অভিনব কাব্য পিপাসা জাগিয়ে তোলে এবং সেই বয়স থেকেই সরোজিনী ইংরেজী কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন ; আজ ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে তাঁর আসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। ইংরেজী সাহিত্য কাব্যের ইতিহাস লিখতে হলে শেষ অধ্যায়ে এই বাঙালী মহিলার সৃষ্ট কাব্যের উল্লেখ করতেই হবে।

তাঁর আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে তিনি লেখেন, ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত কবি ও সমালোচক আর্থার সাইমনস্‌কে তিনি যে পত্র লেখেন, সেখানে বলেন, 'শৈশবে কবিতা লিখবার জন্য মনে বিশেষ প্রেরণা অনুভব করতাম বলে মনে হয় না। তবে আমি স্বভাবতই কল্পনাপ্রবণ। বাবা আমাকে আদর্শ বৈজ্ঞানিক করে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যে কবিত্বশক্তি আমি তাঁর ও মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলাম, তাই অন্তরে বিকশিত হয়ে উঠতে লাগল। এগারো বছর বয়সে একদিন বীজগণিতের একটি অঙ্ক নিয়ে ভাবতে ভাবতে দেখি একটা সম্পূর্ণ কবিতা লিখে ফেলেছি। সেইদিন থেকেই আমার কাব্যজীবনের শুরু হোলো।'

এই সময় তিনি ইংরেজী ভাষায় একটি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করেন। অঘোরনাথ কন্যার প্রথম সাহিত্যিক প্রচেষ্টা মুদ্রিত করেন। ১৮৯৫ সালে নিজামকে উক্ত পুস্তকের একখানি উপহার দেওয়া হয়। নিজামবাহাদুর এই কিশোরীর কাব্য-প্রতিভায় খুশী হয়ে তাঁকে যে কোনো পুরস্কার দিতে সম্মত হন ; সরোজিনী বিদেশ যাবার খরচ বহন করবার জন্য বৃত্তি পুরস্কার হিসাবে প্রার্থনা করেন। নিজামবাহাদুর এতে সম্মত হন এবং বার্ষিক তিনশত পাউণ্ডের বৃত্তি দিয়ে সরোজিনীকে সম্মানিত করেন।

১৮৯৫ সালে মাত্র ষোল বৎসর বয়সে সরোজিনী শিক্ষার্থিনী হয়ে একা বিলেত যাত্রা করলেন। ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তিনি ভারত-হিতৈষিনী বিখ্যাত মিস ম্যানিং-এর কর্তৃত্বাধীনে তাঁরই গৃহে থাকবার সুযোগ পেলেন। মিস ম্যানিং-এর গৃহে তদানীন্তন সময়ে বহু সাহিত্যিক আসতেন। এদের মধ্যে অনেকেই ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বলে পরিচিত ছিলেন ; কেউ কেউ আবার বিশিষ্ট না হলেও ভবিষ্যতে সাহিত্যের জগতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন।

এইখানেই বিখ্যাত সমালোচক এডমণ্ড গস্, নাট্য-সমালোচক উইলিয়াম আর্থার, বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক উইলিয়াম হাইন্‌ম্যান প্রভৃতি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সরোজিনীর ঘনিষ্ঠতা হয়। ষোড়শ বর্ষীয়া কিশোরী সরোজিনী ইংল্যাণ্ড যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেলেন না, কারণ আঠারো বছর পূর্ণ না হলে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র করা হোতো না। সুতরাং, যতদিন না বয়স পূর্ণ হোলো ততদিন পর্যন্ত তিনি লণ্ডনের কিংস কলেজে পড়তে লাগলেন। পরবর্তীসময়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেলেও সেখানে বেশীদিন তিনি পড়তে পারলেন না, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে তিনি চলতে পারলেন না। তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ল।

নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তিনি সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী ঘুরে বেড়িয়ে তিন বৎসর পরে স্বদেশে ফিরে এলেন ; স্বদেশে ফিরে কাব্যচর্চায় মনঃ-সংযোগ করলেন। পর পর তিনখানি কাব্যগ্রন্থ যথাক্রমে 'গোল্ডেন থ্রেস্‌হোল্ড' 'বার্ড অব্ টাইমস্', 'ব্রোকেন উইঙ্গস্'। এই কাব্য তিন-খানি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হোলে, কি প্রদেশে, কি বিদেশে, তাঁর কবি প্রতিভা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়। বিলেত থেকে ফিরে আসবার পরই সরোজিনী ডাক্তার মোতি আলা গোবিন্দরাজুলু নাইডুকে বিবাহ করেন। সাংসারিক জীবনে শ্রীমতী নাইডু ছিলেন মূর্তিময়ী কল্যাণী। তিনি ছিলেন, আদর্শ পত্নী এবং পুত্র কন্যা পালনে আদর্শ মাতা। সমস্ত সংসারকে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে সর্বদাই আনন্দমুখর করে রাখতেন।

কাব্য ও সাংসারিক জীবনের বাইরে শ্রীমতী নাইডুর ঘরে একটা বিশিষ্ট রূপ ছিল এবং সেইরূপেই তিনি আজ বিশ্ববিখ্যাত। মুক্তি কামী কোটী কোটী ভারতবাসীর নিকট আজ তিনি মূর্তিময়ী শক্তি, শৈশবের সমস্ত সুখভোগ, যৌবনের সমস্ত কবি কল্পনা ত্যাগ করে

তিনি বাস্তব জগতের সমস্ত ক্রুরতা ও বীভৎসতার মধ্যে বীর নারীর মত নেমে এসেছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর উপযুক্ত শিষ্যরূপে। কবির বীণায় একদিন ভারতের নারীসম্বন্ধে যে স্বপ্ন-রূপ জেগে উঠেছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজীর উদ্দীপনার জোয়ারে আত্মোৎসর্গ করে তা বাস্তবে সার্থক করে তুললেন।

সরোজিনীকে দেশপ্রেমে সাক্ষাৎ ভাবে প্রথম উদ্বুদ্ধ করেন ভারতখ্যাত মহাত্মা গোখলে। সরোজিনীর অন্তরের পরিচয় পেয়ে তিনি একদিন অন্তরের সমস্ত আবেগ দিয়ে তাঁকে বললেন—"আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে, এই আকাশের নক্ষত্ররাজিকে ও অদূরে ঐ পর্বতশ্রেণীকে সাক্ষী রেখে, হে কবি, তোমার শক্তি সামর্থ্য, সঙ্গীত, বচন, তোমার চিন্তা, তোমার স্বপ্ন দেশমাতার চরণে উৎসর্গ কর। হে কবি, কল্পনার সুমেরু শিখরে আরোহণ করে যে স্বপ্ন দেখেছ, আজ তার বার্তা সকলের কাছে, সর্বসাধারণের কাছে, পেঁছে দিও।"—আকাশের নক্ষত্র সাক্ষী, সাক্ষী হিমালয়, গোখলের সেই আহ্বান সরোজিনী বর্ণে বর্ণে জীবনে সত্য করে তুলেছিলেন। যে চিত্ত গোখলের মন্ত্রে অনুরণিত হয়েছিল, মহাত্মা গান্ধীর দীক্ষায় তা সার্থক রূপ পেয়েছে।

সরোজিনী যখন দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন, তখন নানাদিক দিয়ে সাংগঠনিক কাজের বহু অসম্পূর্ণতা ও বাধা ছিল। হিন্দু ও মুসলমানে তখন নিত্য বিরোধ, যেটুকু শক্তি কংগ্রেস আয়ত্ত করতে পেরেছিল, তাও মডারেট ও একষ্ট্রিমিষ্ট দুইদলের সংঘর্ষে পঙ্গু হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। যে সমস্ত মানুষের অক্লান্ত চেষ্টা ও সাধনার ফলে জাতীয় আন্দোলন একটা বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই তখন সত্যিকারের পথ খুঁজে পায়নি। তবে তাঁরা অনেকেই তখন ভারতের মুক্তির সত্যিকারের পথ অন্বেষণে ব্যাপৃত ছিলেন। সরোজিনীও এই দলের সঙ্গে এসে যুক্ত হলেন।

১৯১৩ সালের ২২-শে মার্চ লক্ষ্মৌ শহরে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের চেষ্টায় মুসলিম লীগের বিখ্যাত অধিবেশন হয়; এই অধিবেশনে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের যে চুক্তি হয়, তাই লক্ষ্মৌ প্যাক্ট নামে খ্যাত। এই সভায় সরোজিনী নাইডু সর্বপ্রথম প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা প্রদান করবার অধিকার পান। ১৯১৬ সালে লক্ষ্মৌতে স্যার এস. পি. সিংহের সভানেতৃত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, সেখানে তিনি সর্বপ্রথম স্বরাজ প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। ১৯১৭ সালে কলকাতায় শ্রীমতী

অ্যানী বেশান্তের সভানেতৃত্বে যে কংগ্রেস অধিবেশন হয় সেখানে তিনি এক ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন। এর পর থেকেই সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে নারী অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান ; তাঁর বক্তৃতার অসামান্য নৈপুণ্যের কথা ভারতের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

১৯১৮ সালের মে মাসে তিনি মাদ্রাজের কাঞ্জিভরমে যে মাদ্রাজ প্রাদেশিক সম্মিলনী হয়, তার সভাপতি নির্বাচিত হন। বস্তুতঃ ১৯১৫ সাল থেকেই সরোজিনী সক্রিয়ভাবে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৯ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয় ; ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এই আন্দোলনের জোয়ার তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল। মহাত্মাজীর অহিংস-অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সরোজিনী সেদিন ছায়ার মতো তাঁকে অনুসরণ করেন এবং আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেন।

নারীদের ভোটাধিকারের পক্ষে তাঁর ছিল অবিরত সংগ্রাম। নিখিল ভারত নারী সমাজের প্রতিনিধিরূপে তিনি ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগুর কাছে দাবী জানান, ১৯১৯ সালে অল ইণ্ডিয়া হোমরুল লীগ-এর পক্ষ থেকে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কমিটিতে দেশের জন্য আবেদন পেশ করতে যান। শরীর ভেঙে পড়ার জন্য ১৯২০ সালের প্রথম দিকে তিনি ইংল্যাণ্ডে যান এবং সেখানে পাঞ্জাবের অমানুষিক অত্যাচারের বর্ণনা করে বক্তৃতা দেবার জন্য ভারতসচিব তাঁকে তাঁর বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করতে বলায় সরোজিনী কংগ্রেসের সংগৃহীত রিপোর্ট থেকে তাঁর বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করেন। মালাবারের মোপেলা বিদ্রোহ নিয়ে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাঁর বহু বাদানুবাদ হয়। ১৯২২ সালে মাহাত্মা গান্ধী যখন কারারুদ্ধ হন, তখন শ্রীমতী সরোজিনী দ্বিগুণ উদ্যমে সারা ভারতবর্ষে মহাত্মাজীর বাণী প্রচার করে বেড়ান।

কেনিয়াতে শ্বেতাঙ্গদের অমানুষিক অত্যাচারে ভারতবাসীর দুর্দশার প্রতিকারার্থে তিনি ১৯২৪ সালে সুদূর আফ্রিকা যাত্রা করেন। সেখানে তাঁর অসামান্য বাগ্মিতা ও উৎসাহের ফলে প্রবাসী ভারতবাসীদের দুঃখের অনেক লাঘব হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টর অব লিটারেচার' উপাধি প্রদান করতে চান, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে তিনি এ উপাধি গ্রহণ করেন নি। ১৯২৯ সালে তিনি বোম্বাই কংগ্রেস

কমিটির প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন; ১৯২৬ সালে তিনি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার সভাপতিত্বের মহাগৌরব অর্জন করেন। সরোজিনী যখন ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন তখন হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষে ভারতের আকাশ আচ্ছন্ন। তাই হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধনাকে তিনি সেদিন থেকেই তাঁর ব্রত বলে গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী জীবনে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বাণী দ্বারা এই কাজকে অনেকখানি সফল করে তুলে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

মহাত্মা গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে উপযুক্ত শিষ্যার মতো তিনি মৃত্যুকে উপেক্ষা করে তাঁর নির্দেশ পালন করেন। দিনের পর দিন অর্ধাহারে, অনাহারে, পথে-প্রান্তরে পুলিশের গুলীর সম্মুখে হাসিমুখে তিনি সত্যাগ্রহীদের পরিচালকের গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন, এই অপরাধে ব্রিটিশের কারাগারে তাঁকে আবদ্ধ হতে হয়। কংগ্রেসের সভাপতিরূপে শ্রীমতী নাইডু বলেন, "আমি আশা করি, নির্বাসিতা সীতা বা যমানুসারিণী সাবিত্রী যে শক্তিবলে অরণ্যে বা যমালয়েও নিশ্চিন্তভাবে যমরাজের সম্মুখীন হতে পশ্চাৎপদ হন নি, সেই শক্তির কণামাত্রও যদি পেয়ে থাকি তবে আজ আপনাদের আরোপিত কর্তব্যের গুরুভার বহন করতে পারব।"

১৯২২ সালে গান্ধীজীর শিষ্যারূপেই তিনি খদ্দর বস্ত্রের সপক্ষে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। কোকোনাড়ার কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি বেঙ্গল প্যাক্ট-এর পক্ষে বক্তব্য রাখেন এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে তিনি স্বরাজের ব্যাখ্যা করেন। ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৬ সাল এই সময়ের মধ্যে তিনি দু'বার দক্ষিণ আফ্রিকা যান। ১৯২৮ সালে তিনি গান্ধীজীর প্রতিনিধি হয়ে ইউ. এস. যান। ১৯২৯ সালে পূর্ব আফ্রিকার মোবাসাতে তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকাতে পরিভ্রমণ করেন এবং বক্তব্য রাখেন। আরুয়িন প্রস্তাবের প্রথম বৈঠকের সময় তিনি ভারতে ফিরে আসেন। গান্ধী-আরুয়িন চুক্তির পূর্বে এই বৈঠকে সরোজিনী, মতিলাল নেহেরু, জিন্না, গান্ধীজী এবং প্যাটেল আরুয়িনের সঙ্গে সাক্ষাতে মিলিত হন, তাঁদের দাবী আলোচনার জন্য। এর পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হয়েছিল পুরোপুরি বিপ্লবী আকারে, জাতীয় আন্দোলনের রূপ নিয়ে। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতালাভের পূর্ব সময় পর্যন্ত স্বাধীনতাসংগ্রাম চলতে থাকে।

লবণ সত্যাগ্রহে সরোজিনীর ছিল সক্রিয় অংশগ্রহণে, মহিলা-যুবকদের এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাবার জন্য তিনি নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে লণ্ডনের বৈঠকে তাঁর অংশগ্রহণ ছিল এবং দিল্লী যাবার পথে তিনি গ্রেপ্তার হন, তিনি তখন ছিলেন কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি। ১৯৪০ সালে জাতীয়-সপ্তাহ পালনের সময় তিনি কংগ্রেসকর্মীদের সঙ্গে আন্দোলন সংগঠিত করবার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪২ সালে বোম্বাইতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ভারত-ছাড় আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণের সময় তাঁকে পুনরায় কারাবরণ করতে হয়। আগা খান প্যালেসে গন্ধীজীর অনশন, কস্তুরবা এবং মহাদেব দেশাইয়ের মৃত্যুর সময় সরোজিনী সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর অদম্য সাহস ও নৈতিকতা দিয়ে তিনি এই সময়ের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

স্বাধীনতা এলো সম্মানের সঙ্গে, কিন্তু সঙ্গে এলো দেশবিভাগের বেদনা। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের যে স্বপ্ন সরোজিনী দেখেছিলেন তার বাস্তবরূপ দেওয়া আর সম্ভব হোলো না, অত্যন্ত মর্মাহত হলেন তিনি। ঠিক এর পরবর্তী যে বেদনাকে তাঁর গ্রহণ করতে হোলো তা এলো একটা ঝড়ের মতো, তা হোলো ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অভিভাবক ও পথপ্রদর্শক গান্ধীজীর আকস্মিক মৃত্যু। তিনিই স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে বড় রাজ্যের প্রথম মহিলা গভর্ণর হন, এ সময় কাজ করাকালীন জনজীবনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে তাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি।

১৯৪৯ সালের ২রা মার্চ সত্তর বছর বয়সে লক্ষ্ণৌতে নিজের কর্মস্থলে কর্মরত অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচেয়ে সেরা ফুলটি সেদিন শুকিয়ে ঝড়ে পড়ল ভারতের মাটিতে।

সত্যবতী দেবী (বেন)

(১৯০৬—১৯৪৫)

বেন সত্যবতী দেবী ছিলেন লালা ধনীরামজীর প্রথম কন্যা। তাঁর মাতা ছিলেন ভেদকুমারীজী। ১৯০৬ সালের ২৬-শে জানুয়ারী পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলায় টালওয়ান গ্রামে সত্যবতী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের বাড়ীর পরিবেশের মধ্যে আর্য সমাজের প্রভাব ছিল। তাঁর মাতা ছিলেন একজন সুপরিচিত সমাজসেবী এবং গান্ধীজীর অনুসরণকারী। তাঁর পিতা ছিলেন আইন ব্যবসায়ী; তিনি লাহোর এবং সিমলাতে তাঁর ব্যবসা চালাতেন। উত্তর ভারতের বিখ্যাত আর্যসমাজের অনুগ্রাহী এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব স্বামী সারদানন্দ ছিলেন সত্যবতী দেবীর দাদু অর্থাৎ বাবার বাবা। শৈশবে পড়াশুনা করবার সুযোগও তিনি পেয়েছিলেন; পাঞ্জাব বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে তিান ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯২২ সালে তাঁর মাতা ভেদ কুমারীজী বালভদ্র বিদ্যালংকারের সঙ্গে সত্যবতীর বিবাহ ঠিক করেন; এটা ছিল অসবর্ণ বিবাহ। সম্পূর্ণ আরম্ভরহীন অবস্থায় খদ্দরের পোষাক পরিধান পূর্বক এ-বিবাহ হয়, খদ্দরের পোষাক পরিধান করে বিয়ের কনে সত্যবতী শশুরালয় গেলেন। বিবাহের পূর্ব থেকেই সত্যবতী রাজনৈতিক কার্যকলাপের সংগে যুক্ত হতে থাকেন। দিল্লীর কংগ্রেস মহলে যে সমস্ত কংগ্রেস নেতৃত্বর সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাঁরা হলেন,—ফরিদুল হক্ আনসারী, সি. কে. নায়ার ব্রজকিশোর চণ্ডীওয়ালা, যুগলকিশোর খান্না, এস. এ. কিড ওয়াই এবং ডঃ বি. ভি. কেশবার প্রমুখ। এছাড়া, তিনি তাঁর সময়ে মার্ক্সীয় চিন্তাধারার উপর বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভগবতী-চরণ, ভগৎ সিং এবং অন্যান্য বেশ কয়েকজন নেতৃত্বর সংগেও তিনি ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। মহিলা নেতৃত্বদের মধ্যে যাঁদের সংগে তিনি কাজ করেছেন তাঁরা হলেন বন দুর্গাদেবী এবং কৌশল্যা দেবী।

রাজনৈতিক কর্মধারায় পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ; অতিরিক্ত পরিশ্রম, ময়লা বস্তী এবং মহলা অনবরত পরিদর্শনের জন্য তিনি যথা রোগে আক্রান্ত হন। এমনও দিন গিয়েছে সারা দিনরাত তিনি নোংরা বস্তীতে থেকে আহার-নিদ্রা ভুলে গিয়ে কাজ করেছেন. মার্কসীয় চিন্তাধারায় প্রভাবিত হবার ফলে মনে-প্রাণে তিনি কমিউনিস্ট হয়ে গিয়েছিলেন, সেই কারণেই যখন গান্ধীজী তাঁকে 'রাম' নাম উচ্চারণ করতে বলেছিলেন, তখন তিনি আপত্তি জানান। তিনি কখনো বিদেশে যান নি, সেই কারণে তাঁর বিদেশী বন্ধু অথবা পরামর্শ দাতা কেহ ছিল না। ধর্ম যখন প্রকট রূপ নিয়ে, অতিরিক্ত কুসংস্কারের বোঝা মাথায় নিয়ে আসে তখন তা হয় সমাজের অভিশাপ, এবং এই ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের প্রতিই ছিল তাঁর তীব্র প্রতিবাদ ; সারাজীবন ধরে তিনি ধর্মীয় কুপ্রথাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গিয়েছেন, এর উচ্ছেদ কল্পে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং স্বদেশী শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর কোনো সুস্পষ্ট মতামত জানা সম্ভব হয় নি, কারণ এ ব্যাপারে তিনি কখনই মতামত দেননি। শ্রমিক এবং কৃষকরাজই ছিল তাঁর চিন্তা রাজ্যের সঙ্গী। ১৯৩৬ সালে রাজার রাজ্যাভিষেকের বয়কটের ব্যাপারে সর্বভারতীয় কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টি সম্মেলনে যে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল, যেখানে ছিল তাঁর সক্রিয় সমর্থন এবং অংশগ্রহণ। তিনি ছিলেন একজন সমাজতন্ত্রের বিদগ্ধ সমর্থক ; সেই কারণেই ভারতে গণতন্ত্র এবং শান্তির মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হোক তা তিনি চাইতেন। তিনি সব সময়ই শ্রমিকদের পাশে থেকে কাজ করেছেন, শ্রমিক আন্দোলনের ইতি-হাসে তিনিই প্রথম মহিলা যিনি দিল্লীর বিড়লা মিলের ধর্মঘটে শ্রমিকদের সংগঠিত করেছিলেন ; এই ধর্মঘটের সময় তাঁর স্বামী এই মিলের সঙ্গেই একটি লাভজনক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গ্রামীণ মৃতপ্রায় শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য তাঁর প্রভুত প্রচেষ্টা ছিল। তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা।

লাহোরের জেলে বন্দী থাকাকালীন তাঁর কারাবাসের শেষের দিকে তিনি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন ; এই কারণেই তাঁকে কারামুক্ত করা হয় এবং দিল্লীর টি. বি. হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই ১৯৪৫ সালে অক্টোবর মাসে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। গান্ধীজী তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'তুফানী বেহেন'। যে স্বাধীনতার জন্য তিনি

জীবন উৎসর্গ করেছিলেন যে স্বাধীনতা দেখে যাবার সম্ভাবনার পূর্বেই তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল, তাই স্বাধীনতার উজ্জ্বল ভোরের আলো প্রত্যক্ষ করা তাঁর হোলো না।

ভারতের সমস্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামী মহিলাদের এবং সমাজ সংস্কারক মহিলাদের মধ্যে সত্যবতী বেনের নাম ভারতবাসীর স্মরণে উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করবে একজন স্মরণীয় অমর মহিয়সী হিসাবে।

সারদা বেন মেহতা

(১৮৮২—১৯৭০)

গুজরাট প্রদেশের একজন সামাজিক এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের নাম করা যেতে পারে যিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো গুজরাট প্রদেশকে আলোকিত করে রেখেছিলেন। তাঁর নাম ডঃ সুমন্ত মেহতা। এই সুমন্ত মেহতাকে গুজরাট তার একান্ত আপনার বলে মনে করে। একাধারে সমাজ-সংস্কারক এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব হিসাবে আমরা তাঁকে দেখব এবং একই সঙ্গে তাঁর স্ত্রীকে দেখতে পাবো ঠিক একই ভূমিকায়। এই গুজরাট দম্পতিকে শুধুমাত্র গুজরাট প্রদেশ নয়, সমগ্র ভারতবাসীর মনে রাখবার প্রয়োজনীয়তা আছে। বর্তমানে আমরা যাঁকে নিয়ে আলোচনা করব, তিনি হলেন ডঃ সুমন্ত মেহতার সহধর্মিণী সারদা বেন মেহতা, যিনি গুজরাটের মানুষদের সঙ্গে সমগ্র ভারতবাসীর কাছে নিজেকে স্মরণীয় করে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ১৮৮২ সালে গুজরাটের এক সমাজ-সংস্কারক পরিবারে সারদা বেনের জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন গোপীলাল মনিলাল ধ্রুব এবং মাতা বালা বেন। তিনি ছিলেন গুজরাটের প্রার্থনাসমাজ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ভোলানাথ সারাভাই ডিভেটিয়ার নাতনী। বিদ্যা বেন, যিনি পরবর্তী সময়ে ভারতবাসীর কাছে পরিচিত হয়েছিলেন বিদ্যাগৌরী নীলকান্ত নামে, তিনি ছিলেন সারদা বেনের বড় বোন।

সারদা বেনের শৈশবের শিক্ষা গ্রহণের কাজ হয় আমেদাবাদে। ১৮৯৭ সালে ডিসেম্বর মাসে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; ১৯০১ সালে নভেম্বর মাসে, আমেদাবাদ কলেজ থেকে তর্কবিদ্যা এবং নৈতিক দর্শন বিষয় নিয়ে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি এবং তাঁর বড় বোন বিদ্যা বেন, দু'জনেই ছিলেন গুজরাট রাজ্যে প্রথম মহিলা-গ্রাজুয়েট। জীবনের চলার পথে সারদা বেনের উপর যাঁদের প্রভাব পড়েছিল এবং

যাঁদের দ্বারা তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন, তাঁরা হলেন তাঁর মাতা বালা বেন এবং জামাইবাবু রমণভাই নীলকান্ত। এঁরা তাঁকে ধর্মীয় চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতে এবং সংস্কৃত শিখতে সাহায্য করেন। ১৮৯৮ সালে, অবশ্য বিবাহের পর, সারদা বেন তাঁর স্বামীর দ্বারাও যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁরা দম্পতিরূপে দু'জন ছিলেন আদর্শ দম্পতি। কুমুদ প্রসন্ন বাবু তাঁদের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেন তাঁরা সত্যই এক আদর্শ দম্পতি, "a visit to whom was something like a pilgrimage."

এ ছাড়া জীবনের চলার পথে তিনি যেসকল বিশিষ্ট গ্রন্থ এবং ব্যক্তির মতামত এবং সাহচর্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা হোলো, —হিন্দুশাস্ত্র, শ্রীঅরবিন্দের দর্শন এবং চিন্তাধারার সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য, পণ্ডিত সুখলালজীর লেখা এবং ব্যক্তি হিসাবে এম. জি. রাণাডে ও ডঃ এস. রাধাকৃষ্ণন। বাইবেল, কোরান এবং ইংরেজী সাহিত্যের কাছ থেকেও তিনি তাঁর চিন্তাশক্তির প্রসার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯২১ সাল থেকে তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে ও জনগণের জীবনের সঙ্গে নিজেকে এক করে দেবার জন্য সমাজসেবামূলক কাজে নেমে পড়লেন। ভারতবর্ষের এক বড় সংখ্যক মহিলা ছিল তখন অশিক্ষার অন্ধকারে; এদেরকে শিক্ষায় আলোকিত করবার কাজে তিনি নেমে পড়লেন। সঙ্গে সামাজিক কুসংস্কারগ্রস্ত জাতিপ্রথা, অস্পৃশ্যতা সমূলে উৎপাটন করা এবং সর্বোপরি দেশমাতার স্বাধীনতার আন্দোলনের কাজে অংশগ্রহণ করা—এ সমস্ত কাজই তিনি করে যেতে লাগলেন। এমন কি গোঁড়া সমাজের প্রচণ্ড বাধাকে উপেক্ষা করে বহু হিন্দু বাল-বিধবা মেয়েদের নিয়ে তাদেরকে শিক্ষা প্রদান করা এবং পুনরায় বিবাহ দেওয়া প্রভৃতি দুঃসাহসিক কাজগুলিও তিনি করতে লাগলেন। যদিও তিনি ছিলেন ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্মাবলম্বী, কিন্তু কোনো রকম ধর্মীয় গোঁড়ামি বা সংকীর্ণ মানসিকতাকে তিনি মনে-প্রাণে কখনও প্রশ্রয় দেন নি। যদিও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তাঁর কোনো বিরূপ মনোভাব ছিল না, কিন্তু ভারতীয় অবস্থায় শিক্ষাক্ষেত্রে দেশীয় শিক্ষা প্রসারের একান্ত প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করতেন।

তিনি ছিলেন গান্ধীজীর অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের একজন অংশগ্রহণকারী, কিন্তু যুব বিপ্লবীদের প্রতিও তাঁর যথেষ্ঠ সহানুভূতি ছিল। তিনি চেয়েছিলেন ভারতে পার্লামেণ্টারী সরকার গঠিত হোক,

সেই কারণেই দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর এই চিন্তাধারার বিস্তারলাভ ঘটাবার জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে গুজরাটী পত্র-পত্রিকাতে এ সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখেছেন। ১৯০৬ সালের পর থেকে তিনি পুরোপুরি স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন এবং খদ্দর পরিধান করা শুরু করলেন। ১৯১৭ সালে সারদা বেন জোর পূর্বক শ্রমআদায়ের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করলেন যে আন্দোলনটি 'গীরমিটিয়া' (Girmitia) ব্যবস্থা নামে পরিচিতিলাভ করেছিল। ১৯১৯ সালে, গান্ধীজীর জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নবজীবন'-এর সম্পাদনার কাজে ইন্দুলাল যাজ্ঞিকের সহযোগী হিসাবে কাজ করেনি।

১৯২৮ সালে গুজরাট কৃষক সম্মেলনে (Gujarat Farmer's Conference) হয় আমেদাবাদে ; এই সম্মেলনে তিনি স্বামীর পাশে থেকে একই সঙ্গে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হিসাবে কাজ করেন। এই একই বছরে সুরাটে বোম্বের গভর্ণরের কাছে বরদোলি সত্যাগ্রহ অনশন করা হয়, এই সময় তিনিও অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৯ সালে আমেদাবাদের মিলের শ্রমিকদের অবস্থা বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে যে ওয়াইলে কমিশন বসানো হয়েছিল, সেখানেও তাঁর প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছিল। ১৯৩০ সালে মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের দোকানগুলির সামনে যে পিকেটিং হয়, সেখানেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। এই বছরেই অর্থাৎ ১৯৩০ সালে তিনি আমেদাবাদে একটি খাদি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমেদাবাদের কাছে শেরথাতে তাঁর স্বামীর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের দেখাশোনা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

১৯৩৪ সালে অগ্রণী প্রচেষ্টা হিসাবে তিনি 'আপনা ঘরণী দুকান' নামে একটি সমবায় বিপণী শুরু করেন। 'বরোদা প্রজা-মণ্ডল' এবং এছাড়াও আমেদাবাদে ও বোম্বাইয়ে কিছু মহিলা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংগে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তিনি আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যা ছিলেন। মহিলা কল্যাণের জন্য তিনি ১৯৩৪ সালে আমেদাবাদে 'জ্যোতি সংঘ' নামে একটি মহিলা সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান খোলেন। সাহিত্য-কর্মেও তাঁর অবদান উল্লেখ করবার মত। তিনি গুজরাটী ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন,—এগুলি হোলো,—পুরোনো নিবালবোধভার্তা সংগ্রহ (১৯০৬ সালে), ফ্লোরেন্স নাইটিংগল নু জীবন-চরিত্র (১৯০৬ সালে), গৃহ ব্যবস্থা শাস্ত্র (১৯২০ সালে), 'বালক নু গৃহশিক্ষণ' (১৯২২ সালে) এবং 'জীবন

সম্ভন'' (১৯২৯ সালে)। তিনি কয়েকটি পুস্তকের গুজরাটী অনুবাদও করেছেন,—১৯১০-১১ সালে রমেশচন্দ্র দত্তের 'লেক অব পামস্'-এর গুজরাটী নাম 'শুধাহাসিনি'। ১৯১০-১১ সালেই মহারাণী চিমনাবাঈ গাইকোয়াডের 'দি পজিশন অব্ ইণ্ডিয়ান ওম্যানের'-এর গুজরাটী অনুবাদে নামকরণ করেন হিন্দু সমাজ ম্যান স্ত্রী নু স্থান্।

১৯৭০ সালের ১৩ই নভেম্বর ৮৮ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শান্তি ঘোষ (দাস)

(১৯১৬—   )

স্বামী-বিবেকানন্দ একসময় ভারতের যুবশক্তিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন "ভুলিও না, জন্মগত অধিকারে তোমরা মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত," তাঁর এ আহ্বান ভারতে যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর ভগিনীর-নাতনী শান্তি ঘোষকেও আকর্ষণ করেছিল এ-আহ্বানের বাণী। তাই শান্তি তাঁর সুললিত কণ্ঠে গেয়েছিলেন ভারত মাতার গান; অনুভব করেছিলেন শৃঙ্খলিত ভারতমাতার মুক্তি। তখন তিনি কিশোরী।

১৯১৬ সালে ২২-শে নভেম্বর শান্তি ঘোষ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন কুমিল্লা কলেজের অধ্যাপক, দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ। তিনি ছিলেন একজন রাজনৈতিক কর্মী ও আদর্শবাদী। পিতার এই দেশপ্রেমিকতা শান্তিকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল, ছেলে বেলা থেকেই। তিনি নিজেই শান্তিকে স্বদেশী গান শেখাতেন। একবার সরোজিনী নাইডু কুমিল্লায় একটি সভায় বক্তৃতা দেন: সেই সভায় শান্তি গাইলেন দেশপ্রেমের দেশমুক্তির গান। সভা থেকে ফিরে এসে শান্তি যখন বাবার কাছে এলেন, বাবা বললেন, "আজ তুমি যাঁর সভায় গান গাইলে, তাঁর মতো বড়ো হবার চেষ্টা করো।"

এছাড়া, শান্তি তাঁর জীবনে বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যাক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন যাঁরা তাঁর জীবনকে উজ্জ্বল পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন। শান্তি ঘোষ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, বিখ্যাত বিপ্লবী বিমল-প্রতিভা দেবী বলেছেন, "শান্তি তুমি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠের মতো হও"।—

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র তাঁকে বলেছেন, "নারী জাতির সম্মান রক্ষা কর; দেশ মাতৃকার জন্য নিজে অস্ত্র হাতে তুলে নাও"—। এ সমস্ত আশীর্বাদ তাঁর জীবনের পথকে আলোকিত করবার জন্য সাহায্য

করেছে।

১৯২৬ সালে শান্তির পিতার অকাল মৃত্যু হয়। ১৯২৮ সালে কুমিল্লার বাতাসে ধ্বনিত হতে থাকে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভের ধ্বনি। এ ধ্বনি শান্তির অন্তরকেও নাড়া দিয়েছিল গভীর-ভাবে। তাঁর মনেও জেগে উঠল তীব্র বিক্ষোভ। এইসময় তিনি ছিলেন কুমিল্লার ফৈজন্নেসা গার্লস স্কুলের ছাত্রী। সহপাঠী ছিলেন 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের সভ্য প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম। তাঁর প্রচেষ্টায় শান্তি 'যুগান্তর' দলে যুক্ত হলেন। এখানে বিপ্লবী কাজের জন্য লাঠি, ছোরা, খেলা, রিভলভার ছোঁড়া প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হোতো ময়নামতী পাহাড়ে। শান্তিও এ সমস্ত প্রশিক্ষণ নিতে লাগলেন নিষ্ঠার সঙ্গে।

দেশমাতৃকার জন্য কিশোরী জীবন উৎসর্গ করবার দিনের অপেক্ষায় ছিলেন শান্তি—শীঘ্রই সেদিন এলো। শান্তিও প্রস্তুত। ১৯৩১ সালের ১৪-ই ডিসেম্বর কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে গুলী করবার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন শান্তি ও তাঁর সহপাঠিনী সুনীতি চৌধুরী। সুনীতির গুলীতে ম্যাজিস্ট্রেটের দেহ ভূলুণ্ঠিত হোলো। এ কাজের জন্য এই দুই কিশোরীকে সেদিন সহ্য করতে হয়েছিল অমানুষিক অত্যাচার।

বিচারে সুনীতি সহ শান্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হোলো। হাসি-মুখে সাহসের সঙ্গে দেশমাতৃকার গান গেয়ে শান্তি সেদিন কারাগৃহে প্রবেশ করলেন। কারাগৃহে থেকেও একদিনের জন্যও তিনি দেশমাতৃকাকে ভোলেন নি। তিনি তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠ দিয়ে দেশামাতৃকার গান গেয়ে বন্দীদের মনে উদ্দীপনার সঞ্চার করতেন। শান্তিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী করে তাঁর প্রিয় বান্ধবী সুনীতির থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হোলো। বিচ্ছেদ এনে শাসন করাই হচ্ছে ইংরেজ নীতি। শান্তি সুনীতিকে তাই আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল। প্রেসিডেন্সী, মেদিনী-পুর, রাজসাহী, হিজলী প্রভৃতি বিভিন্ন জেলে ঘুরিয়ে, অত্যাচারের সীমাকে শেষ পর্যায়ে নিয়ে, অবশেষে সাত-সাতটা শীত ও বসন্ত পার হবার পর শান্তিকে মুক্তি দেওয়া হোলো ১৯৩৯ সালে। গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় এ সময় অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে তিনি মুক্তি পেলেন।

মুক্তির পর শান্তি পড়াশুনা শুরু করলেন। ম্যাট্রিক এবং আই এ পাশ করবার পর ১৯৪২ সালে চট্টগ্রামের বিপ্রবীকর্মী চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পরও তিনি কংগ্রেসের সদস্যা হয়ে তাঁর

রাজনৈতিক কার্য ধারা বজায় রেখেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় আইনসভা (Legislative Conncil) এবং বিধান সভার (Legislative Assembly) তিনি বহু দিন সদস্যা নির্বাচিত থাকেন। বর্তমানে তিনি বিভিন্ন সমাজসেবা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তবে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তিনি আজ আমাদের কাছে পরিচিত। তাঁর 'অরুণ বহ্নি' পুস্তকের মাধ্যমে তিনি আত্মজীবন কাহিনী তুলে ধরেছেন।

সেদিনের জনতার উপর ইংরেজ অত্যাচারের কথা কুমিল্লাবাসীর স্মরণে আছে; কুমিল্লার সমস্ত কিশোর ও যুবমনকে আঘাত করেছিল প্রচণ্ডভাবে। তার ঢেউ এসে ধাক্কা দিয়েছিল বাংলার এই দুই কিশোরীর মনে। সমাজের সমস্ত সমালোচনার উর্ধ্বে উঠে সেই শতাব্দীতে এই দুই-কিশোরী ধরেছিলেন রণরঙ্গিনী মূর্তি। দ্বিধাগ্রস্তের মনে সেদিন জেগেছিল দৃঢ়তা। যুবসমাজের চিত্তে জেগেছিল চমক, উৎসাহ। উদ্দীপনা নিয়ে তারা এগিয়ে এসেছিল ছোট দু'টি মেয়েকে স্বাগত জানাতে যাঁরা গোটা সমাজের হ'য়ে শাস্তি বহন করতে চলেছেন কারান্তরালে।

হানসা মেহতা

(১৮৯৭—   )

শৈশবে মাতৃহীন ছোট্ট একটি মেয়ে যিনি বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে শুধুমাত্র পিতাকে জীবনের একমাত্র সঙ্গী করে সংসারসাগর পার হবার জন্য যে তরী ভাসিয়েছিলেন, সে তরী পারে পেঁৗছেছিল কিনা তার খবর হয়ত আমরা রাখিনা। কিন্তু সত্যিই একদিন জীবনের সর্বপ্রকার ঝড়ঝঞ্ঝার বাধা সহ্য করে তীরে এসে লেগেছিল। এই মাতৃহীনা ছোট্ট মেয়েটিও একদিন বড় হয়ে, হয়েছিলেন সমাজের, দেশের দশজনের একজন, দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে ধন্য করেছিলেন নিজেকে। ইনি হলেন হানসা মেহতা।

১৮৯৭ সালের ৩-রা জুলাই সুরাটের এক প্রগতিশীল নাগর পরিবারে হানসা মেহতা জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্যার মনুভাই মেহতা ছিলেন যথাক্রমে বরোদা এবং বিকানির রাজ্যের দেওয়ান। মাতা হর্ষ-গৌরীকে ছেলেবেলায় হারাতে হয় হানসাকে। সেই কারণেই হানসা ছেলেবেলা থেকেই পিতার কাছে মানুষ হয়েছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই পিতার কাছে বিভিন্ন সাহিত্যের বই পড়ে তাঁর সাহিত্য পাঠের প্রতি রুচি জন্মে। বরোদার প্রথম প্রগতিশীল শাসক তৃতীয় সয়াজিরাও-এর সম্বন্ধে জানবার পর এই চরিত্রটি তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় বরোদাতেই। ১৯১৮ সালে দর্শন বিষয়ে অনার্স সহ তিনি স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ১৯১৯ সালে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঙ্গাবাঈভাট বৃত্তি পুরস্কার লাভের পর তিনি জার্নালিজম এবং সোসিও-লজি পড়বার জন্য লণ্ডনে যান।

লণ্ডনে অধ্যয়ন কালে তিনি সরোজিনী নাইডু, রাজকুমারী অমৃতকাউর প্রমুখ বিশিষ্ট মহিলাদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁদের সঙ্গে

ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। লণ্ডনের অধ্যায়ন শেষ করবার পর এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে শিক্ষামূলক ভ্রমণ সম্পূর্ণ করবার পর জাপান হয়ে ১৯২৩ সালে তিনি ভারতে আসেন। ১৯২৪ সালে তিনি ডাঃ জিভারাজ মেহতাকে বিবাহ করেন। ডাঃ জিভারাজ মেহতা ছিলেন সেই সময়ে বোম্বাইয়ের একজন বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ, তাঁদের এ বিবাহ ছিল অসবর্ণ বিবাহ।

জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে হানসার সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু হয় সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাবার পর থেকেই। আন্দোলনে অংশ গ্রহণের ভূমিকা ধীরে ধীরে সক্রিয় হতে থাকল। তিনি পরে ব্রিটিশের বিরুদেধ সামরিক আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন এবং মদ ও বিদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের বিরুদ্ধে মহিলাদের সংগঠিত করেন। ১৯৩১ সালে তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় হানসা মেহতাকে বোম্বাই সংগঠনের দায়িত্বগ্রহণ করতে হয়েছিল। মহিলাদের সংগঠিত করে তিনি তাঁদের মাধ্যমে স্বাধীনতার বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন দেশের মধ্যে, বিশেষ করে গুজরাট রাজ্যে।

১৯৩০ সালে এবং ১৯৩২ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। সমাজ সংস্কারমূলক এবং শিক্ষামূলক কাজের ক্ষেত্রেও ছিল তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহন; তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। মহিলা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা উল্লেখের দাবী রাখে; ১৯২০ সাল থেকে তিনি এই আন্দোলনে যুক্ত হন সক্রিয়ভাবেই। এই সময় জেনেভায় যে আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলন হয়েছিল, সেখানে তিনি ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩১ সালে তিনি বোম্বাই বিধানসভায় নির্বাচিত হন; তিনি প্রথম মহিলা বোম্বাই বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন।

রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ভারত স্বাধীনতা লাভ করল। এরপরেও কিন্তু হানসা মেহতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে কাজ করে গিয়েছেন। তিনি সংবিধান পরিষদের সদস্যা নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালে কমনওয়েলথ্ পার্লামেণ্টারিয়ান সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। হিউম্যান রাইটস্ কমিশনের সদস্যা হিসাবে নির্বাচিত থাকাকালীন তিনি এলিনর রুজভেল্ট-এর Eleanor Roosevelt) অধিকার সম্বন্ধে বাখ্যা করেন।

১৯৫৫ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান কনফারেন্স অব সোসাল ওয়ার্ক এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সময়কালের জন্য তিনি ছিলেন বরোদার এম. এস. ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার। তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন এই বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে কৃতিত্ব সম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি অর্জনের সম্মান লাভ করেছিল। এই মহিয়সী ভারতের ইতিহাসে নিশ্চয়ই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

হেমপ্রভা মজুমদার

(১৮৮০—১৯৬২)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের রঙ্গভূমিতে দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করতে একসঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন তদানীন্তন সময়কার অগণিত পরাধীন নর-নারী। বহু গৃহবধূও তাঁদের বিপ্লবী স্বামীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অগ্রণী এক মহিয়সী নারীকে আমরা দেখেছি যিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের পাতায় এক উজ্জ্বল তারকা হয়ে বিরাজ করছেন। এই নারী হলেন হেমপ্রভা মজুমদার।

১৮৮০ সালে, পূর্ববঙ্গ অধুনা বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলার খিলপাড়া নামকস্থানে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে হেমপ্রভা মজুমদার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গগনচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন। আর সেই কারণেই তিনি তদানীন্তন সামাজিক নানান সংস্কারের মধ্যে থেকেও সমস্ত সংস্কার উপেক্ষা করে হেমপ্রভাকে লেখাপড়া শিখাবার জন্য গ্রামের বিদ্যালয়ে পাঠান। কিন্তু খুব বেশীদিন পড়বার সুযোগ হয়নি তাঁর। হেমপ্রভা উচ্চ-প্রাইমারী, বর্তমানের ষষ্ঠ শ্রেণী, পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। উচ্চ-প্রাইমারী পাশ করবার পর বারো বছর বয়সে সামাজিক রীতি অনুযায়ী তাঁকে ত্রিপুরা জেলার কাশীনগর গ্রামের বসন্তকুমার মজুমদারের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়।

বসন্তকুমার ছিলেন স্বাধীনতাকামী কংগ্রেসের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। ১৮৯৩ সালে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯১৫ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় 'ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া' এ্যাক্ট অনুযায়ী বসন্ত বাবুকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ব্যারাকপুর জেলে তাঁকে বন্দী অবস্থায় রাখা হয়।

হেমপ্রভা স্বামীর কাছ থেকেই দেশসেবার প্রেরণা পান। তিনি তাঁর

স্বামীর পাশে ছিলেন সবসময়েই। বসন্তকুমারকে যখন ব্যারাকপুর জেল থেকে রাজবন্দীরূপে বিভিন্ন জেলে স্থানান্তরিত করা হয়, সেইসময় হেমপ্রভা তাঁর সন্তানদের নিয়ে কুমিল্লা চলে আসেন। ১৯১৯ সালের শেষের দিকে বসন্তকুমার জেল থেকে মুক্ত হন। ১৯২১ সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। এই বছরেই সরকারী আদেশ অমান্য করবার জন্য গেপ্তার হন।

হেমপ্রভা কিন্তু এইসময় ছিলেন সম্পূর্ণ গৃহিনী। স্বামী গেপ্তার হবার পর তাঁরই নির্দেশে তিনি রাজনৈতিক কাজে যোগ দিলেন, সক্রিয়-ভাবেই এবং জনগণের পাশে এসে দাঁড়ালেন। বস্তুত পক্ষে, দেখা গেল যে, ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে আন্দোলনের প্রায় সব নেতারাই গেপ্তার হয়েছেন। সুতরাং সেই কারণেই এই সময় হেমপ্রভা অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করবার জন্য দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসেন। এই গুরুদায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই।

১৯২১ সালের ৬-ই ডিসেম্বর, চিত্তরঞ্জনের পুত্র চিররঞ্জনকে পুলিস গেপ্তার করে। গেপ্তার করে নিয়ে পুলিস তাঁকে এমন প্রহার করে যে, গুজব রটে গেল পুলিসের প্রহারে চিররঞ্জনের মৃত্যু হয়েছে। এ খবর পেয়ে হেমপ্রভা সেই রাত্রেই চলে এলেন আলিপুর জেল গেটে। চিররঞ্জনের খবর নেবার জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করলেন; কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রাহ্যই করল না। হেমপ্রভা এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে গর্জন করে উঠে বললেন, চিররঞ্জনের খবর না নিয়ে তিনি এক পাও নড়বেন না। তাঁর সঙ্গে রয়েছে অগণিত মানুষ। তাঁরা উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা করছেন, তাঁরা জানালেন, জেল কর্তৃপক্ষ যদি কোনো খবর না দেন তবে তাঁরা মনে করবেন চিররঞ্জনের মৃত্যুর খবরই সত্য এবং এর ফলে তাঁরা দেশে যে আগুন জ্বালাবে তাকে নিভিয়ে দেবার শক্তি জেল কর্তৃপক্ষের নেই।

হেমপ্রভার নেতৃত্বে সমবেত জনতার এই হুংকারে জেল কর্তৃপক্ষ নরম হলেন এবং হেমপ্রভাকে চিররঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে দিলেন। এই তেজস্বিনী নারীর কার্যকলাপ তখন ছড়িয়ে পড়েছিল জনতার মধ্যে; সাড়া জাগিয়েছিল জনতার মধ্যে। দেশবন্ধু তখন জেলে। তাঁকে উদ্দেশ্য করে দেশবন্ধু এইসময়ই বলেছিলেন, 'এখন জেলের বাইরে একজন মাত্র পুরুষই আছেন, যিনি হলেন হেমপ্রভা মজুমদার।' আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে পুলিসের লাঠির আঘাতে তাঁর হাত ভেঙে গিয়েছিল।

এরপর থেকে হেমপ্রভার দায়িত্ব ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। তাঁকে সভার পর সভা পরিচালনা করতে হোতো, বক্তব্য রাখতে হোতো। এর জন্য তাঁকে পুলিসের অত্যাচারও সহ্য করতে হয়েছে অনেক। কিন্তু তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা এবং তেজস্বিনী মহিলা। একজন মহিলাকে সরকার গ্রেপ্তার করেছে, এ-ঘটনা সরকারের নিন্দার একটা বড় বিষয় হবে এবং সুনাম নষ্ট হবে, এই কারণেই বৃটিশ সরকারের পুলিস হেমপ্রভাকে গ্রেপ্তার করল না। পুলিসের অত্যাচার কিন্তু বন্ধ হয়নি তাঁর উপর।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হোলো। হেমপ্রভা লেগে পড়লেন অসহযোগ আন্দোলনের কাজে; তাঁর মুখ্য দায়িত্ব ছিল মহিলাদের সংগঠিত করা। জেলার বিভিন্ন স্থানের মহিলাদের সংগঠিত করে তিনি বিদেশী বস্ত্র এবং মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন এবং তাঁদের এ অভিযান চলছিল জেলার বিভিন্ন স্থানে।

হেমপ্রভা এবং তাঁর স্বামী দু'জনেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে কাজ করে গিয়েছেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। তাঁরা উভয়েই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অত্যন্ত প্রিয় এবং কাছের সহযোগী কর্মী ছিলেন। বসন্তকুমার মূলতঃ রাজনৈতিক কার্যধারার সঙ্গে যুক্ত হন ১৯০৫-০৬ সাল থেকেই। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি হয় বিপ্লবী 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবেই যুক্ত হন তিনি। এরপর ১৯৩০ সালে 'সিভিল ডিস্‌অবিডিয়েন্স' অর্থাৎ আইন অমান্য আন্দোলনের সংগে যুক্ত হন। এই আন্দোলনের সংগে ১৯৩২ সালে এবং ১৯৪০ সালেও তিনি ছিলেন।

১৯২১ সালে আসাম বেংগল রেলওয়ে এবং আর. এস. এন. স্টীমার কোম্পানীর ধর্মঘট হয়। সেই সময় দেশবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী চাঁদপুর ও গোয়ালন্দে ধর্মঘট হয়, ধর্মঘটের স্থানটি ছিল চাঁদপুর ও গোয়ালন্দের সংযোগ স্থল। এই ধর্মঘট সংগঠিত করবার দায়িত্ব ছিল বসন্তকুমারের উপর। সমস্ত স্টীমার এবং রেলওয়ে সংযোগব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়ে এই ধর্মঘটকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যান বসন্তকুমার তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার দ্বারা। যদিও এর জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার হতে হয়েছিল, কিন্তু অকুণ্ঠ জনসমর্থন, জনগণের চাহিদার চাপ তাঁকে কারামুক্ত করে।

এরপর তিনি চাঁদপুরে যান; এটি ছিল ধর্মঘটের আর একটি

গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানকার কুলীদের উপর গুর্খা সৈন্যদের লাঠিচার্জ হয়। এই ধর্মঘটী শ্রমিকদের পাশে এসে তিনি দাঁড়ালেন, তাঁর প্রাঞ্জল বক্তৃতার সাহায্যে তিনি এই ধর্মঘটী শ্রমিকদের আন্দোলনের পথকে আরো দৃঢ় করে তোলেন। ১৯১৫ সালে কুমিল্লা প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি ছিলেন একজন অগ্রণী নেতৃত্ব এবং তাঁর নেতৃত্ব তদানীন্তন সময়কার বিশিষ্ট নেতৃত্ব, চিত্তরঞ্জন দাস, বি. চক্রবর্তী প্রমুখদের আকর্ষণ করেছিল, তিনি তাঁদের গুণমুগ্ধকর প্রশংসাও লাভ করেছিলেন।

১৯২১ সাল থেকে তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং এ. আই. সি. সি.-র (All India Congress Committee) সদস্য নির্বাচিত হন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গেও তিনি ছিলেন। ১৯৪২ সালে গান্ধীজীর ভারত-ছাড় আন্দোলনেও তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। এ সমস্ত আন্দোলন করতে গিয়ে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে একাধিকবার। ১৯৪২ সালের পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি তাঁর বাসভূমি কুমিল্লা শহরে চলে এলেন, সে সমস্ত অঞ্চলের মানুষজনের পাশে দাঁড়াবার জন্য যারা, ১৯৪৩ সালের স্মরণীয় দুর্ভিক্ষের বলি হয়েছিল।

তিনি তাঁর সমস্ত কার্যধারায় নৈতিক এবং আন্তরিক সমর্থন এবং সাহায্য পেয়েছিলেন সহধর্মিনী হেমপ্রভার কাছ থেকে। ঘটনাক্রমেই হেমপ্রভা ১৯২১ সালেই রাজনৈতিক কার্যধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। বসন্তকুমারের কুমিল্লাবাসকালে অর্থাৎ ১৯৪৩ সালে তিনি কলকাতায় বিধানসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়ে কাজ করছিলেন। বসন্তকুমার কুমিল্লায় অসুস্থ হয়ে পড়েন, হেমপ্রভা স্বামীর আকস্মিক অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে কুমিল্লার পথে রওনা হন। কিন্তু তাঁর কুমিল্লায় পৌঁছবার আগেই তাঁর স্বামী ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে চলে গেলেন, সময়কাল ১৯৪৪ সালের ২রা মে।

স্বামীর মৃত্যুতে হেমপ্রভা মানসিক দিক দিয়ে যে আঘাত পেলেন তা সহ্য করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। বসন্তকুমার শুধুমাত্র তাঁর স্বামী ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মী। স্বামীর প্রেরণাতেই ১৯২১ সালে কংগ্রেস ভলান্টিয়ার ফান্ড ঘোষণা করলে দেশবন্ধু যখন দেশের সমস্ত নর-নারীর সামনে সাহায্যের আবেদন রেখেছিলেন, তখন কতিপয় নর-নারীর সঙ্গে হেমপ্রভা তাঁর পারিবারিক

জীবনের অজস্র বাধা-বিপত্তির মধ্যেও বেরিয়ে এসেছিলেন স্বেচ্ছাসেবিকার তালিকায় নাম লেখাবার জন্য এবং সেই থেকেই তিনি রাজনীতিকে গ্রহণ করলেন ব্রত হিসাবে দেশের স্বার্থেই।

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে তালিকাভুক্ত হবার পর তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত করেছিলেন একাজে, এমনকি পুলিসের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষেও উপনীত হতে দেখা গিয়েছে তাঁকে, অত্যন্ত সাহসের সঙ্গেই। ১৯৪৪ সালে স্বামীর মৃত্যু হলেও তিনি কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক কর্মধারা বন্ধ করেন নি। একাজে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে লাগলেন।

১৯৪৪ সালে কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে তিনি সংগঠকের ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং কলকাতা পৌরসভার অলডারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। এছাড়া কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোশিয়েশনের চেয়ারম্যান হিসাবেও কিছুদিনের জন্য তাঁকে কাজ করতে হয়। ১৯৩২ সালে কংগ্রেস আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কুমিল্লা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসাবে ১৯৩২ সাল থেকে কিছুদিন তাঁকে কাজ করতে হয়। ১৯৩২ সালের মার্চ মাসে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কারারুদ্ধ করা হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের এই মহিয়সী নারীকে স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫২ সালে বিধানসভা নির্বাচনে একজন স্বাধীন নির্বাচন প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জনগণ তাঁকে নির্বাচিত করেনি।

এর পরবর্তী সময়ে তিনি রাজনৈতিক জীবন থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হতে থাকেন। তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। ১৯৬২ সালে এই মহিয়সী নারীর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনে যে নারী তাঁর জীবনের বহু অমূল্য সময় অতিবাহিত করেছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা সে নারীকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারেনি। স্বাধীন ভারতকে ভেঙে দু'ভাগ করবার আঘাত তাঁকে আহত করেছিল ; আর সেই কারণেই এই তেজস্বিনী নারী জীবনের শেষপ্রান্তে এসে রাজনৈতিক জীবন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন ; অবশ্য শারিরিক অসুস্থতাও একটি কারণ। তবে দেশমাতৃকা তাঁকে স্মরণ রাখবে একজন দেশপ্রেমিকা হিসাবে, যিনি তাঁর জীবনের অনেকগুলি বছর কাটিয়েছিলেন দেশমাতৃকার বন্ধন মুক্তির কাজে।

সাহায্যকারী পুস্তকের তালিকা

১) স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী—কলিকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, —কমলা দাশগুপ্তা
২) রক্তের অক্ষরে, কলিকাতা, ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দ—কমলা দাশগুপ্তা
৩) অগ্নিমন্ত্রে নারী, কলিকাতা, ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ—সান্তনা গুহ
৪) বাংলার নারী আন্দোলন, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ— ছবি রায়
৫) অরুণবাণী, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ—শান্তি দাস
৬) জীবনের যাত্রাপথ—সরলাদেবী চৌধুরাণী
৭) শৃঙ্খল ঝঙ্কারে—বীণা দাস
৮) স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম—পূর্ণেন্দু দস্তিদার
৯) জাতীয় আন্দোলনে বাংলার নারী, বিশ্ব বিদ্যা সংগ্রহ, কলিকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ—যোগেশচন্দ্র বাগল
১০) সাহিত্য সাধক চরিতমালা—যোগেশচন্দ্র বা ল
১১) বরণীয়, কলিকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ—যোগেশ চন্দ্র বাগল
১২) বাংলায় বিপ্লববাদ, কলিকাতা, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ—নলিনী কিশোর গুহ
১৩) বিপ্লবের পথে বাংলার নারী, কলিকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ— হরিদাস মুখোপাধ্যায়
১৪) বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়
১৫) ভারতে জাতীয় আন্দোলন, কলিকাতা, ১৯২৫—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়
১৬) প্রজা সোসালিস্ট পার্টির জন্ম ও ভূমিকা, কলিকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ—সমর গুহ
১৭) বাংলার নারী জাগরণ, কলিকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ—প্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
১৮) দেশবন্ধু স্মৃতি, কলিকাতা, ১৯২৬—হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

১৯) ভারতের বিপ্লব কাহিনী, কলিকাতা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ—হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত
২০) চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী, কলিকাতা, ১৯৪৮—আনন্দ প্রসাদ গুপ্ত
২১) চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ—চারুবিকাশ দত্ত
২২) অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম—অনন্তলাল সিংহ
২৩) বিপ্লবী বাংলা বা বাংলার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ—রাজেন্দ্র লাল আচার্য্য
২৪) অগ্নিযুগের অগ্নিকথা, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ—সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়
২৫) মাতঙ্গিনী হাজরা, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
২৬) স্বর্ণকুমারী দেবী, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ২৮ নং ভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, কলিকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ—ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

English & Other Languages

1. Remini cences—Kalpana Datta.
2. History of Freedom Movement in Orissa—H.K, Mehtab.
3. The House of Tagors, Calcutta, 1965—Hiranmoy Banerjee.
4. The Freedom Struggle in Andhra Pradesh. Vol. III, Hydrabad, 1965—M. Venkatarangaiya (Ed.)
5. Chittagong Armoury Raidery—Kalpana Dutt.
6. History of Freedom Movement in India, Vol III—R. C. Majumdar.
7. Autobiography, Ahmedabad, 1940—M. K. Gandhi.
8. Kasturba Gandhi, Calcutta, 1944—K. P. Thomas.
9. Anasuyabai Ani Mi Nagpur, 1962—P. B. Kale.
10. History of the Indian National Congress—Pattabhi Sitaramayya.
11. M. K, Gandhi (Tamil), Madras, 1963—S, Ambujamal.
12. Role of Women in the Freedom Movement, 1857 to 1947—Manmohan Kaur.
13. Challenge to Women, Allahabad, 1946—Amrit Kaur.
14. To Women Amrit Kaur.
15. Women Behind Mahatma Gandhi (London ; 1954)—Eleanor Morton.
16. History of Indian National Congress, Voll. II—B. Pattabhi Sitaramayya.
17. Rebel India--Bijan Mitra and Phani Chakravarty (Ed.)
18. Communism in India, Bombay, 1960—Gene D. Overstreet & M. Windmiller.
19. Life Sketch of Mrs. Asaf Ali—J. K. Khanna.
20. The Left Wing in India, 1965—L. P. Sinha.
21. My Contemporaries—G. Venkatachalam.
22. Hindi Katha Sahitya Ke Vikas Me Mahilaon Ka Yog, Delhi, 1966—Urmila Gupta.

23. The Women in Gandhi's life—Eleanor Morton.
24. India Wins Freedom, 1959—Maulana Abul Kalam Azad.
25. Samaj Darpan, Ahmedabad, 1964—Dr. Sumat Mehta.
26. Atmakatha (1950-55)—Indulal Yajnik.
27. Mari Binjawabdar Kahani, Bombay, 1943—K. M. Munshi.
28. Sarojini Naidu : A Biography, 1966—Padmini Sen Gupta.
29. Lady Vidyagauri Smriti Ank ; February 1959—Strijivan.
30. A Nation in Making, London 1925—S. N. Banerjea.
31. Sri Aurobinda O Banglaya Swadeshi Yuga, Calcutta, 1956—Girijashanakar Roy Chowdhury.
32. Madame Ambassador—Anne Guthrie.
33. Prison Days—Vijoy Lakshmi Pandit.
34. Maharashtrachi Tejaswini Pandit Ramabai—D. N. Tilak.
35. A History of Manipur, Calcutta, 1958—J. Roy.
36. Pandita Ramabai—Dr. N. Mc. Nicol.

যে সমস্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা হইতে সংগৃহীত

১) দি বেঙ্গলী, এপ্রিল-মে, ১৯২২ খৃষ্টাব্দ।

২) 'মন্দিরা' পত্রিকা, কার্তিক সংখ্যা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

৩) 'প্রবাসী' পত্রিকা, শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৌষ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।

৪) 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা, শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ।

৫) 'ভারতী' পত্রিকা, ১৩০২ হইতে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের মধ্যবর্তী প্রকাশিত সংখ্যা।

৬) 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকা, অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

৭) 'দি অমৃতবাজার পত্রিকা' ইণ্ডিপেনডেণ্ট নাম্বার-এর '১৯৪২ রেভলিউশন ইন বেঙ্গল' শিরোনামে প্রকাশিত সত্যেন সেন গুপ্ত-র প্রবন্ধ।

৮) 'দি স্বাধীনতা' (উইকলি), ১৯২৭ হইতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত।

৯) 'দি ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন', ১৯৪৪ সালের মার্চ সংখ্যা।

১০) 'দি অমৃতবাজার পত্রিকা', ১৯৫৬ সালের ১১ই মে, ১৯৪৫ সালের ২৩শে নভেম্বর।

১১) 'দি মডার্ণ রিভিউ', ১৯৩০ সালের মে, ডিসেম্বর, ১৯৪৫ এবং এপ্রিল, ১৯৫৯ সংখ্যা।

১২) 'দি জার্নাল অব দি ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' জুন, ১৮৮২।

১৩) 'দি তত্ত্বকৌমুদী', এ ফোর্ট নাইটলি জার্নাল অব দি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, কলিকাতা, ১৮ই আগষ্ট হইতে ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।

১৪) 'জয়শ্রী' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

১৫) 'দি মাতৃভূমি' (ন্যাশন্যাল ডেইলী)' আরনাকুলাম হইতে প্রকাশিত।

১৬) এ. আই. সি. সি. সাপ্লিমেণ্ট সংখ্যা, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬ এবং ৮ই মে, ১৯৬৫।

১৭) 'দি ফেমিনা' এবং 'দি টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া' (ফোরনাইটলি) ৮ই মে, ১৯৬৪।
১৮) 'দি হিন্দুস্থান রিভিউ', ১৯৪৯ সালের সরোজিনী নাইডুর বিশেষ সংখ্যা।
১৯) 'দি ইয়ং ইণ্ডিয়া' (উইকলি) ওল্ড ফাইল।
২০) সিস্টার নিবেদিতা বার্থ সেণ্টেনারি সোভেনির, অক্টোবর ১৯৬৬ কলিকাতা।

কিছু তথ্য সমৃদ্ধ প্রকাশনা হইতে সংগৃহীত

১) দি টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরী এণ্ড হু'স হু, ১৯৬৪-৬৫ এবং ১৯৭০।
২) কংগ্রেস এণ্ড কেরালা, এ. কে. পিল্লাই, পাবলিসড বাই দি কেরালা প্রভিনশিয়াল কংগ্রেস কমিটি, ১৯৩৫।
৩) এশিয়াস হু' স হু (থার্ড এডিসন)।
৪) রিপোর্ট অব দি ফাস্ট এশিয়ান রিলেশস কনফারেন্স, নিউ দিল্লী, ১৯৪৭।
৫) সাম ফ্যাক্ট একাউণ্ট দি ডিসটারবেন্স অব্ ১৯৪২-৫২ (বেঙ্গল গভঃ পাবলিকেশন্)।
৬) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, ১৯শে মে, ১৯৫৬।